বিপ্লবী মহানায়ক
এম, এন, রায়

শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক :

এন, কে ব্যানার্জী
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
২নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
ফোন—৪৭-১০৬৫

প্রাপ্তি-স্থান :

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ বিধানসরণী (কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট)
কলিকাতা-৬

সুখেন চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থকার)
৪।১এ মাধব চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-২০, ফোন : ৪৭-৪৫৪২

প্রাপ্তিস্থান :—

দি বুক হাউস
১৫ নং কলেজ স্কোঃ
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :

পি, বি, প্রেস
চণ্ডীচরণ সেন
৩২ই শরৎ বসু রোড
কলিকাতা-২০

প্রথম প্রকাশ :

১৫ই মার্চ ১৯৬০

কে এই অপরিচিত !

১৯৩১ সাল ঃ

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ক'লকাতায় বসেছে। কলেজষ্ট্রীটের এলবার্টহলের দোতালায় মিটিং হচ্ছে। সভাপতির আসনে (নেতাজী) সুভাষচন্দ্র বসু।

এ বছরের অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ভীষণ মত বিরোধ। নীতিগত সংঘাত বেঁধেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা রেড্ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে এই সংস্থা হতে সম্পূর্ণ পৃথক হবেন। তাই সভায় অত্যন্ত গণ্ডগোল, হৈচৈ ও বিক্ষোভ।

বোম্বায়ের গিরনী কামগাড় ইউনিয়ন। তার ডেলিগেট্রা বেশী গোলমাল করছেন। সভার কাজ প্রায় পণ্ড হবার উপক্রম। সুভাষচন্দ্র সভাপতির আসন থেকে উঠে মাঝে মাঝে হাত তুলে বলছেন, প্লিস্ কমরেডস্ প্লিস্। ডেলিগেটরা সাময়িকভাবে চুপ করছেন বটে। কিন্তু তাদের বেশিক্ষণ শান্ত রাখা যাচ্ছে না। সভায় তিল ধারণের স্থান নেই। চারিদিকে উত্তেজনা। বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য। সভা ভেঙ্গে যায় যায় এমনি অবস্থা।

এমন সময় দীর্ঘ ছ'ফুটের ওপর লম্বা এক বিরাট পুরুষ সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পোষাকে বিদেশী আভিজাত্যের ছাপ। এতক্ষণ কারও দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়েনি। তিনি সুভাষচন্দ্রের পাশে বসে। এত গোলমালের মধ্যেও চুপচাপ ও নির্লিপ্তভাবে কি যেন লিখছিলেন। বিরাটহলটার চারিদিকে তিনি একবার নিমেষে চোখ বুলিয়ে নিলেন। সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়লো। হ্যাঁ, দেখবার মত চেহারা বটে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন

বিরাট পুরুষ। তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী। তাঁর বিশাল আয়ত চোখের সম্মোহন দৃষ্টি। সকলকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করলো।

ডেলিগেটগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। কম্যুনিষ্টদল স্তম্ভিত ও হতবাক্। এলবার্টহল অদ্ভুত শান্তভাব ধারণ করলো। পিন্‌টি পড়লে শোনা যায়। আশ্চর্য ব্যাপার! নিতান্ত অপরিচিত এই ব্যক্তি। কিন্তু কে ইনি?

হঠাৎ তাঁর কম্বুকণ্ঠ থেকে আবেদন এল,—কমরেডস্, কোমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে কলোনিয়াল নীতি সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, আমি এই সভায় তার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করতে চাই। বিচার বিতর্কের পর যদি আপনারা মনে করেন এই নীতি বিশ্বের সর্বহারা মেহনতি মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনাদের পূর্ণ সমর্থন আশা করবো।

কিন্তু কে এই মানুষ? যিনি ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনতে সাহস করছেন। তারপর আরম্ভ হোল সেই নীতির বিশ্লেষণ। তার চুলচেরা যুক্তিসহ বিচার। সকলেই মন্ত্র মুগ্ধবৎ শুনতে লাগলেন। সেই অপূর্ব্ব ও অভিনব বিচার বিশ্লেষণ। কি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ তার ভাষা। কি সুন্দর, সহজ ও মিষ্টি ইংরাজী উচ্চারণ। প্রকাশ ভঙ্গীমায় লেশমাত্র ভাবাবেগ নেই। বিচারে কুণ্ঠা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। সভার শেষে নাম-না-জানা অজ্ঞাত মানুষটি ভীড়ের মধ্যে গোপনে মিশে মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু কে ইনি?

তার কয়েক মাস পরের ঘটনা। ২০শে জুলাই ১৯৩১ সাল। সংবাদ পত্রে বড় বড় অক্ষরে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়েছে। বিশ্ব-বিপ্লবী এম, এন, রায় বোম্বায়ে গ্রেপ্তার। আর তার সঙ্গে কয়েকটি তুচ্ছ সংবাদ,—ইনি কিছুদিন পূর্বে অজ্ঞাত বাসকালে ক'লকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধি-

বেশনে যোগ দিয়ে কোমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে গেছেন।

তাহলে ইনিই সেই বিশ্ববিশ্রুত কম্যুনিষ্ট নেতা এম, এন, রায়!

সত্যই, পৃথিবীর ইতিহাসে কম্‌রেড এম, এন, রায় এক দুর্লভ চরিত্র। চিন্তা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক। আজীবন আপোষহীন সংগ্রামী। দ্রষ্টা ও দার্শনিক। বহু ভাষাবিদ্‌। বক্তা ও শক্তিশালী লেখক। তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন দর্শন বিরাট ও ব্যাপক। বহুমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ। তাঁর জীবনের ইতিহাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। সমগ্র এশিয়া, আমেরিকা, মেক্সিকো, এবং ইউরোপের সর্বত্র তাঁর পদচিহ্নের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের শত কোটি তুচ্ছ ঘটনা আজও বিশ্বে অতীব বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর জীবন কাহিনীর লোমহর্ষণকর, তথ্যগুলি অবিশ্বাস্য অভাবিত ও ঘটনা বহুল। ডিটেকটিভ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ নায়ককেও হার মানিয়ে দেয়। অনাগত পৃথিবীর মানুষ একদিন এই একান্ত দুর্লভ মানুষটিকে নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেবে। দিন আগত ঐ। কমরেড এম, এন, রায় ছিলেন মুক্তি পাগল। তাই কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে—'মুক্তিপাগল, কাঁদিয়া গিয়াছে, মুক্তি, মুক্তি বলি।'

বিদ্রোহী মানুষঃ

'বলবীর বল উন্নত মম শির'

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে চতুর্দশ শতকে সভ্যতার নব জাগরণের সর্বব্যাপী প্রারম্ভিক সূচনা ও

বিস্তৃতি ঘটেছে। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় রেঁনেসা আন্দোলন তার আরও অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে। রজার বেকন্ এবং আল্‌বার্টাস্ ম্যাগানাস্ ত্রয়োদশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব তথ্য জগতের সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করে গেছেন। আরবদেশীয় মনীষীগণ ছিলেন ইহার অগ্রদূত।

জেন্‌সেরিকরা যখন অসভ্য মানুষের সাহায্যে রোম দখল করলো তখন থেকে শুরু হোল অন্ধকার যুগ। তখন অজ্ঞানতায় আর কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গেছে। স্বৈরাচারী পাণ্ডা, পুরোহিত, পাদরি ও পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারীতা দেশের সর্বত্র অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারের প্লাবন সৃষ্টি করে মানুষের সীমাহীন দুঃখকে আরও দুঃসহ করে তুলেছিল।

সর্বব্যাপী অন্যায়, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যারা সর্ব প্রথম মাথা তুলে দাঁড়ালেন তাদের বলা হোত রেঁনেসা আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁরাই প্রচলিত মত ও পথের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বারট্রাণ্ড রাসেল্ তাঁর হিস্ট্রি অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলজফি নামক গ্রন্থে বলেছেন, বিদ্রোহী মানুষই সর্বপ্রথম অন্ধকার যুগ থেকে নতুন পৃথিবীকে আবিষ্কার করেছেন। অজ্ঞান ও অসহায় মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোক শিখা দেখতে শিখলো। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর কথা মন দিয়ে শুনলো। ধর্মশাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা ও আলোচনা সর্বত্র শুরু হোল। এপিকিউরাস্ বল্লেন, মানুষের বিবেকই হোল ভগবানের বাণী।

কিন্তু কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক পাদরি ও পোপ সে কথা মানবে কেন? অজ্ঞানতার মোহে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও স্বার্থপর মানুষ রাষ্ট্রের সহায়তায় এই সব বিদ্রোহী মানুষের প্রতি সীমাহীন অত্যাচার আর অকথ্য নিগ্রহ শুরু ক'রলো। তারা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসকে বিষ পানে অবলীলাক্রমে হত্যা করলো। পণ্ডিতপ্রবর এরিস্‌টটল্ তাদের অত্যাচারে এথেন্স থেকে প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হোলেন। নতুন

দর্শনের জনক প্রোটাগোরাসের বহুমূল্য গ্রন্থশালা তারা নির্বিচারে পুড়িয়ে দিল। ধর্মপ্রাণ ডায়োজেনেস্‌কে নিরীশ্বরবাদী বলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। চন্দ্রে মানুষ যেতে পারে এই কথা যিনি প্রথম ভেবেছিলেন সেই বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওকে সারাজীবন কারাগারে বন্দী করে রাখলো। সামান্য অপরাধের অভিযোগে রোমের রাজপথ শহীদদের রক্তে লাল হয়ে উঠলো। তবু বিদ্রোহী মানুষের জয়-যাত্রার পথ রুদ্ধ হোল না।

এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপরের দল চার্বাককে পুড়িয়ে মারেনি? তুষানলে হত্যা করেনি সত্যাশ্রয়ীদের? সে যুগে গ্রীসের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন দর্শন একদল জ্ঞানী ও গুণী মানুষ রক্ষা করে চলতেন। তাঁদের বলা হোত সফিষ্ট। সেই দলের প্রবর্তক ছিলেন দার্শনিক প্রোটাগোরাস। তিনি খৃঃ পূর্ব ৫৮২ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই আড়াই বছর আগে প্রথম বলে গেলেন,—Man is the measure of things-অন্য ভাষায় আমাদের দেশের কবি চণ্ডীদাস একই কথা বলে গেছেন,—শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।

বিদ্রোহী এম, এন, রায় সেই একই সত্য বিংশ শতাব্দির প্রখর মধ্যাহ্নে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে গেছেন—Man is the measure of everything. ইহাই পথিকৃৎ কম্‌রেড এম, এন, রায়ের নব মানব বাদের মূল-সূত্র। স্বাধীন ভারতের তমসাচ্ছন্ন আকাশে আবার নতুন করে বিদ্রোহী এম, এন, রায়কে স্মরণ করার প্রয়োজন হয়েছে। এম, এন, রায় বহুবার জোরের সঙ্গে নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, মানুষকে মানুষের সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিগৃহীত ও পদানত সর্বহারার দল আজ অন্ধের মত পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ক্ষুরধার লেখায়, শক্তিশালী বক্তৃতায়, যুক্তিপূর্ণ কথায় আবেগলেশশূন্য আলাপে ও আলোচনায় কমরেড রায় এই মুক্তির দর্শনই philosophy of freedom প্রচার করে গেছেন।

কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত রাজনীতিদলের মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর মতবাদকে মর্যাদা দেয় নি। তাই নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত জনগণের মুক্তির বাণী তিনি একাকী বেদনার সঙ্গে বহন করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

রায়ের চরিত্র ছিল সুপ্রসিদ্ধ লেখক ইবসেনের বিখ্যাত পুস্তক The enemy of the people এর প্রধান চরিত্র ষ্টক্ম্যানের মত। ইবসেন এক জায়গায় লিখে গেছেন,—The strongest man in the world is the man who stands alone. রায়ের চরিত্রে এই সত্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।'

মুক্তির উপাসক, মেহনতি মানুষের দরদি বন্ধু কমরেড এম, এন, রায় দৃঢ়তার সহিত শুধু একটি কথা তাঁর অনুগামীদের বলে গেছেন, The only thing I will teach you is to become freedom loving men আমি আপনাদের মাত্র এইটুকু শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই, আপনারা স্বাধীনতাকামী মানুষ হোন।

সেই অদ্ভুত মানুষটির জীবন কথা জানতে ইচ্ছা হয় না কি ?

শিশু নরেন :

কমরেড এম, এন, রায়ের পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁদের আদি বাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ক্ষেপুত গ্রামে। এই গ্রামে বহু প্রাচীন ক্ষেপুতেশ্বরী দেবীর মন্দির আজও বর্তমান। এই দেবীর পুরোহিত বংশে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়েরা বংশানুক্রমে আজও এই মন্দিরের পুরোহিত।

নরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে এই মন্দিরের পূজা ও বলিদান এবং বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে।

নরেন্দ্রনাথের ঠাকুরদা ভৈরবানন্দ ভট্টাচার্য ক্ষেপুতেশ্বরী দেবীর পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁর যজমান বৃত্তি ছিল। নরেন্দ্রনাথের পিতার নাম ছিল দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। তিনি যজমানবৃত্তি পরিত্যাগ করে চব্বিশ পরগণা জেলার আড়বেলিয়া গ্রামের জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃ-বংশ ছিল একটি আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার। সরল, ধর্ম-প্রাণ এবং সংস্কারপ্রবণ ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং ভক্তিমতী মাতা বসন্তকুমারীর গর্ভে আড়বেলিয়া গ্রামে নরেন্দ্রনাথের জন্ম। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার চতুর্থ সন্তান। ১২৯৩ সালে ৮ই চৈত্র, ইংরাজী ২২শে মার্চ ১৮৮৭ সাল, সোমবার বেলা দেড়টার সময় তাঁর জন্ম হয়।

গ্রামের শান্ত, সুন্দর ও অনাবিল পরিবেশ। স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। নরেন্দ্রনাথের বাল্য জীবনকে প্রভাবিত করে। জন্মাবধি নরেন্দ্রনাথ চিন্তাশীল, স্বল্পভাষী ও স্বপ্ন-বিলাসী ; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির। গ্রামের চারিদিকের অবারিত মাঠ। স্নিগ্ধ বাতাস, নির্মল জল আর নীল আকাশ। তাঁর শিশু মনকে এক অজানা আনন্দে দোলা দিত। ক্রমশঃ বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের স্বভাবে বহু সদ্‌গুণের বিকাশ দেখা দিতে লাগলো। শিশু নরেন্দ্রনাথ সকলের আদরের পাত্র।

কিন্তু হলে কি হয়, নরেন অত্যন্ত জেদী ও অভিমানী। যা ধরবে তা করা চাই-ই চাই। মাতা বসন্তকুমারী কোন মতে শিশু-পুত্রের অদম্য জিদ্‌ ভাঙ্গাতে পারতেন না। অস্থির হয়ে উঠতেন। আর রাগ করে বলতেন, তোকে নিয়ে আমি আর পারি না। শিশু নরেন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দিতেন,—তুমি কেন মা, কেউ আমাকে নিয়ে পারবে না।

সেদিন কে জানতো চালকলা বাধা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বংশের এই শিশু পুত্রের সঙ্গে বিশ্বের কোন মানুষই একদিন পেরে উঠবে না।

শিক্ষা আরম্ভ :

আড়বেলিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নরেন্দ্রনাথের হাতে খড়ি। অপর পাঁচজন ছেলের মতই একদিন নরেন শ্লেট, খাতা, ধারাপাত ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথমভাগ বগলে পুরে বাবার হাত ধরে স্কুলে গেলেন। পাঠ্যজীবন শুরু হোল। দীর্ঘ এগারোটা বছর তাঁর আড়বেলিয়া গ্রামেই কাটলো। কলকাতা থেকে বারো মাইল দক্ষিণে কোদালিয়া গ্রামে ছিল তাঁর মামার বাড়ি। ১৮৯৭ সালে তাঁর বাবা তাঁকে পড়াশুনার জন্য পাঠালেন মামার বাড়ীতে। নরেন মামার বাড়ীতেই থেকে গেলেন। কোদালিয়ার কাছেই হরিনাভি গ্রাম। হরিনাভি এ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুলটিও অনেক দিনের। শিক্ষকরাও ছাত্রদের প্রতি খুব যত্ন নেন। নরেন এই স্কুলে ভর্তী হলেন। এক বছরের মধ্যেই নরেনের বাবাও আড়বেলিয়া স্কুলের কাজ ছেড়ে কোদালিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন।

ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথ অতি সাধারণ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্র হলে কি হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দৃষ্টি তিনি সহজেই আকর্ষণ করেন। তাঁর বালক সুলভ চপলতার ভেতর কোন কপটতা বা নোঙরামি ছিল না। আর অমায়িক ও মিষ্টি ব্যবহারের জন্য তিনি সমভাবে শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই প্রিয় ছিলেন। বাল্যকাল হতেই দেশ বিদেশের ইতিহাস পড়তে আর অঙ্ক কষতে তাঁর খুবই ভাল লাগতো। স্কুলের শিক্ষক তাঁর অঙ্কের জ্ঞান দেখে বিস্মিত হোতেন।

তখন কে জানতো একদিন এই বালক পরবর্তীকালে সুদূর জার্মানীতে বসে আইনষ্টাইনের সঙ্গে ল-অব-রিলেটিভিটি আলোচনা করবেন।

বিপ্লবী আন্দোলন ঃ

উন-বিংশ শতাব্দির শেষপাদে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। তখন নরেন আড়বেলিয়া স্কুলের ছাত্র।

দেশের জন চিত্তে স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লেগেছে। দেশের যুবকদের মনে নতুন চিন্তাধারা সবে দানা বেঁধেছে।

রাজা রামমোহন রায় রেঁনেসা আন্দোলনের 'প্রথম আগুন' জ্বালিয়ে যান। দিকে দিকে তার সাড়া পড়ে গেছে।

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনায় সে যুগে তিনটি ধারা কাজ করতো। প্রথম—রামমোহন ধারা, দ্বিতীয়—হিন্দু কলেজী ধারা এবং তৃতীয় নব-হিন্দুত্বের ধারা।

হিন্দু-কলেজী ধারা যার নামের সঙ্গে জড়িত আজও সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে আমরা স্মরণ করি। তার নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক। বয়স মাত্র সতেরো বছর। তিনিই ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার অনির্বাণ আগুন জ্বেলে গেছলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

বাংলা সাহিত্যে তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ-মঠ সেদিন সবার ঘরে ঘরে। সন্তানদের আদর্শ, তেজ ও ব্রহ্মচর্য যুব চিত্তকে উদ্বেলিত করতো। তাই ছাত্রদের হাতে হাতে আনন্দমঠ,—মুখে মুখে বন্দে-মাতরং।

সেই পরিবেশে নরেনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তখন তার বয়স মাত্র এগারো বৎসর। সেই বয়সেই নরেন দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ।

নরেনের জন্মের মাত্র দু'বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। দেশ-প্রেমিক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রথম সভাপতি।

নরেনের বয়স তখন মাত্র দশ কি এগারো। একদিন বাড়ীতে

তাঁর বাবা কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছেন। আলোচনা অত্যন্ত গোপনে চলছিল। সেই প্রথম নরেন কংগ্রেসের নাম শুনলেন। আর কংগ্রেস কি তা জানবার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করতে লাগলো।

ভবিষ্যতে নরেনের জীবনে কংগ্রেস বহুভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কলেজের এক চেনা ছাত্রের হাতে ইটালির স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক ম্যাট্‌সিনির জীবনকথা বইখানি নরেন প্রথম দেখলেন। তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। বইখানি দেখে পড়তে ইচ্ছা হোল। সেই ছেলেটিকে বললেন,—দাদা, বইখানা পড়তে দেবেন।

ছেলেটি তাদেরই গ্রামের। বইখানি নরেনকে পড়তে দিল।

নরেন মুগ্ধ হয়ে বইখানা পড়তে লাগলেন। সব বোঝবার তাঁর বয়স না হলেও, পড়তে খুব ভাল লাগলো বইখানি।

নরেনের দৃষ্টি খুলে গেল। তখন লাইব্রেরীর শেলফ্‌ থেকে বিপ্লবের ইতিহাস খুঁজে খুঁজে বার করতে লাগলেন।

পড়লেন গারিবল্ডীর জীবন ও কর্মের ইতিহাস। দেশ বিদেশের বিপ্লবের দর্শন। হাতে এল রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। আরও কত বই।

এমনি করে কটা বছর কেটে গেল। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে মনে বিপ্লব সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা জন্মাল।

নরেন ভাবতে বসলেন। তাঁর প্রথমেই মনে হোল কোন রাজনৈতিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই বিপ্লবের দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও সঠিক এবং স্পষ্ট ধারণা বা চিন্তা থাকা চাই।

নরেনের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল হোল, কোন কাজে নামার আগে

চিন্তা, মনন ও অনুশীলন দ্বারা উপলব্ধি করা দরকার কোন রাস্তায় এবং কি কৌশল অবলম্বন করে বিপ্লবের পথে নির্ভয়ে এগুতে হবে।

আরও ভাবলেন,—যদি মত ও পথ সম্বন্ধে সঠিক চিন্তা ও নির্ভুল ধারণা না থাকে, তাহলে অপরের প্ররোচনায় বিভ্রান্তি আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার নির্ভুল পথ ঠিক জানা হয়ে গেলে কারও সাধ্য নেই বিপ্লবীকে আদর্শচ্যুত করতে পারে।

কোন প্রলোভন অথবা কোন ভয়,—রাজ-ভয়, মৃত্যুভয় বা লোক ভয়, তাকে বিচলিত করতে পারবে না।

তাই নরেন নির্ভুল চিন্তা-পদ্ধতি শিক্ষা করতে বসলেন।

বাংলাদেশে বিপ্লবকে রূপায়িত এবং সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য যে সকল গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠলো এবং আদর্শবাদী সর্বত্যাগী যুবকরা গোপনে অংশ গ্রহণ করলেন তাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি অন্যতম।

আনন্দ মঠের আদর্শে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ বিষয়ে অনুশীলন সমিতি শিক্ষা দিতেন। দৈহিক কঠোরতা, অমোঘ ব্রহ্মচর্য পালন, এবং বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ প্রত্যেক সদস্যের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

অনুশীলন সমিতির আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নরেন সমিতির সদস্য ভুক্ত হোলেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম মাত্র চৌদ্দ বৎসর।

সর্বপ্রকার দৈহিক কৃচ্ছ্রতা, শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সংযম পালন করে নরেন অনুশীলন সমিতির কঠোর পরীক্ষায় প্রশংসা এবং যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন্।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। চৌদ্দ বছরের স্কুলের এক নিরীহ ছাত্র অনুশীলন সমিতির মত এক ভয়ঙ্কর গুপ্ত সমিতির বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত সদস্য! যে দলের আসল উদ্দেশ্য হোল সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতে ইংরাজ উৎখাত! ইংরাজ রাজত্বের অবসান!! তাই না?

ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে এই অপরাধের নাম—রাজদ্রোহ, ইহার চরম শাস্তি প্রাণদণ্ড। কেউ জানতেও পারলো না এই ভাল মানুষ, নিরীহ ও গোবেচারা এক স্কুলের ছাত্র নির্মম সশস্ত্র বিদ্রোহী !

সুরেন্দ্রনাথ ও জাতীয় আন্দোলন ঃ

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে ভারতীয়দের উচ্চ পদে নিয়োগের সুপারিশ ছিল। বিশেষতঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে এ দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

তদনুযায়ী ১৮৬০ সালে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম আই, সি, এস, নিযুক্ত হন্। পরে অধিক সংখ্যক ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আরম্ভ করেন।

মুখে বললেও ভারতীয়দের আই, সি, এস, পদে নিয়োগ ইংরাজ মনে প্রাণে চাইতেন না। তাই তাঁরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মকানুন এমন কঠোরভাবে রদবদল করলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে এই পদে নিয়োগ দুরূহ হয়ে উঠলো।

তারই প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন।

সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রতিভাবান্ বক্তা ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা বাগ্মী প্রবর বার্ককেও হার মানাত।

ইংরেজের বহুবিধ অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকারের দাবীতে ১৮৮৫ সালে মুখ্যত: বাগ্মীপ্রবর ও দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

তদবধি সুরেন্দ্রনাথকে জাতীয়তার জনক নামে অভিহিত করা হয়। সে যুগে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় সর্বজনপূজ্য সর্ব-ভারতীয় নেতা

দেশে আর ছিল না বললেই হয়। এই বিরাট পুরুষকে দেখবার জন্য এবং তাঁর মুখ থেকে অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা শুনবার জন্য সভায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হোত। সে যুগে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন জনগণের মুকুটহীন সম্রাট।

এ হেন সুরেন্দ্রনাথ একদিন হরিনাভি গ্রামের মত এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে আসছেন। খবরটি আগেই নরেনের কাছে পৌছে গেছে। নরেন সেই দিনই বিকেলে ইস্কুলের খেলার মাঠে বন্ধুদের আর ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে এ সম্বন্ধে আলাপ করতে বসলেন।

শুনেছিস্ ত, আস্‌ছে রবিবার দেশ-নেতা সুরেন্দ্রনাথ আসছেন হরিনাভি গ্রামে।

ম্লান মুখে বন্ধুরা বল্লে—হ্যাঁ, তা শুনেছি, কিন্তু হেড-মাষ্টার মশায় কড়া হুকুম দিয়েছেন, তাকে দেখতে কেউ যেন না যায়।

নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—সে কি? তা হয় না কি রে? সর্বজনপূজ্য, জাতীয়তার জনক, দেশের নেতা সুরেন্দ্রনাথকে দেখতে যাবি না? আর তার বক্তৃতা শুনবি না? দেশের আর জাতির এত বড় বন্ধু আর কে আছে বল? তাকে না দেখলে, তার কথা না শুনলে, জীবনই বৃথা। নিশ্চয়ই যাব আমরা সবাই। হেড মাষ্টারের অন্যায় আদেশ মানবো না। মানি না।

নরেন সেই দিনই ছাত্র বন্ধুদের নিয়ে গোপনে একটা দল পাকালেন। ঘুরে ঘুরে দশখানা গ্রামের ছেলেদের জড়ো করলেন। এক বিরাট শোভাযাত্রা করে সুরেন্দ্রনাথের সভায় যোগ দিলেন। প্রধান শিক্ষকের রোষ কষায়িত আঁখি। গ্রামের পুলিসের হিংস্র ভ্রুকুটি। সবই তুচ্ছ হোল।

নরেনের সংগঠন শক্তি ও সাহস দেখে সবাই অবাক! গ্রামের লোকেরা ত ভয়েই অস্থির। কি হয়? কি হয়? কারণ তখন ইংরেজের দোদ্দণ্ড প্রতাপ। আর দেশের লোকের মনের অবস্থা,—ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই; গৌরাঙ্গ দেখিলে মাটিতে লুটাই।

সেই যুগে নরেন বিদ্রোহী !

নরেন একদিনেই ছাত্র ও তরুণদের নেতার আসন দখল করলেন। অবশ্য, তার পর দিনই নরেনকে রাষ্টিকেটেড করে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল।

নরেন ইংরেজের গোলাম-খানা ছাড়তে বাধ্য হোলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিদ্যার্জনস্পৃহা একদিনের জন্যও একবিন্দু হ্রাস পায় নি।

হরিনাভি গ্রামে একটা লাইব্রেরী ছিল। তিনি রোজই সেখানে যেতেন। দেশ বিদেশের ইতিহাস পড়তেন। আর পড়তেন বিভিন্ন বিষয়ের বই।

একদিন হরিনাভিতে নরেনের সঙ্গে পথে হরিকুমার চক্রবর্তীর আলাপ হোল।

নরেন, তুমি নাকি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছ ?

নরেন হাসতে হাসতে বল্লেন,—হরিদা, ইংরেজের গোলাম-খানা ছেড়ে দিলাম।

হরিকুমারও হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন—তাহলে এক কাজ কর, জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তী হও। পড়া ছেড়ো না। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।

তারপর হরিকুমার চক্রবর্তী নরেনের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। কত দেশ বিদেশের স্বাধীনতার কথা নিয়ে গল্প হোত। গল্প বলতেন —পরাধীন পরপদানত ভারতের কথা। দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সর্বহারা দুঃখী মানুষের ব্যথা বেদনার কথা। ইংরেজের অত্যাচার ও অবিচারের কথা। কত কথা। কত ইতিহাস। কত গল্প।

নরেন একদিন বললেন,—হরিদার মুখে আমি নতুন ভগবানের কথা শুনলাম।

বাংলার আকাশে বাতাসে সে দিন বিপ্লবের রুদ্র বিষাণ বেজে উঠেছে। বিপ্লবের অগ্নি শিখা লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে অমিত

তেজে ছুটেছে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। ভাইসরয়ের ক্ষমতাদ্দীপ্ত গদিতে বসে আছেন মদগর্বী লর্ড কর্জন। সে দিন বৃটিশ সিংহের লাঙ্গুল স্পর্শ করে কার সাধ্য! বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। এমনি প্রতাপ।

নরেন সেই যুগে মুক্ত, স্বাধীন ও প্রাণচঞ্চল নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর।

অবাক কাণ্ড!

১৯০২ সাল।

হরি কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে নরেন এলেন ক'লকাতায়। আলাপ হোল ডন্-সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে যুগে সতিশ চন্দ্রকে বলা হোত জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ। তখন ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবে ডন-সোসাইটি পুরাদস্তুর রাজনৈতিক পাঠ দিচ্ছেন।

সতিশ চন্দ্র কথা প্রসঙ্গে আরম্ভ করলেন, দেখ নরেন,—রাজনৈতিক পাঠ গ্রহণের প্রথম ধাপে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য। দেশ সেবা এক ধরণের সন্ন্যাস। আত্মদানে উন্মুখ তরুণদের মনে দেশ-সেবারূপ তপস্যার আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে।

নরেন অবাক হয়ে শুন্‌লেন।

সতিশ চন্দ্র বলে চলেছেন,—আর সেই কাজে প্রথম জ্বালাতে হবে জ্ঞানের আগুন। তাই আমরা ডন্-সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছি।

তুমি আস্‌বে নরেন সামনের রবিবারে? পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী 'সাধারণ শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। আর আমি কিছু বলবো—নাগরিক জীবন ও আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে।

নরেন মহা খুসী,—নিশ্চয়ই আসবো।

সতিশ চন্দ্র হেসে বললেন—আমরা ঠিক করেছি আস্‌ছে মাসে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলাব। তিনি আসবেন। এ ছাড়াও ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় এবং ড: তারকনাথ দাস দুজনেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলতে রাজী হয়েছেন।

শুনে সুখী হবে, রমেশ চন্দ্র দত্ত বলবেন,—জাতীয় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে।

কলকাতা থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে তাঁর গ্রাম। সুতরাং নরেনের কোনই অসুবিধা নেই। নিয়মিত এইসব বক্তৃতা শুনবার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত থাকতেন।

একদিন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে নরেনের দেখা হয়ে গেল মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে। সে দিন তিনি সবে মেদিনীপুর থেকে ফিরেছেন। সেটা ১৯০৩ সাল। পাঁচ দিনে মেদিনীপুরের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে তেরোটি বক্তৃতা দিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে কলকাতায় ফিরলেন নিবেদিতা।

সতিশ চন্দ্র বললেন,—আমি এই ছেলেটির কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

নিবেদিতা খুব আদর করে মায়ের মত নরেনের পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। কত দেশ বিদেশের গল্প বললেন। কত দেশ প্রেমের কথা হোল।

তারপর, শীতের প্রথম প্রভাতে নির্মল সুর্যের কিরণ সম্পাৎ অনাবৃত পথচারীর দেহে যেমন এক মিষ্ট মধুর উষ্ণআমেজ সৃষ্টি করে, তেমনি ভগিনী নিবেদিতার অপূর্ব কথামৃত নরেনের দেহ মনে এক উষ্ণ পুলক ও অজানা শিহরণ সৃষ্টি করলো।

নরেন শুনতে লাগলেন নিবেদিতার অমৃত সমান কথা।

নিবেদিতা বলে চলেছেন,—তোমাদের আরাধ্য দেবী ভারত মাতা। মন্দিরের বেদীতে ফুল পাতা সাজিয়ে, আর ধূপ-ধুনা দিয়ে তাঁকে পাবে না। তিনি আছেন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে। দারিদ্র্যের তাড়নায়; তোমার আত্মাহুতিতে তাঁর আবির্ভাব।

নিবেদিতা আরও বললেন—আসল ভারতবর্ষকে যদি চিনতে চাও, তাহলে অশোক ও আকৃবরের মত স্বপ্ন দেখ। বই পড়ে দেশপ্রেম শেখা যায় না। এ প্রেম সমগ্র সত্বাকে আবিষ্ট করে রাখে। দেহের অস্থি-মজ্জায় এ ভালবাসা থাকা চাই। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তার অনুভূতি চাই।

এই কথাগুলি নরেনকে পাগল করে তুললো।

স্বাধীনতা আন্দোলন :

১৯০২ কি ১৯০৩ সাল :

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদা চরণ মিত্র এক লিপি বিস্তার পরিষদ গঠন করেছেন।

আর ১৯০৭ সালে ডন পত্রিকার বাংলা শাখা দেব-নাগরী লিপির সাহায্যে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছেন।

সতীশবাবু ডন-পত্রিকার একখণ্ড নরেনের হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখ নরেন, বাংলা ডন পত্রিকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেব-নাগরী হরফে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

নরেন তাড়াতাড়ি কাগজখানি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। তাই ত? অপূর্ব!

চমৎকৃত হোলেন ডন-পত্রিকার সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেখে। তাঁর চোখ খুলে গেল। বললেন—আজ থেকে আমি ভারতীয়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গোড়া পত্তন হোল। প্রথমে ১৯১/১ বৌ বাজার ষ্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়ীতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজ আরম্ভ হয়। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদা মহারাজের কাজে ইস্তফা দিয়ে বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলন

পরিচালনার জন্য কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই পরিষদের তখন সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী এবং সম্পাদক হীরেন দত্ত। সতীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।

১৯০৮ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে গড়ে উঠলো। নরেন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলেন এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে ভর্ত্তি হয়েছিলেন।

এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদ পরে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়; বর্তমানে উহা যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়।

জাতীয় বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় নরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দের সহিত পরিচিত হন। শ্রীঅরবিন্দের বিরাট পাণ্ডিত্য। অসীম-জ্ঞান; অদম্য দেশ প্রেম। সর্বোপরি তাঁর দেব-চরিত্র। নরেন্দ্রনাথকে অভিভূত করে।

একদিন নরেন হরিকুমারকে বললেন—হরিদা, শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম ভারতের প্রতিটি তরুণের আদর্শ হওয়া উচিৎ।

নরেনের পিঠে হাত দিয়ে হরি কুমার বললেন—আশীর্বাদ করি, শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ যেন তোমার জীবনে রূপায়িত হয়।

আর একদিনের কথা ঃ

নরেন ডন সোসাইটির অফিস ঘরে ঢুকেছেন। দেখলেন সতীশ বাবুর সঙ্গে এক ভদ্রলোক গল্প করছেন। দেখে মনে হোল এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিরাট পুরুষ। তিনিও নরেনকে বেশ ভালভাবে অনেক বার চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

নরেন চলে যাবার পর সতীশ বাবু বললেন—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে সম্বর্দ্ধনা করার অপরাধে বেচারীকে গ্রামের ইস্কুল থেকে

রাষ্টিকেটেড করেছিল। এখন আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র।

ভদ্রলোকটি তারপর নরেন সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক খবর জেনে নিলেন। তারপর নরেনের সঙ্গে আলাপ করলেন। লোক চরিত্র বুঝতে তাঁর জোড়া মেলা ভার। তিনি এক আঁচড়ে চিনে নিলেন—নরেন খাঁটি সোনা।

তাঁর নাম যতীন মুখার্জী। সবাই বলতো—বাঘা যতীন। তিনি নিজের হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী লোক। ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা।

বিপ্লবী দলে ছেলে সংগ্রহ অতি কঠিন কাজ। তাই নানা ভাবে খোঁজ খবর নেওয়া চললো। যতীন মুখার্জী গেলেন উত্তর পাড়ায়। বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। উভয়ে গোপনে অনেক পরামর্শ হোল। অমরেন্দ্রনাথ বললেন—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি নরেন সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

একথা শুনে যতীন মুখার্জী বললেন—তবে আর কি। অরবিন্দ বাবু যখন 'ভাল ছেলে' বলেছেন, তখন আর ভাবতে হবে না।

এবার থেকে বিপ্লবের আদর্শে নরেন্দ্রনাথের কঠোর শিক্ষা শুরু হোল। নরেনকে বিপ্লবের উপযুক্ত সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে হবে। একদিন সে হবে সেনাপতি।

নরেন, তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান? জিজ্ঞাসা করলেন যতীন মুখার্জী।

নরেন মৃদু হেসে বললেন—জানি সামান্য।

তখন যতীন মুখার্জী বললেন—তোমাকে ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালান, সাঁতার কাটা, লাঠি খেলা, রিভলভার চালনা শিখতে হবে। আমি এই সব বন্দোবস্থ করবো।

গুপ্ত-সমিতির গোপন আড্ডায় নরেন্দ্র নাথের শিক্ষা আরম্ভ

হোল। বিপ্লবের দর্শন ও কার্য পরিক্রমা দুই-ই তিনি শিখলেন শিক্ষাগুরু যতীন মুখার্জীর কাছে।

ছ'মাসের মধ্যে নরেনের দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। নিয়মিত ব্যায়াম। নিত্য কঠোর দৈহিক পরিচালনা। ফলে দেহ সুঠাম সুন্দর ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

সন্তান যেমন মায়ের স্নেহ-চ্ছায়ায় তিলে তিলে বেড়ে ওঠে, যতীন্দ্রনাথের সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনের অপূর্ব সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো।

নরেনের কচি মুখে তখনও গোঁফের রেখা দেখা দেয় নি। দীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, সুঠাম ও সুন্দর ছেলেটি। চোখে মুখে সংকল্পের একটা বলিষ্ঠ দীপ্তি। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ। অন্তরের সব স্নেহ উজাড় করে দিলেন। বালক নরেনের ওপর।

তিনি আদর করে বলতেন—নরেন আমার বাল-সূর্য। দেশের মাটির খাঁটি সোনা। একে দিয়ে আমাদের বিপ্লব সফল হবে। পুরো বিশ্বাস আমার নরেনের ওপর আছে।

যাত্রা হোল শুরু ঃ

১৯০৫ সাল ;

নরেনের পিতা মৃত্যু-শয্যায়। আত্মীয় স্বজন সবাই উপস্থিত। কেবল নরেনের দেখা নেই। তিনি দেশের কাজে কোথায় গেছেন কেউ জানেনা। যে দিন বাড়ীতে ফিরলেন তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

অনুতপ্ত পুত্র সদ্য বিধবা জননীর পায়ের কাছে বসলেন। মাকে সান্ত্বনা দিলেন।

সেই দিন থেকে বিপ্লবের পথ নরেনের জীবনে হোল কণ্টক শূণ্য।

নরেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশমাতৃকার পদ প্রান্তে। সর্বস্ব ত্যাগের ব্রত নিয়ে।

কিছুদিন পরের ঘটনা।

সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেড়িয়েছে।

কার্জনী কুঠারে বাংলা দেশ দ্বি-খণ্ডিত ! জাতীর সংহতি বিনষ্ট !! দেশ বিপন্ন !!!

সংবাদ পড়ে নরেন লাফিয়ে উঠলেন। এই অন্যায়, অযৌক্তিক ও অবিচারের প্রতিকার চাই। লর্ড কর্জনের বে-আইনী আদেশ আমরা মেনে নেব না। আমরা বিদ্রোহ করবো।

ছুটে গেলেন কলকাতায়। সে দিনই সুরেন্দ্র নাথ একটা গোপনীয় ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছেন। বিপ্লবী নেতাদের নিয়ে। সব বিপ্লবী নেতারা উপস্থিত। শ্রীঅরবিন্দ আছেন। আছেন যতীন মুখার্জী, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন ব্যানার্জী, উল্লাস কর, বারীন ঘোষ, ভূপতি মজুমদার এবং আরও অনেকে। নরেন ও সেখানে বসলেন।

জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ। তিনি বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বাংলা দেশের প্রতিটি শহরে। আর সুদূর পল্লীর গ্রামে গ্রামে। প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলবো। অন্যায় মানিনা, মানবো না।

লর্ড কার্জনের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম। সকলের মুখে এক কথা। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ করতেই হবে।

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষকে একতা সূত্রে বাঁধবার জন্য তিনি ক্ষুরধার লেখনি ধরলেন,—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার স্থল, ধন্য হউক, ধন্য হউক, ধন্য হউক, হে ভগবান।

সে দিন বাঙ্গালীর কণ্ঠে নতুন মন্ত্র। বুকে নতুন বল। চোখে স্বাধীন ভারতের নতুন স্বপ্ন।

তারপর এল স্মরণীয় ৩০সে আশ্বিন। বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন। লাল সূতোর রাখী নিয়ে বাঙ্গালী ছুটলো। বাঙ্গালীর দুয়ারে। ভাই ভায়ের হাতে রাখী বাঁধলো। বোন বোনের হাতে। তারপর সংকল্প নিল,—

সারা বাংলাদেশ এক। বাঙ্গালী জাতি এক। কোন স্বৈরাচারী কর্জনের সাধ্য নেই বাংলা মাকে দ্বিখণ্ডিত করে। আমরা রক্ত দেব। প্রাণ দিব। বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না। অখণ্ড বাংলার জয় হোক।

সারা বাংলায় আগুন জ্বলে উঠলো। বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত হোল। কি উৎসাহ! কি উদ্দীপনা!!

বরিশালের জন-নায়ক অশ্বিনী কুমার দত্ত। তাঁর মাথায় পড়লো পুলিশের রেগুলেশন লাঠির প্রচণ্ড আঘাত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। তিনি বন্দেমাতরং বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর রক্তে বরিশালের রাজপথ লাল হয়ে উঠলো। বরিশাল ধন্য হোল।

দেশ পূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ দেশ নেতারা সভা ও শোভাযাত্রা করে বৈপ্লবিক জন-মত সৃষ্টি করতে লাগলেন। আরম্ভ হোল বিলিতি কাপড় বয়কট আন্দোলন।

নরেন গর্জে উঠলেন—আমি বিদ্রোহী।

কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন গান বাঁধলেন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন 'দুঃখিনী' মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

আরম্ভ হোল। কলকাতার রাজপথে। শহরের অলিতে গলিতে। বিলিতি বস্ত্রের বহ্নিউৎসব।' আর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে উঠলো একটি মাত্র ধ্বণী,—বন্দে মাতরং!

তারই মুর্চ্ছনা দিকে দিকে। বিদ্রোহী নরেন। দেশ-মাতৃকার বেদী মূলে তিনি নিজেকে একান্তভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। দেহের প্রতিটি

রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে সেবা করতে প্রস্তুত। যেন জ্বলন্ত দেশ প্রেমের অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ।

নেতারা মিটিং ডেকেই খালাস। কিন্তু সভায় জনগণকে আহ্বান করে নিয়ে আসবে কে? জনসভার সংবাদ প্রচার করবে কে? বাইরে সংগঠন কই?

নরেন সম-বয়সী তরুণ বন্ধুদের নিয়ে বসে গেলেন। পুরোণ সংবাদ পত্রের উপর হাতে লিখে মিটিং এর খবর সর্বত্র প্রচার করতে হবে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে পুরোণ সংবাদ পত্র সংগ্রহ করেছেন। সারা রাত ধরে লিখলেন। তারপর নিজে আর বন্ধুদের সঙ্গে নিলেন। দেওয়ালে দেওয়ালে আঠা দিয়ে সেগুলো টাঙ্গিয়ে এলেন। জন সমাবেশ চাই।

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই; সকল কাজেই নরেনের সমান উৎসাহ। তখন তার বয়স মাত্র আঠার বছর।

পুলিশ ত নয়, যেন পাগলা কুকুর!

বন্দে মাতরং শুনলেই লাঠি তুলে তেড়ে মারতে আসে।

শ্রীঅরবিন্দ শুনে বললেন—শুধু সভাসমিতি আর মিটিং করে কিছু হবে না। আরও কিছু করা চাই। পুলিশের মার আর জুলুম বেড়েই চলেছে।

একটা গোপন সভা ডাকা হোল। ৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে। একটা ভাড়াটে বাড়ীতে। সেই সভায় যতীন মুখার্জী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদু গোপাল মুখার্জী, অতুল ঘোষ, উপেন ব্যানার্জী, নলীনি কান্ত কর, বিনয় ভূষণ দত্ত, ল্যাড্‌লি মোহন মিত্র, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিপ্লবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নরেন সারাদিন সেখানে আছেন।

সবাই বললেন—কেবল মাত্র সভা, শোভাযাত্রা, এবং বৃটিশ দ্রব্য বয়কট করে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়ান যাবে না। যাবে না বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ করা। সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব চাই।

অমর চ্যাটার্জী বললেন—কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ঠিক। পূজা-হোম-যাগ, দেবতা অর্চ্চনা, এ সবে কিছুই হবে না হবে না ; ভূণীর কৃপাণে কর গো পূজা।

স্বল্পভাষী বিপ্লবী বারীনদা গম্ভীরভাবে বললেন—এ সব দৈত্য নহে তেমন।

তাই ঠিক হোল। আগ্নেয় অস্ত্র চাই। শ্রীঅরবিন্দেরও তাই মত।

অস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রচুর অর্থ ব্যতীত কোন সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

কিন্তু টাকা দেবে কে ? দেশের বড় লোকেরা কেউ এ কাজে স্বেচ্ছায় টাকা দেবে না। রাজরোষের ভয়ে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত। বড়লোকেরা দেশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

তাহলে উপায় ? নরেন বললেন—কেন ? আনন্দমঠে ত এ ইঙ্গিত আছে। সরকারী খাজনা খানা ও তহবিল এবং ধনীর ধন লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা সরকারের খাজনা মাঝপথে লুঠ করে নি ?

যতীন মুখার্জী বললেন—পারবে নরেন ? নরেন মুখে কিছু না বলে চুপ করে চলে গেলেন। সেদিন আর কোন কথা হোল না।

রাতে শুয়ে শুয়ে যতীন্দ্রনাথ ভাবছেন—বোমা, রিভলভার, কার্তুজ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহে আমার অন্তর সাড়া দেয় না। অথচ টাকা চাই। কে এগিয়ে আসবে ?

শুধু নরেনের মুখখানাই স্বতঃই ভেসে উঠছে।

সপ্তাহখানেক পরের কথা

নরেন জন কয়েক অত্যন্ত বিশ্বস্ত বিপ্লবী বন্ধুদের ডেকেছেন। গোপন আলোচনায় বসবেন। কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে ?

ঠিক হোল রেলওয়ে স্টেসনের ক্যাশ লুট করা হবে। দূরে দূরে স্টেশন। প্রায় অরক্ষিত। ধরা পড়ার ভয় কম।

নরেন বন্ধুদের বললেন—আমরা প্রথমে চাংড়িপোতা রেলওয়ে ষ্টেসনের (বর্তমান সুভাষনগর) ক্যাশ লুট করবো। এই দেখ আমি একটা প্ল্যান ও পরিকল্পনা তৈরী করেছি।

সহ-কর্মীরা পরিকল্পনা পরীক্ষা করে খুসী হোলেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের এক বিশেষ দিন। শীতের অন্ধকারে নরেনের নেতৃত্ব চারজন বিপ্লবী সহকর্মী রিভলভার হাতে নিয়ে চ্যাংড়ি পোতা ষ্টেসনের ক্যাশ আক্রমণ করেন।

ক্যাশ বাবু তখন একান্তে টাকার হিসাব মেলাচ্ছেন। নির্জন নীরব অন্ধকার স্টেসন।

হঠাৎ দেখা গেল তিন চার জন মিলিটারি পোষাকে সজ্জিত যুবক। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। তাদের ভারী জুতোর শব্দে ক্যাশ বাবু চমকে উঠলেন।

তাদের প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। তাদের মধ্যে একজন বললেন—হ্যাণ্ডস্ আপ।

ক্যাশ বাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। কি করবেন বুঝতে না পেরে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। এরা সব ডাকাত নাকি?

তখন সেই দলের সর্দ্দার এগিয়ে এসে বললেন—টাকার থলিটা দিয়ে দিন। চেঁচালে বা শব্দ করলে আমরা গুলী করতে বাধ্য হব।

ক্যাশ বাবু কাঁপতে কাঁপতে টাকার থলিটা ডাকাতদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা শীতের রাতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আজব কাণ্ড! সবাই ভদ্রবেশী। এরা ডাকাত? এমনিতর দুর্ঘটনার কথা কেউ ত আগে শোনেনি।

সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে খবর রটে গেল। রেলওয়ে পুলিশ লাফিয়ে

এলেন। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে পুলিশের বড় কর্তারা ছুটে এলেন। চারিদিকে—ধর, ধর; খোঁজ-খোঁজ রব।

গোয়েন্দা পুলিশ নানা বেশে। নানা ফিকিরে-ফন্দীতে। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। থানার দারোগা থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় সবাই; ছুটোছুটি করতে লাগলেন। গুজ গুজ, আর ফুস-ফুসের অন্ত নেই। চাপা গলায় আরও চাপা আলোচনা। কিন্তু টাকার বা ডাকাতদের কোনই কিনারা হোল না।

সন্দেহক্রমে পুলিশ শুধু নিরীহ লোকদের—যাকে-তাকে ধর-পাকড়, গ্রেপ্তার আর জুলুম করতে লাগলো।

এই প্রথম দেশে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু

(১৯০৭ সাল—ডিসেম্বর মাস)

হরিনাভি পুলিশের গোপন রিপোর্ট ছিল নরেনের বিরুদ্ধে। সুতরাং নরেনের গতিবিধির ওপর পুলিশ কড়া নজর রাখলো। নরেন বুঝলেন পেছনে টিক্‌টিকি লেগেছে। তিনিও সাবধান হোলেন।

বাড়ীতে পুলিশ খানা-তল্লাসি করতে এল। নরেন আগে থেকে খবর পেয়ে লুকিয়ে পড়লেন। ধরা গেল না। এমনি করে বেশ কিছুদিন কাটলো।

শেষে একদিন নরেন ধরা পড়ে গেলেন। সেদিন যাত্রী সেজে ষ্টেসনে এসেছেন। হাতে মিষ্টির হাড়ি। ট্রেনে উঠতে যাবেন, অমনি খপ্ করে পুলিশ তাঁর হাত চেপে ধরলো।

নরেন ভাল মানুষের ভান করলেন। বললেন—কুটুম বাড়ী যাচ্ছি। দেখছেন ত হাতে মিষ্টির হাড়ি। বিশেষ প্রয়োজন। ধরলেন কেন?

সহজ, সরল ও সপ্রতিভ ভাব। কোন ভয় ডর নেই!

পুলিশ তা শুনবে কেন? হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে; হাজতে

পুরলো। যেন কিছুই হয় নি। সেইভাবে নরেন পুলিশের সঙ্গে গেলেন।

পুলিশ সাড়ম্বরে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলো। কিন্তু আসামীর তরুণ বয়স। নিরীহ চাউনি। কচি মুখ। আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সার্টিফিকেট। এই সব দেখে বিচারক নরেনকে মুক্তি দিলেন।

নরেন হাসি মুখে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

বন্দে মাতরং

১৯০৮ সাল

আগেই বলেছি। ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র আনন্দ-মঠের অনুকরণে ১৯০১-২ সালে অনুশীলন সমিতি গঠন করেন।

পরে যুগান্তর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'যুগান্তর' নামক স্বতন্ত্র বিপ্লবীদলের উদ্ভব হোল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে 'যুগান্তর দল গঠিত হয়।

সন্ধ্যা ও যুগান্তর পত্রিকা। বাংলার বৈপ্লবিক ভাবধারার যুগ্ম বাহন। সেই সময় বন্দে-মাতরং নামে আর একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। সে পত্রিকাখানি কংগ্রেসের গরম-পন্থী জাতীয়ভাবাদী দলের মুখপত্র।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি। বাংলার তদানীন্তন যুব-চিত্তকে দেশ প্রেমের বন্যায় উদ্বেলিত করে তুলতো।

আর স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডঃ ভূপেন দত্তের 'যুগান্তরের জ্বালাময়ী ভাষা, নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গের মত তরুণ বিপ্লবীদের ঘুম ভাঙ্গাতো। নতুন উৎসাহের সঞ্চার করতো।

১৯০৮ সালের সন্ধ্যা-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব আর বন্দে-মাতরং পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ উভয়ে রাজ-দ্রোহের অপরাধে

ক'লকাতার তদানীন্তন চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস-ফোর্ডের আদালতে অভিযুক্ত হন।

সুশীল সেন। পনেরো বছরের একটি দুধের বাচ্চা। পুলিশ-ইনস্পেক্টারকে প্রহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। কিংস-ফোর্ড সেই বালককে পনেরো ঘা বেত্র-দণ্ডের আদেশ দেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। মুরারী পুকুরের বিপ্লবী কেন্দ্র থেকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকীকে মজঃফরপুরে পাঠান হোল। কিংস-ফোর্ডকে হত্যা করার জন্য। সে ইতিহাস আমরা সবাই জানি।

কিন্তু এই ঘটনায় বৃটিশ সিংহের টনক নড়লো। পুলিশ সচকিত হয়ে উঠলো।

১৯০৮ সালের ২রা-মে। পুলিশ সন্ধান করে আলিপুরে একটা বোমা-প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কার করলো। মুরারীপুকুর উদ্যানেও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফলে, আলিপুর বোমার মামলা নামে এক বিরাট মামলা পুলিশ দায়ের করে। এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাস কর কানাইলাল প্রভৃতি আরও অনেকে আসামী ছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আসামীদের পক্ষে সেই মামলা পরিচালনা করেন। আর সে মামলার বিচারক ছিলেন বীচ্-ক্রফ্ট। তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিলাতের সহপাঠি ছিলেন।

এই মামলা চালু থাকা কালে আলিপুর জেলের মধ্যে রাজ-সাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যা করার অপরাধে, কানাই লাল দত্তের প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়।

ফাঁসীর দণ্ডাদেশ পেয়ে কানাইলাল বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্ নি। বিচারকের সামনেই গান গেয়েছিলেন,—

সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই বাংলা দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।

কানাই লালের দেহের ওজন ; ক দিনে দশ পাউণ্ড বেড়ে গেল। মুখের হাসিটি, আগের মতই, মুখে লেগেই রইল। আশ্চর্য ! এ যেন জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন।

ফাঁসীর আগের দিন সন্ধ্যা। কানাইলাল ফাঁসীর আসামীর নির্দিষ্ট সেলে বসে জনৈক আইরিশ ওয়ার্ডের সঙ্গে হেঁসে হেঁসে গল্প করছেন।

ওয়ার্ডার ত জানে। কানাই লালের পর দিন ভোরে ফাঁসী হবে। তাই সে আর কানাই লালের হাসিমুখ সহ্য করতে পারছিল না।

কানাই, আজ তুমি হাসছো ; কাল ভোরে তোমার ঠোট্ দু'খানি নীল হয়ে যাবে।

সে কথা শুনে কানাই কিছু বললে না। আবার একটু হাঁসলো।

পর দিন ভোর। যথারীতি কানাইকে ফাঁসীর বধ্য-মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বধ্য-ভূমিতে সবাই উপস্থিত। জেলার দেখলেন। কানাই যেন কাকে খুঁজছেন। তিনি বললেন—কার সঙ্গে দেখা করবে ?

কানাই মৃদু হেঁসে জবাব দিল,—আমার সেলে কাল ডিউটিতে যে ওয়ার্ডার ছিলেন, তাঁকে একবার দেখতে চাই।

আইরিশ ওয়ার্ডারটি ছুটে এলেন।

কানাই তাকে বললেন—কি মিষ্টার ? আমার ঠোঁট্ দুটো কি নীল হয়ে গেছে ?

ওয়ার্ডার ত অবাক। তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। ফাঁসীর পর ওয়ার্ডারটি ছুটে গেল। শ্রীঅরবিন্দের সেলে। গোপনে জিজ্ঞাসা করলো,—আপনার দলে এই রকম ছেলে আর কতগুলি আছে ?

শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন,—সময় আসুক। তখন এ প্রশ্নের জবাব পাবে।

শ্রীঅরবিন্দের মানসপটে, তখন বোধ করি বালক নরেনের সংকল্পদ্দীপ্ত মুখখানা ভেসে উঠেছিল।

আলিপুর বোমার মামলা চালু হলো। সন্দেহ ভাজন বহু বিপ্লবী জেলে গেল। পুলিশ মনে করলেন। বাংলা দেশের বিপ্লব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম কি অত সহজে ঠাণ্ডা করা যায়? যায় না।

নরেন ভাবলেন, এই ত সময়। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে নব-উগ্যমে আবার কাজ আরম্ভ করতে হবে। বাংলা দেশের বিভিন্ন বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য নরেন দিকে দিকে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেই সময় মাণিকগঞ্জের বাবরা গ্রামে। শশী সরকারের বাড়ীতে। এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হোল। তাতে গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সচকিত হয়ে উঠে।

আবার নতুন করে চারিদিকে ধর পাকড় শুরু হোল। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বহু গোপন তথ্য সংগ্রহ করলেন। তাতে বৃটিশ আমলাতন্ত্র সন্ত্রস্ত। বৃটিশ রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য বাংলার দিকে দিকে আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।

বহু ব্যক্তিকে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করা হোল। পুলিশ কলকাতা এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। তারপর পুলিশ একটা বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করলো। তার নাম দেওয়া হয়,—হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা।

অনেকগুলো ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ একদিন শেষ রাত্রে নরেনকে গ্রেপ্তার করলো। তিনি হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান আসামী ছিলেন। পরে বিচারের জন্য তাকে চালান দিল।

সেটা ১৯১০ সাল। নরেন প্রায় কুড়ি মাস জেল হাজতে আছেন। হাজতের স্বতন্ত্র নির্জন কক্ষ। বন্দী-জীবন যাপন করছেন। পুলিশের

চোখে যে সব আসামী খুবই বিপজ্জনক তাদের স্বতন্ত্র নির্জন সেলে রাখাই তখন নিয়ম ছিল। পুলিশের চোখে নরেন বিপজ্জনক আসামী। কারণ ইতিপূর্বে ডাকাতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিল। সুতরাং পুলিশ তাকে মহা সমারোহে স্বতন্ত্র নির্জন সেলে রাখলো।

স্বতন্ত্র নির্জন কারাকক্ষের অন্ধকার অন্তরাল। নরেনের নতুন জীবন শুরু হোল। মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের অনুশীলনে তিনি সকল শক্তি প্রয়োগ করলেন। মনকে একাগ্র করা। সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করার অভ্যাস ও শিক্ষা। তিনি জেল হাজতে আরম্ভ করেন।

মনকে বশীভূত করবার যৌগিক পদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলের নির্জন কারাকক্ষে বসে অভ্যাস করতেন। নরেন হয়ত সেই পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন।

নরেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বিপ্লবীদের ধরা পড়লে চলবে না। আর যদি ধরা পড়ি, তাহলে যে কোন উপায়, কৌশল ও বুদ্ধি করে জেলের বাইরে আসতেই হবে। নচেৎ বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করা যাবে না।

সে জন্য চাই বৈপ্লবিক কাজে অনন্য সাধারণ দক্ষতা। স্থির বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্ন মতি। আর চাই অফুরন্ত সাহস। কর্ম শক্তি। দৈহিক কৃচ্ছতা বরণ।

পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ। নরেনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৌশল ও চতুরতার সঙ্গে পেরে উঠতো না।

পুলিশের সাথে লুকোচুরি ঃ

এক দিনের কথা।

হঠাৎ দেখা গেল। হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে নরেন্দ্রনাথ শেয়ালদহের ট্রাম থেকে নামলেন। অত্যন্ত নির্লিপ্তভাব।

হাতে একটা পুটুলি। ট্রাম থেকে নেমে ধীরে ধীরে উত্তর মুখে চলেছেন। যেন কত ভাল মানুষটি।

পুলিশ ভাবলো—আজ আর বাছাধনের রক্ষা নেই। পালাতে হবে না। বামাল শুদ্ধ হাতে নাতে ধরবো।

পুলিশ সাদা পোষাকে পিছু নিয়েছে। নরেন দু পা এগিয়েই বুঝে নিলেন। টিকটিকি পেছনে লেগেছে। শহরের রাস্তা-ঘাট। অলি-গলি। শুলুক-সন্ধান। সব তাঁর নখ দর্পনে। সোজা ঢুকে পড়লেন। সামনের একটা অপরিসর কানা গলিতে। আরও একটু এগিয়েই একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী। নির্বিকার চিত্তে ঢুকে পড়লেন। ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে। তারপর কোথায় মিলিয়ে গেলেন। তার হদিশ পাওয়া গেল না।

পুলিশ কানা গলির মোড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। হতাশ হয়ে ফিরে গেল। জল-জ্যান্ত ছ ফুটের ওপর লম্বা লোকটা। কপপুরের মত উবে গেল গ্যা? হ্যাঁ!

পুলিশ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো। ব্যাপার কি? রেলে ট্রামে, গাড়ীতে, নৌকায়, পথে ঘাটে, সর্বত্র একই অভিযোগ। লোকটা ভেল্কি জানে নাকি? নিশ্চয়ই আগে যোগ-তপ কিছু করতো। অদৃশ্য হবার কোন মন্ত্র জানে। আশ্চর্য! আশ্চর্য ত বটেই!!

আর এক দিনের ঘটনা।

পিয়ালী নদীতে নৌকা করে নরেন চলেছেন। কাছাকাছি গ্রাম। বিপ্লবীদের একটা গোপন বৈঠক বসবে। নরেনের নৌকা তরতর, ছল ছল করে আপন মনে নাচতে নাচতে চলেছে। বর্ষার ভরা যৌবনে পিয়ালী উপচে উঠেছে। আর পিয়ালীর রুচিকর হাওয়ায় নরেনের চোখে একটু ঘুমের আমেজ এসেছে। তিনি ওরি মধ্যে একটু অন্য.মনস্ক হয়ে পড়েছেন।

হঠাৎ নজরে পড়লো। একখানা নৌকা পাল তুলে দ্রুত গতিতে যেন তাঁর নৌকাকে অনুসরণ করছে। নরেন বুঝে নিলেন এ

পুলিশের কাণ্ড। মুহূর্তের মধ্যে প্ল্যান ' ঠিক করে ফেললেন। নরেনের নৌকা যেমন চলছিল, তেমনিই চললো। পুলিশ ভাবলো আসামী সন্দেহ করেনি। ঠিক করলো গ্রামের ঘাটে নৌকা থামলেই আসামীকে গ্রেপ্তার করা যাবে। আর কি? হাতের কাছে।

গ্রামের ঘাটে যথা সময়ে নরেনের নৌকা থামলো। সদলবলে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো নৌকার ওপর। ততক্ষণে আসামী সাফ্। নৌকা ঠিকই আছে। কিন্তু শিকার পালিয়েছে। তাইতো!

পুলিশ মহামুস্কিলে পড়েছে। এই অশান্ত, দুর্দান্ত, দামাল ছেলেকে নিয়ে। পুলিশ হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

এবার লালবাজার ঃ

সার চার্লস টেগার্ট তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। নাম করা দুঁদে পুলিশ অফিসার। যার দুর্দান্ত শাসনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এ হেন বিখ্যাত টেগার্ট সাহেব একটা আঠার-উনিশ বছরের ছেলেকে কায়দা করতে পাচ্ছেন না। কি লজ্জা!

হঠাৎ সাহেব খবর পেলেন। আরপুলি লেনের জাহাজীদের কাছ থেকে নরেন সেই দিন সন্ধ্যায় লুকিয়ে একটা রিভলভার কিনেছেন। তাঁর বাড়ী তল্লাসী করলেই আসামীকে বামাল শুদ্ধ ধরা যাবে। মহা খুসী টেগার্ট সাহেব। গদ গদ হয়ে বল্লেন—সার্চ পার্টি আমি লীড্ করবো।

আর রক্ষা আছে! পুলিশের বড়-মেজ-সেজ-ছোট সব অফিসারের দল পরম উৎসাহে বন্দী গাড়ী নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে নরেনের বাড়ী ঘেরাও করে ফেললেন।

তখন সকাল হয়ে গেছে। নরেন বৈঠকখানায় চেয়ারে বসে কি একখানা বই খুলে পড়ছেন। টেগার্ট সাহেব বীর দর্পে বাড়ীতে ঢুকলেন। দেখলেন সামনেই নরেন। একখানা বই নিয়ে বসে। চোখে জ্বলন্ত মনোযোগ।

অবশ্য তার আগেই নরেন পুলিশকে আড়চোখে দেখে নিয়েছেন এবং কর্তব্য কর্মও ঠিক করে ফেলেছেন।

টেগার্ট সাহেব বল্লেন—তোমার বাড়ী সার্চ করতে এসেছি।

উত্তম, সার্চ করুন, নরেন বল্লেন।

টেগার্ট সাহেব সামনের চেয়ার খানা টেনে নিয়ে বসলেন। আর নরেন অমায়িকভাবে টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। গল্প বলে মন ভোলাতে তিনি ওস্তাদ। সাহেব গল্প করছেন। আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা দু ঘণ্টা ধরে সমগ্র বাড়ী তন্ন তন্ন করে সার্চ করে রিপোর্ট দিল, —না, সার, কিছুই পাওয়া গেল না।

টেগার্ট সাহেব তখন ম্লান মুখে নরেনের সঙ্গে গুড-বাই, বলে চলে গেলেন। সাহেব নিঃসন্দেহ। না কিছু নেই।

কিন্তু সাহেবের যদি সত্যকার দৃষ্টি থাক্‌তো, তাহলে দেখতে পেতেন। তারই সামনে, টেবিলের ওপর বইখানার তলায় রিভলভারটি চাপা পড়ে আছে।

একেই বলে হাতের কৌশল। আর উপস্থিত বুদ্ধি! এই বুদ্ধির খেলায় নরেন ভবিষ্যতে বহু বিপদের হাত থেকে অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে রক্ষা পেয়েছেন।

মেভারিক ও দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঃ

মার্চ ১৯১৪। যতীন মুখার্জী একটা বড় রকমের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পুলিশের চণ্ড-নীতির ফলে অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তরের বিশিষ্ট কর্মীর দল এবং নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।

তার ফলে, সারা বাংলায় বিভিন্ন বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে বরিশালের শঙ্কর মঠ, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি, কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতি এবং নোয়াখালি, খুলনা ও মাদারীপুরের দল উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত

মাদারিপুর দলই কর্মতৎপরতায় এবং দুর্ধর্ষতায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অবশ্য ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য ও সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (মধুদা) অমিতবিক্রমে বিপ্লবের কাজে মেতে ছিলেন।

যতীন মুখার্জী এই দলগুলিকে সংগঠিত, একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করেন। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই মিলন প্রচেষ্টার অপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দিকে দিকে অভূতপূর্ব উৎসাহ। প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দ।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল। রডা কোম্পানীর আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই গাড়ী উধাও। তারিখটি ছিল ২৬শে আগষ্ট ১৯১৪। সেই সব অপহৃত অস্ত্র, গুলী, বারুদ, বন্দুক বিপ্লবী পুলিন মুখার্জীর হাতে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন সেই গুলি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিপ্লবীরা নিশ্চিন্ত!

কিন্তু কি করে যেন পুলিশ খবর পেয়েছে।

কিছু অস্ত্র ও গুলী বারুদ তখনও আছে পুলিন মুখার্জীর হেপাজতে। সেগুলো এখনই পাচার করতে হবে। নতুবা সমূহ বিপদ। খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সবাই। কখন সার্চ হয়। কখন পুলিশ হামলা করে। সর্বনাশ!

নরেনের কাছে খবর এল।

এই কথা? আজই ব্যবস্থা হবে।

ছিদাম মুদি লেনের বাড়ী। ছোট ভাই অমর ঘোষ রাস্তায় পায়চারী করছেন। রাত অনেক হয়েছে। দু'জন হিন্দুস্থানী কুলি বাড়ীর সামনে এসে দাড়াল। তাদের মাথায় মস্ত দুটো ভারী বাক্স।

কুলিদের খালি গা। মাথায় গামছা বাঁধা। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে। দূর থেকে চেনবার উপায় নেই। কাছে গিয়ে ঠাহর করে অমর দেখলেন।

সেই কুলি দু'জন আর কেউ নয়। আমাদের বিপ্লবী নায়ক

নরেন ভট্টাচার্য আর অতুল ঘোষ। অমর ঘোষ একটু চুপ করে থেকে বললেন।

ছোড়দা, আমি হলফ করে বলতে পারি—এখানে টেগার্ট সাহেব উপস্থিত থাকলে, তোমাদের দুজনকে কুলি ছাড়া আর কিছু বলতো না। আমিই তোমাদের চিনতে পারি নি।

তখন সকলের কি হাসি।

এবার দেখা দিলেন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক বিরাট পুরুষ। তিনি স্বনামধন্য বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। বাংলার বেগবান ও প্রাণবান বৈপ্লবিক ধারাকে সমগ্র উত্তর ভারতে তিনিই ছড়িয়ে দিলেন।

আবার নতুন করে পরামর্শ সভা বসলো। পরিকল্পনা হোল। এক দিনে, একই সময়ে, কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজের সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ফলে ইংরেজের রাজ-সিংহাসন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে।

এই মহান ব্রতে,—অর্থ চাই, অস্ত্র চাই, আর চাই সর্বত্যাগী একদল বিপ্লবী তরুণ।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ তখন জোর চলেছে। চেষ্টা চললো জার্মানদের কাছ থেকে অস্ত্র চাইতে হবে। যতীন মুখার্জী এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন বিশ্বস্ত সহচর নরেন্দ্রনাথ। কর্ম তৎপরতা চললো। অত্যন্ত গোপনে। গরিলা যুদ্ধের অনুকরণে, বৈপ্লবিক সৈনিক গড়ে তুলতে হবে সারা ভারতে।

রাওলাট কমিটি ঃ

অগ্নিযুগের বিপ্লবের রোমাঞ্চকর ইতিহাস আজও প্রচ্ছন্ন। আজও প্রহেলিকাময়। ইংরাজ রাজশক্তিকে অপসারণের জন্য দিকে দিকে যে গুপ্ত কার্যকলাপ চলছিল তার পূর্ণ ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। আজও রহস্যাবৃত।

সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিময় ইতিহাস ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সে যুগে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ছিল। সেই সব তথ্য প্রমাণসহ সংগ্রহের জন্য তদানীন্তন ভারত সরকার এক কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটিতে চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ রাওলাট্। তাঁরই নাম অনুসারে কমিটির নাম হয়, রাওলাট কমিটি। সেই কমিটিতে বাঙ্গালী সদস্য ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র।

রাওলাট কমিটির রিপোর্ট পড়লে জানা যাবে। বাংলা দেশে এক সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। তাতে বহু বিপ্লবীর নাম আছে। তাতে জানা যাবে। চাংড়িপোতার নরেন ভট্টাচার্য সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন।

আরও সব নাম সেই রিপোর্টে ছিল। তাতে দেখা যাবে,—যতীন মুখার্জী, অমর ঘোষ, নলীনি কান্ত কর, মন্মথ বিশ্বাস (মোটাদা) ভোলানাথ চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ, হরি কুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ভূষণ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী কর্মী জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন।

বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে, বিক্ষিপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীগণ সুইজারল্যাণ্ডে এক সম্মেলনে মিলিত হন। প্রবাসী ভারতীয়গণের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা যুদ্ধরত জার্মান গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করেন। তার মানে, ভারতীয় বিপ্লবীগণকে অস্ত্র সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিকে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য গণেশ দত্ত, পিংলে, বিনায়ক রাও, কাপলে আমেরিকা ত্যাগ করে ভারতে আসেন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এলেন কর্তার সিং। তারা সবাই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হোলেন।

কাশী বিপ্লবী শাখার শচীন সান্যালের ওপর ভার পড়লো কার্য

পরিচালনার। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক করলেন কখন ও কি ভাবে বিপ্লবীগণ ইংরেজের দুর্গ, ব্যরাক, অর্থভাণ্ডার ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি আক্রমণ করবেন।

তারিখ ও সময় সব ঠিক। ১৯১৫ সাল : বিপ্লবীরা শুধু অপেক্ষা করছেন ইঙ্গিতের। সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। ভারতীয় সেনাদলেও কেমন যেন একটা চন্‌মনে ভাব। হঠাৎ এক বিশ্বাসঘাতক এই গোপন তথ্যটি ইংরাজ শিবিরে ফাঁস করে দিল।

উত্তর ভারতে বিপ্লবের সমাধি রচিত হোল। রাসবিহারী বসু গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে জাপানে পালিয়ে গেলেন। ভারত ব্যাপী তল্লাসী আর গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়ে গেল।

উত্তর ভারতে বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হবার পর। বাংলার যতীন মুখার্জী সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোলেন। জার্মান সরকারের কাছে অস্ত্রের জন্য আবার আবেদন জানালেন।

জার্মানরা ভাবলেন। যদি ভারতের বিপ্লবীগণের প্রচেষ্টা জয় যুক্ত নাও হয়। তাহলে ভারতীয় বিপ্লবীগণকে দমন করবার জন্য বৃটেনকে তাদের সামরিক শক্তির একটা অংশকে ভারতে নিয়োজিত রাখতে হবে। জার্মানদের ইহাই লাভ।

কিন্তু কি ভাবে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়? যতীন মুখার্জী সাংহাইয়ের জার্মন কন্‌সাল-জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ঠিক হোল নতুনভাবে বাংলা দেশ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা আরম্ভ হবে।

ভোলানাথ চ্যাটার্জী পেনাং ও ব্যাঙ্কক থেকে রায়কে সাহায্য করবার জন্য নির্দেশ পেলেন।

এই মহান ব্রতে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে নিযুক্ত করা হোল নরেন ভট্টাচার্যকে। পাশপোর্ট অফিস থেকে ছদ্মনামে নরেনের জন্য একটা

জাল পাশ পোর্ট তৈরী করে আনা হোল। তারপর মান্দ্রাজ জেটি থেকে একটা ডাচদের জাহাজে চেপে নরেন বাটাভিয়ার মুখে চললেন। তখন তিনি পলাতক আসামী।

সেটা ১৯১৫ সাল। নরেনের বয়স মাত্র আটাশ বছর। সাজলেন একজন ভারতীয় ব্যবসাদার। জাভা থেকে ভারতের জন্য চিনি খরিদ করবেন। তখন জাভার চিনি ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এক চেটিয়া ব্যবসা।

'হরিদা'—হরিকুমার চক্রবর্ত্তী কলিকাতার চীনে বাজারে 'হ্যারি এণ্ড সন্স' নাম নিয়ে একটা ভুয়া অর্থাৎ জাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা। বাটাভিয়াতেও তাঁর লোক আছে। নরেন উঠলেন বাটাভিয়াতে একটা হোটেলে। সেখান থেকে সব বন্দোবস্ত পাকা করা হোল। অনেক ভারতীয় বিপ্লবী সে দেশে লুকিয়ে ছিলেন। তারাও গোপনে দেখা করলেন।' সাহায্য দিলেন। দেখা হোল কনসালের সঙ্গে। কন্‌সাল জেনারেল বললেন, আমরা ঠিক করেছিলাম অস্ত্রসম্ভারযুক্ত জাহাজখানাকে করাচীতে পাঠাব। কিন্তু এখন আমরা সে জাহাজ বাংলায় পাঠাতে প্রস্তুত।

জাহাজের নাম মেভারিক। স্থির হোল সুন্দর বনের কোন নির্জন ও গোপন পরিবেশে মেভারিক নোঙর করবে। বন-জঙ্গল ঘেরা বনপথে মাল নামবে। কাক পক্ষীও টের পাবে না।' জায়গাটির নাম রায় মঙ্গল।

আরও ঠিক হয়েছে এই কাজে নরেনকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দেবেন অতুল ঘোষ, মন্মথ বিশ্বাস, শৈলেশ্বর বসু, নরেন ঘোষ চৌধুরী।

সব বন্দোবস্ত পাকা। কেবল জাহাজ আসার প্রতীক্ষা।

এদিকে কি হোল বলি :

কথা ছিল ১৯১৫ সালে জুলাই মাসের এক নির্ধারিত গোপনীয় দিনে রায়-মঙ্গলে মেভারিক নোঙর করবে। তারিখটা ছিল ২৫শে জুলাই।

নরেনের কর্ম-ব্যস্ততার অন্ত নেই। চোখে ঘুম নেই। খাওয়া দাওয়ার সময় নেই। এর মধ্যে দু'দিন রায়-মঙ্গল ঘুরে এলেন। জায়গাটা, পুরো সার্ভে করা হোল। একটা ম্যাপ তৈরী হোল।

কোন পথে যেতে হবে। আর কোন পথে পালাতে হবে। তার সব প্ল্যান ঠিক হোল। ক্যানিং থানার দারোগার ওপর কড়া নজর রাখলেন। আশে পাশের থানার খবর নিলেন।

দু'দিন আগেই যাত্রা করলেন। নামখানা হয়ে ফ্রেজারগঞ্জে এলেন। গোপনে দুর্গম পথ ধরলেন। তারপর উল্টো পথ ধরে রায়-মঙ্গলে পৌছুলেন।

সঙ্গে আছেন দু'জন অন্তরঙ্গ অতি বিশ্বাসী সহ-কর্মী। একজনের নাম শৈলেশ্বর বসু। আর একজনের নাম মন্মথ বিশ্বাস।

লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর ১৯১২ সালে বোমা নিক্ষেপ করার অপরাধে বসন্ত বিশ্বাসের আর আমীর চাঁদের দিল্লীতে ফাঁসি হয়। মন্মথ হোলেন বসন্ত বিশ্বাসের ছোট ভাই। তিনি শেষ জীবনে উত্তরপাড়ার অমর চ্যাটার্জীর বাড়ীতে থাকতেন।

সবাই আশা করছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়-মঙ্গলে মেভারিক নোঙর করবে।

নরেন ঠিক করলেন। সেই দুর্গম ও গভীর জঙ্গলে মাল নামাতে হবে। জাহাজের লস্কররা তাঁকে সাহায্য দেবে।

অতি নির্জন স্থান। অত্যন্ত দুর্গম পথ। আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সাপ, বাঘ আর কুমীরের বাসা। সেখানে মাল নামলে কাক-পক্ষীও টের পাবে না।

তারপর মাছ ধরার কত জেলে নৌকা যাচ্ছে। বন্ধুর জঙ্গ

একটা পাওয়া যাবে। তখন কৌশলে ও সতর্কতার সঙ্গে মাল যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া যাবে। যাক্ তাহলে নিশ্চিন্ত।

সকাল হয়েছে। কাক কোকিল ডেকে উঠেছে। উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্যের অন্ত নেই। নরেন চোখে একটা দূরপাল্লার দূরবীণ নিয়ে বসেছেন। দেখছেন সাগরের বুকে কোন জাহাজ আসছে কিনা।

অনেক আশা। অনেক ভরসা। অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি জাহাজ। কত রাইফেল! কত পিস্তল! কত বন্দুক! কত বোমা, বারুদ! কত রণ-সম্ভার! মাল নামার অপেক্ষা মাত্র। শুরু হবে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ভারতের মুক্তি আসবে।

বন্দে মাতরং! জয়ের উল্লাস!

মন্মথ বিশ্বাস সকাল থেকে ছুটো-ছুটি করছেন। গোপনে খবর সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। সকাল চলে গেল। জাহাজের দেখা নেই। নেই কোন খবর। বুকটা দুর দুর করে উঠলো।

সাগরের বুকে প্রখর রৌদ্র। আস্তে আস্তে রৌদ্রের অমিত তেজ স্তিমিত হয়ে এল। কিন্তু মেভারিক কই? কোন পাত্তা নেই জাহাজের।

দারুন সংশয় ও সন্দেহের দোলায় মন দুলছে। তাহলে মেভারিক বিশ্বাসঘাতকতা করলো নাকি?

দেখতে দেখতে সূর্যদেবও ঢলে পড়লেন। সন্ধ্যা নেমে এল। আর চুপ করে থাকা যায় না। মন্মথকে গ্রামে পাঠান হোল।

যাও মোটা দেখে এস ভাই। গুপ্ত সমিতির শিবিরে কোন খবর আছে কিনা? এখনই সংবাদ চাই। নচেৎ সমূহ বিপদ। বিপদ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ঐ দূরে একটা পুলিশ লঞ্চ যাচ্ছে না? সর্বনাশ! পুলিশ খবর পেয়েছে নাকি। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মন্মথ ছুটে ফিরে এলেন। সর্বনাশ হয়েছে! মেভারিক ধরা পড়েছে। খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেছে।

পালাও, পালাও। নরেন নিরুপায়। নিমেষে অদৃশ্য হোলেন। দলবলের চিহ্ন নেই।

হাঁটা পথে রায়মঙ্গল থেকে পালালেন। সামনে দুর্ভেদ্য কাঁটা বন ও ঘন অন্ধকার জঙ্গল। তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন সবাই।

ফণী মনসা, শিয়াল কাঁটা, কেয়া কাঁটা। আরও কত শত নাম-না-জানা বিষাক্ত বুনো কাঁটা গাছ, নানা রঙয়ের, নানা জাতের।

সর্বাঙ্গ কেটে রক্তাক্ত। সর্ব দেহে অসহ্য যন্ত্রনা। সেদিকে কারও হুস্ নেই। লক্ষ্য শুধু সামনের দিকে।

এদিকে বিপদের ওপর বিপদ। আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এঁটেল মাটি। রাস্তা পেছল আর কাদায় ভরা। নরেন তিনবার আছাড় খেলেন।

দুর্ভেদ্য জঙ্গল। অতি কষ্টে পার হোলেন। এলেন মাবরবাটি গ্রামে। একটা ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের চণ্ডিমণ্ডপে কারা গল্প করছে।

পাছে কেউ দেখতে পায়। সন্দেহ হয় কারও মনে। তাই অন্য পথ ধরলেন। এলেন আর একটা গ্রামে। গ্রামটির নাম পাট্-গোরা। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে এলেন আর একটা গ্রামে। গ্রামটির নাম কথনবেড়িয়া। আরও দূর দূর গ্রাম। সামনে যোগেশগঞ্জ। তারই গায়ে রামপুর। ছাড়িয়ে গেলেন সে সব।

রাস্তার আর শেষ নেই। পা আর চলে না। তবু চলতে হবে। আর কত দূর। 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।'

পথে একজন গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

আপনারা?

পাখী শিকার করতে জঙ্গলে এসেছিলাম ভাই। এই ফিরছি।

গ্রামের মানুষ। তাই বিশ্বাস করলে।

তারপর তাঁরা অমানুষিক পরিশ্রম করলেন। অনেক পথ ঘুরলেন। অনেক দুঃখ পেলেন। অনেক বিপদ কাটিয়ে উঠলেন।

শেষে এসে পৌছলেন এক নদীর ধারে। ছোট নদী। কোথাও জন-মানবের চিহ্ন নেই। পার হবার ব্যবস্থা নেই। সাঁতরে সেই নদী পার হবার জন্য সকলে জলে ঝাপিয়ে পড়লেন।

তারপর রাতের অন্ধকারে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও পথ-শ্রমে কাতর হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কোন মতে কলকাতায় এসে পৌছিলেন।

অস্ত্র সংগ্রহের প্রথম রাউণ্ডে পরাজয় ঘটলো।

পরে অবশ্য খবর পাওয়া গেল। মেভারিক ধরা পড়ে নি। গোয়েন্দা বিভাগের চর এই গোপন তথ্যটি সংগ্রহ করে। পরে তারা যথাস্থানে সেটি ফাঁস করে দেয়। ইংরাজের নৌ-বহর সতর্ক হয়ে পড়ে। তারা সম্ভাব্য সকল পথ আটক করে। ফলে মেভারিক রায়-মঙ্গলে এসে পৌছুতে পারে নি।

কিন্তু মেভারিকের ওপর অনেক আশা ছিল।

জার্মান কন্সাল হেল্‌ফ্রিশ বাটাভিয়াতে নরেনকে বলেছিলেন,—

মেভারিকে প্রচুর রণসম্ভার পাঠাচ্ছি। এগুলো ঠিক মত ব্যবহার করবে। তাহলে কলকাতা মহানগরী তোমরা অনায়াসে দখল করতে পারবে। এ বিশ্বাস আমার আছে।

এই জাহাজে আছে ত্রিশ হাজার রাইফেল। এক কোটি বিশ লক্ষ গুলী, আর দু'লাখ টাকার স্বর্ণমুদ্রা।

আর তোমাকে দিচ্ছি চল্লিশ হাজার টাকা নগদ। তুমি আজই কলকাতায় ফিরে যাও। কাজ আরম্ভ কর। জার্মান সরকার তোমাদের পেছনে আছে। তাই অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে নরেন রায়মঙ্গলে গেলেন।

অনেক আশা। অনেক ভরসা। কিন্তু বিধিবাম।

* * *

একান্তে বসে তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। দেশকে তোমরা ভালবেসেছিলে। তাই সেদিন দেশের ভরা নদী তোমাদের পার করেনি। দেশের রাজ-পথ তোমাদের কাছে অবরুদ্ধ ছিল।

তোমাদের সাঁতরে নদী, নালা, খাল, বিল পার হতে হয়েছিল। কণ্টক বিস্তীর্ণ বন-জঙ্গলে, দূর দুর্গম পথে, ঘৃণিত চোরের মত অন্ধকারে ক্ষত-বিক্ষত দেহে কোন দিকে না চেয়ে তোমরা ছুটেছিলে।

সেদিন কেউ তোমাদের আশ্রয় দেয় নি, আহার দেয় নি, মুখে একটু আহা বলেনি।

কবি নবীনসেনের কথাই সত্য হয়েছিল—ভারতে পাবি না স্থান, করিতে বিশ্রাম।

শুধু উদ্ধৃত ছিল কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল, নির্যাতন আর ফাঁসীর দড়ি।

পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী, মুক্তি-পথের অগ্রদূত। তোমাদের চরণে আমাদের শত-শত, সহস্র-সহস্র, কোটি-কোটি নমস্কার।

আজ শুধু ভাবি। কি তোমরা পেলে? এই স্বাধীন ভারতে। কে তোমাদের মূল্য দিল?

তাই মহাপ্রাণ বীর শহীদ যতীন মুখার্জীর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে পণ্ডিচেরীতে আজ শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে শেষ আশ্রয় নিতে হয়েছে। আজীবন সংগ্রামী মুক্তি পাগল কম্‌রেড এম, এন, রায়কে দুঃখে, দারিদ্রে ও একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবের মহান নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীকে চলন্ত ট্রেনের কামরায় নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে।

রাজনীতির দাবাখেলায় আজ তোমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে: এমনিই হয়! এমনিই হয়।

গার্ডেনরীচে ডাকাতি :

১৯১৫ সালে গোড়ার দিকের কথা।

যতীন মুখার্জীর নিকট গোপনে খবর এল।

বার্ড কোম্পানীর জুট মিলের শ্রমিকদের সপ্তাহে প্রায় পঁচিশ

কি ত্রিশ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। আর সে টাকা ব্যাঙ্ক থেকে মিলে আসে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায়।

যতীন মুখার্জী এ সংবাদে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সাহেব কোম্পানীর টাকা। সুতরাং সে টাকা ডাকাতি করে কেড়ে নাও। কারও আপত্তি থাকতে পারে না। দেশের লোকও খুশী হবে। এই সুযোগ।

নরেনকে এ কাজে নেতৃত্ব নিলেন।

নরেন ছুটলেন গার্ডেনরীচে। সঙ্গে গেলেন অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, ফণী চক্রবর্তী। আরও দু-একজন বিশ্বাসী কর্মী।

অনুসন্ধানে জানা গেল। ঘোড়ার গাড়ীতে করে মিলে টাকা আসে। সঙ্গে থাকে মাত্র একজন বন্দুকধারী দারোয়ান।

ইস্পাহানির জুট মিলটা পার হলে একটা নির্জন জায়গা।

নরেন জায়গাটা সার্ভে করে এলেন।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে, নরেনের নেতৃত্বে সবাই যথাস্থানে উপস্থিত। প্রত্যেকের কাছে রিভলভার। সবাই গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছেন।

যথাসময় ঘোড়ার গাড়ী ধীর মন্থরগতিতে আসছে। কোচুয়ান নির্ভাবনায় গাড়ী চালিয়ে চলেছে। আর মাঝে মাঝে চাবুক উচিয়ে অবলা ঘোড়া ছুটোর মা বোনের উদ্দেশ্যে বিশেষ রুচিকর সম্পর্কের উল্লেখ করে গালি দিচ্ছে।

হঠাৎ রাস্তার দু দিক থেকে কারা ছুটে এসে ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম। বন্দুকধারী দারোয়ান ততক্ষণে কাত। তার রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠলো।

ক্যাশ বাবু সচকিত হয়ে দেখলেন। তাঁরই বুকের ওপর রিভলভার। তিনি ত ভয়ে কাঠ।

ডাকাতরা মুহূর্তের মধ্যে টাকা নিয়ে নিঃশব্দে হাওয়ায় মিলিয়ে

গেল। খবর পেয়ে গার্ডেনরীচের পেটমোটা দারোগা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। সম্ভাব্য সকল পথঘাট পুলিশ ঘিরে ফেললো।

হাতেনাতে কাকেও ধরা গেল না।

থানার বড় বাবু গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন। আশ্চর্য। দেখছি এরা চমকে বিস্ময় সৃষ্টি করে গেল।

পুলিশ সন্দেহ করলো। ডাকাতরা এসেছিল নদীপথে। প্রত্যেক জেলেনৌকা আটক করা হোল। তল্লাসী চললো।

কিন্তু ডাকাতদের কোন কিনারা হোল না।

এদিকে নরেন আর দলবল এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে নির্দেশমত বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীটার কাছে একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীতে টাকা নিয়ে হাজির। যতীনদা বসে আছেন।

নগদ পঁচিশ হাজার টাকা তাঁর হাতে নরেন তুলে দিল।

যতীনদা বললেন, নরেন, তোমরা আজই কলকাতার বাইরে চলে যাও। পুলিশ যেন সন্ধান না পায়।

তারপর ডেকে পাঠালেন। গোপাল দাস মজুমদার আর শৈলেন মৌলিককে।

দুটিই দলের অল্প বয়সী বিপ্লবী কর্মী। অত্যন্ত বিশ্বাসী।

গোপাল, তোমার ওপর টাকার ভার রইল।

দুটি তরুণ কর্মী বুকে দুর্জয় সাহস আর হাতে রিভলবার নিয়ে সমস্ত রাত টাকা পাহারা দিলেন।

পরদিন যতীনদার নির্দেশে টাকা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বেলেঘাটায় ডাকাতি

আবার ডাকাতি। মাত্র তিন মাসের মধ্যে। ১৯১৫ সাল মার্চ মাস। এবার বেলেঘাটায়।

বেলেঘাটার এক তেলকলের গদি। সন্ধ্যার অন্ধকার। চলতি পথের ওপর। ডাকাতরা নির্ভয়ে গতিতে প্রবেশ করলো। সবাই

বিশেষ পোষাকে সজ্জিত। গদির মালিক প্রথমে মিলিটারি বলে ভুল করেছিল।

সেই ভুল একটু পরে ভাঙ্গলো। গদির মালিকের বুকের ওপর রিভলভার উঁচিয়ে ডাকাত দলের সর্দার বললেন,—সিন্ধুকের চাবি দিন। কথা বলবেন না। চেঁচালে বা গোলমাল করলে আমরা গুলী করতে বাধ্য হব।

ডাকাতরা চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে পালাল।

লালবাজারে যথারীতি খবর গেল। পুলিশ হৈ হৈ করে ছুটে এল। রাস্তাঘাট বন্ধ হোল। পথচারী নিরীহ লোকদের পুলিশ অযথা হয়রাণ করলো। কিন্তু আসল ব্যক্তি ধরা পড়লো না।

মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর মালিক খাস ইংরেজ।

খবর এল। গড়বেতায় ইংরেজ জমিদারের কাছারীর সিন্দুকে নগদ এক লাখ টাকা পড়ে আছে।

দলের একজন স্থানীয় লোক খবরটি দিয়ে গেল।

যতীন মুখার্জী খুব উৎসাহ বোধ করলেন। একলাখ টাকা তখনকার দিনে অনেক টাকা। তার ওপর সাহেব কোম্পানী। তাই ডাকাতি করতে বাধা নেই। ঠিক হোল, নেতারা সবাই যাবেন।

যতীন মুখার্জী, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য, ফণী চক্রবর্তী, কেউ বাদ নেই।

সংখ্যায় প্রায় কুড়ি জন। দুটি বিভিন্ন দলে বেড়িয়েছেন।

একদল যাবেন হুগলি হয়ে। আর একদল নামবেন গড়বেতা।

ডাকাতির দুদিন আগে সবাই বেড়িয়ে গেছেন।

দু নম্বর ছিদাম মুদি লেনের বাড়ীতে অমর ঘোষ একা আছেন।

দুফুরবেলা একটি অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর কাছে এলেন। আপনাকে সি, আই, ডি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার আজই, একবার দেখা করতে বলেছেন। বিশেষ প্রয়োজন।

অমর ঘোষ ভারী মুস্কিলে পড়লেন। পুলিশ দেখা করতে

চাইছে ? আমার সঙ্গে আবার বিশেষ প্রয়োজন কি ? সর্বনাশ। নিশ্চয় গ্রেপ্তার করবে। একটা ভীষণ সমস্যা। কি করবেন ? পরামর্শ করার কেউ নেই। শেষে ভাবলেন। দেখাই করি। দেখি কি বলে।

পুলিশ অফিসারটির ওয়েলিংটনে বাড়ী। ভয়ে ভয়ে গেলেন সেখানে।

পুলিশ অফিসার দু একটা আজে বাজে কথা বলার পর বললেন, আজ রাতে আপনারা গড়বেতায় ডাকাতি করবেন ?

পুলিশের কথা শুনে হৃদকম্প। অমর ঘোষ একেবারে হতভম্ব। বলে কি ? অমর ঘোষের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জিভ জড়িয়ে আসছে। এ খবর ত কেউ জানে না। অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ। তাহলে ? মুখে বললেন, আমি কিছু জানি না।

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, পুলিশ হই, আর যাই হই, আমিও আপনার দেশের মানুষ। তাই সাবধান করে দিলাম। পুলিশের কাছে খবর পৌছে গেছে।

অমর ঘোষ চুপ করে বেড়িয়ে এলেন। তখুনি এই সংবাদ দিয়ে গড়বেতায় লোক পাঠালেন। পথে নরেনের সঙ্গে তাঁদের দেখা। ঠিক সময়ে নেতাদের কাছে খবর পৌছে গেল।

সে যাত্রা সবাই রক্ষা পেলেন।

তাহলে সে যুগেও পুলিশের মধ্যে দেশপ্রেমিক ছিল।

অবশ্য এ ঘটনা, বেলেঘাটা ডাকাতির অনেক আগে।

বেলেঘাটা ডাকাতির পর। কোন সূত্রে পুলিশ খবর পেয়েছে নটেরগুরু নরেন ভট্টাচার্য। তাই নরেনের পিছু নিয়েছে। নরেন লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আজ এ বস্তি, কাল সে জঙ্গল। কোন দিন বা কলকাতার কোন এক পোড়ো বাড়ী। এই ভাবে তিন চার দিন কেটে গেল।

নরেন পুলিশের তাড়া খেয়ে দল থেকে ছিটকে পড়েছেন।

খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। কলকাতা আর তার আশে পাশে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডাকাতির কয়েকদিন পর। রাত দশটা বেজে গেছে। হ্যারিসন রোডে শ্রম-জীবি সমবায় দোকান। দোকানের মালিক অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি দোকান বন্ধ করে উঠি উঠি করছেন।

এমন সময় কানে এল। কে যেন খুব আস্তে ও চাপা গলায় ডাকছে, অমরদা।

কে? তাকিয়ে দেখেন। রুক্ষ, উড়ু উড়ু চুল। জামা কাপড় অত্যন্ত ময়লা, কাদা মাখা। চেনা যায় না। চোখমুখ পথশ্রমে বসে গেছে। সর্বশরীর অবসন্নতায় ভেঙ্গে পড়েছে। এক যুবক তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছে—আমি নরেন।

নরেন? লাফিয়ে উঠলেন অমরদা। শীঘ্র ভেতরে এস।

অমরদা, আজ তিন দিন খাইনি। ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

অন্ধকারেও পুলিশের সর্বত্র সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। তাই তাড়াতাড়ি নরেনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। খাবার বন্দোবস্ত করলেন। নরেন খেতে বসতে যাবেন; এমন সময় দুঃসংবাদ। তাইত প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছে একদল পুলিশ কেন? নিশ্চয়ই ধরতে এসেছে। আর খাওয়া হোল না। ক্ষুধার অন্ন পড়ে রইল। নরেন পালালেন। হায়রে!

এমনি করে নরেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরছেন।

শেষ পর্যন্ত একদিন পুলিশ তাকে কোথা থেকে গভীর রাত্রে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল।

বলিষ্ঠ তরুণ। সুন্দর সুঠাম চেহারা। বল-বীর্যের প্রতীক্। দেহে ও মনে অসাধারণ ক্ষমতা। সুতরাং পুলিশ ত তাকে সন্দেহ করবেই।

পুলিশ নরেনের হাতে হাতকড়ি লাগালো। কোমরে দড়ি বাঁধলো। তারপর থানায় ধরে নিয়ে এল। স্বীকারোক্তি আদায় করতে হবে। তাই ইলিসিয়াম রোতে চালান দিল। এইবার বাছাধন! কেমন জব্দ!

নরেন পুলিশ হাজতে আছেন। নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার ভাব। যেন কিছুই হয় নি। যেন পুলিশ তাঁকে ভুল করে ধরেছে। মুখে কোন কথা নেই। একটা কথাও পুলিশ বার করতে পারলো না।

কত মিষ্টি কথা বললো। কত স্তোক্ বাক্য দিল। ছেড়ে দেবে বলে আশা দিল। কত লোভ দেখাল। কত অনুনয় করলো। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। নরেন দু' ঠোঁট এক করে বসে আছেন। শুধু কটি কথা—আপনারা আমাকে ভুল করে ধরেছেন।

তখন আরম্ভ হোল চোরের মার। থার্ড ডিগ্রি মেথড্। কড়িকাঠে হাতকড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তারপর লাঠি চার্জ। বুট চার্জ। লাথি চার্জ। আরও কত অমানুষিক চার্জ।

নখের ভেতর আলপিন ঢুকিয়ে দিল। কম্বল ধোলাই। আড়ং ধোলাই। কোন ধোলাই বাদ গেল না। কত নির্যাতন। কত উৎপীড়ন। দিনের পর দিন এই ভাবে গেল।

একটি কথাও নেই নরেনের মুখে। অসহ্য দৈহিক নির্যাতন। নীরবে কয়েক ফোটা জল চোখ দিয়ে শুধু গড়িয়ে পড়লো।

গোয়েন্দা পুলিশের বড় কর্তা চটে লাল। ক্ষেপা কুকুরের মত ছুটে এলেন,—পিঠের চামড়া খুলে নেব।

নরেন চুপচাপ। একেবারে গো-বেচারা! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ভাল মানুষটি সেজে বসে আছে। আহাঃ!

ডেপুটি কমিশনার পূর্ণ লাহিড়ী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু থার্ড ডিগ্রি মেথডে কোন কাজ হোল না।

তখন মুখ বিকৃত করে বললেন,—পাকা শয়তান।

আদালতে মামলা উঠেছে :

নরেনের উকিল জামিনের জন্য আবেদন করলেন।

পুলিশের ঘোরতর আপত্তি।

না, স্যার এ দুর্দ্দান্ত আসামী। একে জামিনে খালাস দেওয়া চলবে না।

প্রবীণ বিচারক। চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন। একেবারে নিরীহ মুখ! পুলিশ বলে কি? আর প্রাইমা-ফেসী কেসও ত নেই। বিচারক এক হাজার টাকা জামিনে নরেনকে মুক্তি দিলেন।

নরেনকে বাটাভিয়া যেতে হবে অস্ত্রের সন্ধানে। বাংলা দেশে একদল ছেলেকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়েছেন। তারা প্রস্তুত। সবাই অস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং লোহা গরম থাকতে থাকতে আঘাত করতে হবে।

জাল পাশপোর্ট নিয়ে নরেনের বাটাভিয়া যাত্রার কথা আগেই বলেছি। এবার ঘটনাকে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বলবার চেষ্টা করছি।

জাল পাশ পোর্ট তৈরী হোল। নাম নিলেন সি, মার্টিন। ভাল একটা স্যুট তৈরী করিয়ে আনা হোল। কিন্তু নরেন ত টাই বাঁধতে জানেন না। টাই বাঁধতে কে শেখাবে?

অতুল ঘোষ আর অমর ঘোষ। দুই ভাই লেগে গেলেন। নরেনকে টাই বাঁধা শেখাতে। সে এক হাসির ব্যাপার!

তারপর নরেন গোপনে গেলেন মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজ পোর্টে পেলেন একখানা মালবাহী ডচ্ জাহাজ। তাতেই চড়লেন।

তবু বিপদের অন্ত নেই। রেঙ্গুনবন্দরে বাঙ্গালী সি, আই, ডি জাহাজ সার্চ করতে এলেন। তাই তো। যদি ধরা পড়ি।

নরেন পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে একটা চলতি সাম্পানে চড়লেন। মাঝি চাট্‌গেয়ে মুসলমান। তার সঙ্গে তার ভাষায় দিব্যি

গল্প জুড়ে দিলেন। শেষে একটা নির্জন ঘাটে নেমে শহর দেখতে বেরুলেন। যাক, সে যাত্রা রক্ষা।

এই ভাবে অনেক বিপদ কাটিয়ে বাটাভিয়া এলেন।

বিপ্লবের কাজে ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ ঃ

একদিন অমর চ্যাটার্জী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে বসে নরেনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। সঙ্গে আছেন আনন্দ বাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার।

নরেন, তোমার মনে আছে। ডাকাতি করে বিপ্লবের কাজে টাকা সংগ্রহের গোড়ার কথা।

হ্যাঁ, যতীনদা প্রথমে ডাকাতির খুবই বিরুদ্ধে ছিলেন।

অমর চ্যাটার্জী হাসতে হাসতে বললেন,—সে দিনটা আমিও ভুলিনি। ১৯০৬ সাল। সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটনের বাড়ীতে আমাদের একটা গোপনীয় মিটিং বসেছে।

বাল গঙ্গাধর তিলক আছেন। শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন।

তিলক কথাটা তুললেন। রাজনৈতিক বিপ্লব ও সংগ্রাম চালু রাখতে প্রচুর অর্থের দরকার। কিন্তু টাকা দেবে কে?

তখন তুমি কি বলেছিলে?

আমি বলেছিলাম। ধনীর গৃহে প্রচুর অর্থ আছে। কিন্তু দেশের কাজে তারা স্বেচ্ছায় টাকা দেবে না। কারও আছে রাজ-রোষের ভয়। আবার কারও কাছে দেশের চেয়ে টাকা অনেক বড়। তাই তাদের টাকা জোর করে কাড়তে চেয়েছিলাম। আর আনন্দ-মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ আমি ভুলিনি।

যতীনদা প্রথমে ডাকাতির ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—পরের ঘরে ডাকাতি করবার আগে, নিজের ঘরে প্রথমে ডাকাতি করতে হবে। তবেই ত অধিকার জন্মাবে।

সত্যি যতীনদা কত বড় কর্মযোগী সেদিন বুঝলাম। বাড়ী গিয়ে বৌদিকে বললেন—তোমার সব গহনা খুলে দাও। দেশের কাজে

লাগবে। বৌদি সব গহনা খুলে দিলেন। একটি কথা বলেন নি। দু হাতে দু গাছি শাঁখা ছিল মাত্র।

অমর চ্যাটার্জী বললেন, তাহলে বুঝছো। দেশের কাজে আগে নিজেকে নিঃস্ব হয়ে দান করতে হয়। তবেই ত অধিকার জন্মায়। পরের টাকা জোর করে ছিনিয়ে নেবার অধিকার থাকা চাই। রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে হয়।

তোমার মনে আছে, সুবোধ মল্লিকের কথা?

তিনি বলেছিলেন—ব্যাঙ্কে আমার নগদ একলাখ টাকা আছে। আমি আজই সব দান করবো দেশের কাজে। তিনি দিলেন একলাখ টাকা নগদ।

তাই ত আমরা বিরাট মিটিং করে আর দেশের হাজার হাজার লোক ডেকে ঘোষণা করেছিলাম।

আজ থেকে তুমি আমাদের রাজা। রাজা সুবোধ মল্লিক।

অমরদা আরও বললেন,—

স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্বতঃই মনে হয়।

চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ করা যায় না। অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। কারণ তার মধ্যে চালাকি ছিল না।

নরেন গম্ভীর মুখে বললেন,—হ্যাঁ, আমরা মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিলাম।

মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে পুলিশ হত্যা :

অতুল ঘোষের বাড়ীতে সব বিপ্লবীরা মিলিত হয়েছেন। পুরোন দিনের গল্প হচ্ছে। মসজিদ বাড়ীতে পুলিশ হত্যা হয়েছিল ২১।১০।১৫ তারিখে। সেই গল্পই হচ্ছিল।

হরিদা বললেন,—নরেন তোমার সে যুগের গোয়েন্দা পুলিশের সতীশ ব্যানার্জীকে মনে আছে? এখন তিনি মস্তলোক।

সেবার দিল্লীতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তা আর মনে নেই। কি পেছনেই লেগেছিলেন ভদ্রলোক। আমাকে ত ছায়ার মত অনুসরণ করতেন।

আমরা তখন থাকতাম ছ' নম্বর ছিদাম মুদি লেনে। আর এই ভদ্রলোক আর দলবল নিয়ে কাছাকাছি কোথায় থাকতেন। হদিস পেতাম না।

শেষে এমন হোল। আমাদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ হবার উপক্রম। যোগ্য লোক সন্দেহ নেই।

তখন ঠিক করলাম। সতীশকে খতম করতে হবে।

আমরা খবর নিয়ে দেখলাম। সতীশের সঙ্গে আরও তিনজন পুলিশ অফিসার থাকে।

কিন্তু বাড়ী খুঁজে পাই না।

শেষে অমর ঘোষকে বলা হলো—তুমি সব ব্যবস্থা কর।

অমর খুঁজে বার করলেন। মসজিদ বাড়ীর এক কানা গলিতে তারা থাকেন। সেখানে ক্ষেত্রনাথ দে, হরিদাস রায় চৌধুরী আর আনন্দ মজুমদার বলে তিনজন পুলিশ অফিসারও থাকেন।

বাড়ীর ঠিকানা পেলাম অনেক কষ্টে। তারপর আমরা বসলাম পরামর্শ করতে।

নরেন বলেই চলেছেন।

কলকাতার বিপ্লবীদলের কাজের ভার তখন ছিল অমর ঘোষের উপর। আর সতীশ চক্রবর্তী জেলাগুলো দেখতেন।

অর্গানিজেসন চালাতাম আমি আর অতুল ঘোষ। সব ওপরে থাকতেন দাদা (যতীন মুখার্জী)। বিপিন গাঙ্গুলি ছিলেন ডেপুটি লীডার।

আমরা ঠিক করলাম পুলিশ হত্যার কাজে ব্রজেন দত্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত আর ভূপতি মজুমদারকে ভার দেওয়া হবে।

ব্রজেনকে ডেকে বললাম,—জগাদা, তুমি নেতৃত্ব করবে।

তিনজনের হাতে রিভলভার দিয়ে পাঠালাম।

সেদিন মসজিদ বাড়ীর কানা গলির একতলার ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে সতীশ ব্যানার্জী আর তার দলবল প্রায় অন্ধকারে কি সব পরামর্শ করছিলেন।

দরজার গোড়াতে দাঁড়িয়েই কোন দিকে না চেয়ে ভূপতি মজুমদার গুলী ছুঁড়লেন। গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম।

সতীশ ব্যানার্জীকে গুলী লাগলো না। কিন্তু অপর একজন পুলিশ অফিসার গুলীর আঘাতে প্রাণ হারালেন। কয়েকজন গুরুতর আহত হোলেন।

মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে পুলিশ হত্যার খবর পেয়ে লালবাজার সচকিত হয়ে উঠলো।

টেগার্ট আর পূর্ণ লাহিড়ী ছুটে এলেন।

আমি আর অতুল পালালাম।

অমর ঘোষকে ছিদাম মুদির লেনের বাড়ী থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

আমিও শেষ বারের মত ভারতভূমি ছাড়লাম।

কলিকাতায় মোটর ডাকাতি ঃ

১৯১৫ সাল, ২৫শে জানুয়ারী।

ছ নম্বর ছিদাম মুদি লেন। বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা। নরেন, অতুল আর অমর বসে আছেন।

সামনে সেদিনের সংবাদপত্র খানা খোলা পড়ে আছে। নরেন হাসছেন।

অমর, পুলিশকে ভারী বোকা বানিয়ে দিয়েছ। দেখ কাগজে কি লিখেছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে, গ্রে-ষ্ট্রীটে দুঃসাহসিক মোটর ডাকাতি। ছ হাজার টাকা লুট। ডাকাতদের মোটরে পলায়ন।

অমর ঘোষ একটু হেসে বললেন,—কি করলাম শোন। সাহাদের বাড়ীটা ঠিক গ্রে-ষ্ট্রীটের ওপর। তার পাশেই একটা গলি। পুলিন মুখার্জী, হরিপদ আর ক্ষেত্র মোহনকে নির্দেশ দিলাম, তোমরা ডাকাতির জন্য সাহাদের বাড়ীর ভেতরে যাও।

আর সাতকড়িকে বললাম,—

যেই ওরা টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসবে, তুমি গলির মধ্যে থেকে মোটরের হর্ণটি বাজাবে। আর পুলিন, হরিপদ আর ক্ষেত্রমোহন টাকা নিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে পালাবে। লোকে ভাববে ডাকাতরা মোটরে এসেছিল। আর এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। সেইমত কাজ হয়েছিল।

নরেন বললেন,—টেগার্ট, লো-মান আর পূর্ণ লাহিড়ী তদন্তে এসেছিল। আমি কাছাকাছি ছিলাম।

পাড়ার লোকদের কাছ থেকে পুলিশ একটা এজাহার নেয়।

পাড়ার লোকেরা বললে,—তারা ডাকাতদের দেখেনি বটে, তবে মোটরের হর্ণ শুনেছিল।

টেগার্টের মুখটা কালো হয়ে গেল।

তখন অমর বললেন,—

তোমার মনে আছে ছোড়দা, হাওড়া মোটর ডাকাতির কথা! সেখানেও দশ হাজার টাকা নিয়ে পালাবার সময় একই ব্যবস্থা করেছিলাম।

মোটর নেই। অথচ মোটরের হর্ণ বাজিয়ে পাড়ার লোক আর পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে মোটর ডাকাতি বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম।

ইহা নরেন, অতুল আর অমরের উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার। পুলিশ আজও এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। এই ভাবে বিপ্লবীরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যেতেন। সত্যিই রোমান্টিক!

বুড়ি বালামের তীরে :

১৯১৫ সাল, ৯ই সেপ্টেম্বর।

বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈপ্লবীক কাজে বালেশ্বরে এসেছেন যতীন্দ্র নাথ। সঙ্গে আছেন চিত্তপ্রিয়, যতীশ, নীরেন আর মনোরঞ্জন। দিনের কাজ শেষ করে যতীনদা গল্প করছেন বন্ধুদের সঙ্গে। সবাই পার্টির লোক।

এমন সময় যতীশ হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এল।

দাদা, সর্বনাশ। পুলিশ খবর পেয়েছে। আপনি এসেছেন।

দাদা হেসে বললেন,—

তার জন্য ভাবছিস কেন? একটা নৌকা ঠিক করে আয়। আজ কৃষ্ণ পক্ষের রাত। নদী পথে পালাব। কোন অসুবিধা হবে না।

তাই ঠিক হোল। অত্যন্ত গোপনে একটা ডিঙ্গি জোগাড় করা গেল।

সন্ধ্যার একটু পর। চারজন অনুগামীসহ যতীন্দ্রনাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

যতীন্দ্রনাথ চলেছেন নির্ভয়ে। তাঁর অভিধানে ভয় বলে কিছু নেই।

বিপ্লবী ভারতের প্রাণ-পুরুষ এই যতীন্দ্রনাথ।

বুড়ি বালামের তীর। জায়গাটার নাম কাপ্তিপোদা। সবাই কাছাকাছি পৌছে গেছেন। চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। পাশের মানুষটি পর্যন্ত দেখা যায় না!

আর একটু এগুলেই হয়। একবার কোন মতে নৌকায় চড়ে বসতে পারলে—ব্যস। আর কে পায় তাদের। চল, চল, এগিয়ে চল।

হঠাৎ গুড়ুম, গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ।

কানের পাশ দিয়ে গুলী বেরিয়ে গেল।

যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন। পুলিশ তাদের ঘেরাও করেছে। আর পালাবার পথ নেই।

চিত্ত, প্রস্তুত হও। যুদ্ধের জন্য। বালির পরিখা খুড়ে ফেল।

সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে। এ ছাড়া আত্ম-রক্ষার আর পথ নেই।

তখন পরিখার অন্তরালে শুয়ে পড়লেন সবাই। শুরু হোল প্রচণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। নৈশ গগণ ভেদ করে, সে কি ভয়াবহ আর্তনাদ।

একটা বুলেট চিত্তপ্রিয়ের বুক ভেদ করলো। বুড়ি বালামের তীর শহীদের রক্তে রঞ্জিত হোল। উঃ দাদা, বলে চিত্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

চিত্তপ্রিয় শেষশয্যা নিলেন। তখনও যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন বীর বিক্রমে।

গুলী ফুরিয়ে এল। যতীন্দ্রনাথ বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করলেন। আর রক্ষা করা গেল না।

যতীশ, নীরেন ও মনোরঞ্জন ধরা পড়লেন। দুর্দান্ত প্রতাপ ইংরেজের সুশিক্ষিত গুর্খা সৈন্য দলের সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠলেন না। তাদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় হোল। বাংলার গৌরব রবি হোল অস্তমিত।

বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হোলেন। যতীশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হোল।

যতীন মুখার্জীর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। সুভাষ চন্দ্রের ন্যায় তাঁর মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

যতীন মুখার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজেনের সহিত লেখকের এই মৃত্যু সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল।

তেজেন বলেছিলেন,—মা সুদীর্ঘ বারো বছর বাবার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

আন্দামান ফেরত অগ্নিযুগের উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

উপেন দা, আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কি ?

উপেনদা বলেছিলেন,—আমি টেগার্ট সাহেবকে পরে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। টেগার্ট বলেছিলেন,—

Unfortunately he is dead.

বুড়ি বালামের তীরে বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক পরাজয় ও বিপর্যয় ঘটলো। ফলে রাজনৈতিক দলে চরম হতাশা ও নৈরাশ দেখা দিল।

ইংরেজের চণ্ড নীতির সাময়িক জয় হোল।

নরেন তখন লুকিয়ে আছেন। তিনি শুনে বললেন,—এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কিন্তু বিপ্লবীদের কাঁদলে ত চলবে না। সম্মুখ যুদ্ধে সেনাপতি প্রাণ হারিয়েছেন। এত পরম গৌরবের কথা।

আমাদের আবার নতুন উদ্যমে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের আরব্ধ কর্ম আজও অসম্পূর্ণ। দাদার পথ অনুসরণ করতে হবে।

নরেন গেলেন দু নম্বর ছিদাম মুদি লেনে। বিপ্লবী নায়ক অতুল ঘোষের বাড়ীতে। গোপনে উভয়ে অনেক পরামর্শ হোল। সমস্ত দায়িত্ব এখন তাঁদের মাথায়।

নরেন বললেন,—বিপ্লবীর অভিধানে পরাজয় বলে কোন কথা নেই। আমি চল্লাম বাটা-ভিয়া। এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হবে আমার কর্মকেন্দ্র। বিপ্লবের রুদ্র বিষাণ বেজে উঠবে।

তারপর অনেক দিন নরেনের কোন খোঁজ খবর নেই। নরেন গোপন পথে বাটাভিয়া পৌছুলেন। তাঁর উৎসাহ, কর্মতৎপরতা এবং উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। অস্ত্রসংগ্রহ করতে হবে। দেশের মুক্তি চাই।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নরেন ঘন ঘন দেখা করলেন।

তখন প্রথম মহাযুদ্ধ প্রচণ্ড বেগে চলেছে! জার্মান সাবমেরিণ এমডেন ভারত সাগরে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।

সুতরাং জার্মান কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সরবরাহে সহজেই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কারণ ইংরেজ তখন প্রায় কাত হয়ে পড়েছে। সবার মুখে

এক কথা—হেলো হ্যায়,হেলো হ্যায়, 'দমক দো, দমক দো,-গিরজায়েগা। জার্মান কন্‌সাল বললেন,—ত্বু তিন খানা জাহাজ ভর্তি করে অস্ত্র ও রণ-সম্ভার আমি ভারতে পাঠাচ্ছি। তোমরা মাল নামিয়ে নেবে।

নরেন এই সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে কলকাতার চীনে বাজারে অবস্থিত হ্যারি এণ্ড সন্সকে গোপন পথে সংবাদ পাঠালেন,—

হরিদা, লোক মারফত চল্লিশ হাজার টাকা পাঠাচ্ছি। টাকা জার্মান কনসালের কাছ থেকে আদায় করেছি। মাল নামবে সুন্দর বনে। তিন জাহাজ মাল যাবে।

প্রথম জাহাজ খানার নাম এনিলার্সেন।

এ ছাড়াও আর দুখানা জাহাজ যাচ্ছে। তার একটার নাম পেয়েছি। তার নাম হেন্‌রি এস্‌। খুব সাবধানে ব্যবস্থা করবেন।

অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ব্যাপারে দাদার একটা স্কিম ছিল।

হিমালয় পাহাড়ের গুহার মধ্যে অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে হবে। কাক পক্ষীও টের পাবে না।

জগাদা, সাতকড়ি ও মন্মথকে খবর দেবেন। তারা ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য। শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ ও তার মিত্র পক্ষের সতর্ক দৃষ্টিও তৎপরতায় অস্ত্রভর্তি জাহাজ নির্দিষ্ট দিনে ভারতের উপকূলে এসে পৌছুতে পারলো না।

নরেন বাটাভিয়ায় বসে এই দুঃসংবাদ পেলেন।

কিন্তু বিপ্লবীর ইতিহাসে পরাজয় বলে কিছু নেই।

খবর পেলেন, ইন্দোনেশিয়ায় ক'খানা জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজ আটকে পড়ে আছে।

গোপনে আবার চেষ্টা শুরু করলেন। সেই সব অন্তরীণ জাহাজ থেকে মাল কি ভাবে পাচার করা যাবে। জার্মান কনসালের অফিসের লোকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করলেন। তাঁরাও অবশ্য যথেষ্ট সাহায্য করলেন। কিন্তু সুবিধা হোল না।

নরেনের দুঃখ হোল।

জার্মানরা শুধু মুখে প্রতিশ্রুতি দেন। আর আসল কাজের সময় পেছিয়ে যান। বোধকরি ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতে পারেননি।

তার জন্য পরে অবশ্য তাদের আপশোষ করতে হয়েছিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে বাঙ্ককে আগেই পাঠাতে হয়েছে।

বাঙ্কক একটা বৃহৎ আন্তর্জাতিক শহর। শহরের একটা বড় হোটেল। তারই তিন তল্লার একটা ঘরে ভোলানাথের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

একদিন সকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে নরেন সেখানে এসে হাজির।

ভোলানাথবাবু, বাঙ্কক, সাংহাই আর প্রাচ্যের সব বড় শহরেই বড় অফিসার আর কন্‌সাল আছেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শীঘ্র দেখা করবার একটা ব্যবস্থা করুন। তা ছাড়া এখানে যে সব ভারতীয় আছেন। তাদের সঙ্গেও দেখা করুন। তারা আপনাদের কতটা সাহায্য দিতে পারেন। এখানে বসে বৃটিশ নিধন যজ্ঞ শুরু করবো।

বেশ! আপনি এখানে কয়েকদিন থাকুন। দেখি আমি কি করতে পারি।

কিন্তু দুঃখের কথা। কিছুই করতে পারা গেল না। কয়েকদিন পরে ভোলানাথ গোপনে খবর পেলেন। পুলিশ জানতে পেরেছে। দুর্দান্ত বিপ্লবী নরেন বাঙ্ককে এসেছেন। তারা নরেনকে ধরবার জন্য ফাঁদ পেতেছে। একদিন বিকেলে ও দেশের একটা অচেনা লোক নরেনের হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল। নরেন উল্টে পাল্টে দেখলো।

নাম নেই। তাতে শুধু এই টুকু লেখা, আজই পালান, রাতে আপনার হোটেল সার্চ হবে। আপনাকে গ্রেপ্তার করবে।

সেদিনই সন্ধ্যায় নরেন মুসাফির সেজে। পিঠে কম্বল আর বিছানা বেঁধে অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করলেন।

রাত্রে পুলিশ নরেনের হোটেল তোলপাড় করে খানাতল্লাসী করলো। পাখী তার আগেই খাঁচা থেকে পালিয়েছে।

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সে দেশ লব খুঁজিয়া।

১৯১৫ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ।

অনেক ভারতীয় বিপ্লবী সুমাত্রায় লুকিয়ে আছেন।

মীদান তখন সুমাত্রার রাজধানী। মীদান বড় শহর। সেখানে একটা বড় হোটেল আছে। হোটেলটির নাম হ্যারিসন এণ্ড ক্রস্‌ফিল্ড।

এই হোটেলটি হোল আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের একটা বড় আড্ডা।

সম্প্রতি দু'জন ভারতীয় বিপ্লবী মীদানে পালিয়ে এসেছেন।

তাদের এক জনের নাম কুমুদ মুখার্জী, আর এক জনের নাম সুকুমার চ্যাটার্জী।

হঠাৎ একদিন কুমুদের নামে একখানা চিঠি এল। লিখেছেন সুমাত্রার কোন এক আন্তর্জাতিক ক্লাবের সেক্রেটারী। তিনি কুমুদকে একটা হোটেলে নিমন্ত্রণ করেছেন!

কুমুদ খুসি হয়ে নির্ধারিত সময়ে সেই হোটেলে উপস্থিত হোলেন। ভাবলেন বিদেশে এই সব লোকদের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। কিন্তু হোটেলের ভিতর ঢোকা মাত্র একটা আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল। যা কুমুদের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না।

দু'জন চীনা পেছন দিক থেকে এসে হঠাৎ তাঁর চোখ ও মুখ বেধে ফেললো।

কুমুদ ভয়ে ঘাবড়ে গেল। তখন তার বাধা দেবার শক্তি নেই।

তারা তাকে সেই অবস্থায় ধরে নিয়ে হাজির করলো এক ইংরাজ গুপ্তচরের সামনে।

তিনি চোখ লাল করে বললেন,—যা জান বল, নচেৎ তোমাকে খুন করবো। কুমুদ ভয়ে ভয়ে বিপ্লবীদের সব গোপন খবর বলে দিল। নরেনের কিছু কিছু খবর তারা কুমুদের কাছে পেল।

সুকুমারকেও তারা কায়দা করে একদিন রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারও সেই একই অবস্থা হয়।

ভূপতি মজুমদারও একদিন তাদের ফাঁদে পড়েছিলেন। তিনি চালাকি করে পালিয়ে আসেন।

নরেনকে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় কাজে সুমাত্রা আসতে হোত। তাঁর কাছে এই সব খবর পৌঁছে গেল।

তাই নরেন খুব সাবধানে ও সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন।

বুঝলেন, ইংরাজ তাঁকে ধরবার জন্য সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ জাল ফেলেছে। পালান কঠিন। তাই শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি চললো। তাই বলে বিপ্লবের কাজ বন্ধ ছিল না।

নরেন বাটাভিয়াতে গোপন নামে একটা ছোট হোটেলে থাকতেন। সেটা ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কার্যালয়।

সেই হোটেলে সেন্ট জী জং নামে একজন চীনা কাজ করতেন।

সবাই তাঁকে জানতো, চাইনিজ কুক্ বলে। আসলে তিনি ছিলেন একজন চীনা গুপ্তচর। আর প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের পরম বন্ধু।

তার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের খুব আঁতাত ছিল। ভদ্রলোক খুবই বুদ্ধিমান ও চালাক।

রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর খুব যোগ ছিল। ভারতীয় বিপ্লবীদের তিনি যথেষ্ট সাহায্য করতেন। গোপনে পরামর্শ দিতেন।

নরেন বহু বিপদের হাত থেকে তাঁর সাহায্যে রক্ষা পান।

জী জং এর সঙ্গে কলিকাতার হ্যারি এণ্ড কোম্পানীর বাটাভিয়া এজেন্টেরও যোগছিল। তাঁর আসল পরিচয় কেউ জানতো না।

নরেন সেই হোটেলে আছেন। আর চেষ্টা করছেন কি ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করবেন। আর ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াবেন।

জীজং খবর দিলেন।

জার্মান কন্‌সাল এখন সুরাবায়া আছেন। আপনি সুরাবায়া যান।

আপনি আর একটা কাজ করবেন। জার্মান কনসালের ভাই। তার নাম কাউণ্ট হেলফেরিক্। তার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন। তিনি আপনাকে সাহায্য দেবেন। আমি হেলফেরিককে গোপনে বলে দিয়েছি। তিনি একজন বৃটিশ বিদ্বেষী।

নরেন সুরাবায়া গেলেন। দেখা করলেন কনসালের সঙ্গে। তাকে বোঝালেন,—এখন যুদ্ধ চলছে। ইংরাজ খুব বিব্রত। ভারতের লোক ইংরেজকে চায় না। এই সুযোগ। ভারত আপনাদের সাহায্য চায়। আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু কনসাল কোন আগ্রহ দেখালেন না। শুধু বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখি। কেমন যেন উদাসীন ভাব।

নরেন কাউণ্ট হেল্ ফেরিকের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন। তিনিও ভেতরে ভেতরে অনেক চেষ্টা করলেন। সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হোল।

আর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সেই সময় পেণাংএ একজন ভারতীয় বিপ্লবী ধরা পড়েন। তাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাজের জন্য রাসবিহারী বসু পাঠিয়েছিলেন।

পুলিশ তার ওপর কঠোর নির্যাতন করে। তিনি বাধ্য হয়ে অনেক গোপন তথ্য বলে ফেলেন। ফলে চারিদিকে সার্চ আরম্ভ হয়। বহু ভারতীয় বিপ্লবী ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়।

নরেন পলাতক আসামী। তিনি আর বাটাভিয়াতে থাকতে সাহস করলেন না।

আরও খবর পেলেন। গোয়েন্দা পুলিশ জাভা, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও ও সুমাত্রা সর্বত্র তাঁর ওপর কড়া নজর রেখেছে।

কিন্তু কোথায় যাবেন ?

নরেন ভাবতে বসলেন। দেশে ফেরার সব পথ বন্ধ। ভারতে বিপ্লবী দল ছত্রভঙ্গ। কি করবেন ?

পথে ভোলানাথ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা।

ভোলানাথ বাবু,—সব পণ্ড হোল। এবার ভাবছি, অন্য দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। ভারতের দুর্ভাগ্য, কেউ ভারতের বিপ্লবীদের বিশ্বাস করে না। সাহায্য করতে চায় না।

কোথায় যাবেন ?

তাই ভাবছি, ডলারের দেশ আমেরিকায় গেলে কেমন হয়।

নরেনের বুকে বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা আর সম্ভব নয়।

নরেন রাতে শুয়ে আছেন। ঘুম আসছে না। মনের অবস্থা পাগলের মত। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন মাত্র। এমন সময় চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলেন একখানা অতি পরিচিত মুখ।

সে মুখ শ্রদ্ধেয় নেতা—যতীন্দ্রনাথের। তিনি যেন বলছেন, নরেন, তুমি আমেরিকায় যাও। পরাধীন ভারতের মুক্তি যজ্ঞের পথ প্রসারিত হোক্। আমার আশীর্বাদ নাও।

নরেন লাফিয়ে উঠলেন।

দাদার আশীর্বাদ পেলাম। আর ভাববার কিছু নেই। বন্দেমাতরং।

নরেন এবার সুদূর অজানা পথে একা পাড়ি দেবেন। এই তাঁর সংকল্প।

বাটাভিয়ার প্রতিটি রাজপথ গুপ্তচরে ভর্তি। শহরের গোয়েন্দা পুলিশ ছায়ার মত তাঁর পেছনে ঘুরছে।

তাই নরেনকে আত্ম গোপন করে খুবই সতর্ক হয়ে এবং সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। তবুও ভয়। কখন কি হয়।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে। সেই চেষ্টাই চলছে।

সে দিনটির কথা আজও মনে পড়ে।

১৯১৫ সাল, ২৮শে নভেম্বর।

নরেন হোটেলের লাউঞ্জে একাই বসে আছেন। আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন।

সারাদিন দুর্যোগ। দুপুর থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হোল। ঘরের বার হয় কার সাধ্য।

সন্ধ্যা হয়ে এল। হোটেলের সামনে একখানা সাইকেল এসে থামলো।

উর্দ্দীপরা সরকারী কর্মচারী। ডাক ও তার বিভাগের পিয়ন। হাতে একখানা টেলিগ্রাম। লাউঞ্জে অবস্থিত নরেনের হাতে টেলিগ্রাম দিয়ে পিয়ন নীরবে চলে গেল।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বেশ রাত্রি হয়ে এল। যে যার কাজে ব্যস্ত।

এমন সময় রেশমী সিল্কের বাহারী লুঙ্গী পরে এক বর্মী হোটেলের লাউঞ্জ থেকে বেরুলেন। তার পিঠে একটা মস্ত বোঝা। হাতে একটা লাঠি। মাথায় সিল্কের রুমাল বাধা।

হোটেল পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি আপন মনে হাঁটলেন। তারপর দেখতে পেলেন। পথের ধারে একটা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। এই দুর্যোগের মধ্যেও গাড়োয়ান ছাদে বসে।

বিনা বাক্যব্যয়ে বর্মী গাড়ীতে উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর এ পথ, সে পথ ঘুরে গাড়ী একটা নদীর ধারে এসে দাঁড়াল।

শহরের শেষ প্রান্তে একটা ছোট নদী। সে দিকটা খুব নির্জন। এমনিতে খুব কম লোক সে পথে চলে। তার উপর আজ এই দুর্যোগ। জন মানবের চিহ্ন নেই।

নদীর ধারে অসংখ্য ঝাউ, পাম আর ইউকেলিপটাস গাছ। তা ছাড়া চারিদিকে নানা জাতীয় ছোট ছোট গাছের বন।

নদীর ঘাটে একটা সাম্পান। গাছের সঙ্গে একটা দড়ি দিয়ে সেটি বাধা।

নদীর দুর্দান্ত স্রোত। তার ওপর মুষলধারে বৃষ্টি। প্রবল জলস্রোতের বেগে সাম্পান খানি দুরন্ত ছেলের মত দাপাদাপি করছে।

বর্মীটি সাম্পানে লাফিয়ে চড়ে বসলেন। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে দড়ি খুলে হাল ধরলেন। যেন কত দিনের পাকা মাঝি। সাম্পান মুহূর্তের মধ্যে তিনটে পাক খেয়ে সামনের দিকে তীরে বেগে ছুটলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে চললো।

পাকা সুদক্ষ মাঝির মত বর্মীটি নির্ভাবনায় হাল ধরে চুপ করে বসে রইলেন। শুধু প্রবল জল স্রোতের একটানা আর্তনাদ। আর সামনে সীমাহীন অগাধ অন্ধকার জলরাশি। সাম্পান নদীর ওপরে তীর বেগে ছুটেছে। এই ভাবে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পার হোয়ে গেল। এবার ডান দিকে একটা ছোট খাল। বর্মী সাম্পানখানাকে খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তখন রাত্রি অনেক হয়েছে।

এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। খালের শেষ প্রান্তে একখানা ছোট কাঠের ঘর। চারিদিকে বনজঙ্গল।

বাইরে ঘন অন্ধকার। পাশের লোক দেখা যায় না। দূরে একটা আলো দেখা গেল। ঘরের ভেতর একটা কেরোসিনের ডিবে। টিম টিম করে জ্বলছে।

সাম্পানখানাকে দড়ি দিয়ে একটা গাছের ডালে বেঁধে বর্মী ওপরে উঠে এলেন।

তারপর দরজায় টোকা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন,—মং মং।

দরজা খুলে একজন বর্মী বেরিয়ে এল।

তখন দুজনে দুর্বোধ্য বর্মী ভাষায় কিছুক্ষণ আলাপ হোল।

ঘরের ভেতরে তিন চারটি ছেলে মেয়ে তখনও খেলা করছে। তার মধ্যে একটা শিশু কিছুক্ষণ আগে একটা অপকর্ম করে ফেলেছে।

সেই ময়লা তখনও পরিষ্কার হয়নি। অসংখ্য মাছি তার ওপর ভন্ ভন্ করছে।

খানিক পরে মংয়ের স্ত্রী একটা সানকিতে করে শুট্‌কি মাছের ঝোল আর মোটা মোটা লাল চালের ভাত সামনে ধরে দিয়ে গেল।

জায়গাটি যেমন অপরিষ্কার, বৌটি তেমনি নোঙরা।

অতিথি কিন্তু পরম পরিতোষ ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই শুট্‌কি মাছের ঝোল, আর সব ভাতকটি খেয়ে নিলেন। যেন কতদিন খাওয়া হয়নি। যেন শুট্‌কি মাছ অতি উপাদেয় খাদ্য।

তারপর হেসে বললেন,—মং, তোমার স্ত্রীর হাতের রান্না বড় চমৎকার।

মং হাসতে লাগলো।

একটি মাত্র কাঠের ঘর।

মংয়ের তিন চারটে ছেলে মেয়ে। স্ত্রী আর সে নিজে। ঘরের মধ্যে একটা বাঁশের মাচা।

অতিথিকে সেই মাচার ওপর একটা চাটাই বিছিয়ে দিল। তিনি পরম আরামে ও তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর মং স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে মাচার তলায় শুলেন।

ভোর হবার আগেই দুজনে উঠে পড়েছেন। সাম্পান চেপে প্রায় কুড়ি ত্রিশ মাইল নদী পথের রাস্তা গোপনে উভয়ে পার হোলেন।

তারপর সেখান থেকে লম্বা পাড়ি দিলেন। অজানা পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হোল।

এই গল্পটি একদিন অমর চ্যাটার্জী আমাদের বলছিলেন। গল্পের শেষে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নরেনের উদ্দেশ্যে বললেন,—শরৎচন্দ্র পথের দাবীতে তোমার নাম দিয়েছিলেন সব্যসাচী। আসল নামটি দিতে তিনি বোধকরি ভয় পেয়েছিলেন। পাছে তোমার ক্ষতি হয়।

আজ আর সে ভয় আমাদের নেই। তাই আজ নিঃসংকোচে গর্ব করে বলি,—নরেন, তুমিই আমাদের পথের দাবীর সব্যসাচী।

বহুক্ষণ পরে একটা দ্বীপে এসে সাম্পানখানি থামলো। সেখানে জাহাজ বাধা। আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল।

পোষাক আর নাম দুই বদলালেন। সঙ্গে আছে জাল পাশপোর্ট।

এবার নতুন নাম। হরি সিং। চাপদাড়ী। লম্বা চুল। হাতে লোহার বালা। কে বলবে শিখ্ ছাড়া আর কিছু।

আসল নাম নিজেই ভুলে গেলেন। জাহাজে উঠলেন। সস্তা মাল-বাহী চীনে জাহাজ। অনেক ঘাটের জল খেয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে। উপায় কি?

লক্ষ্য ডলারের দেশ আমেরিকা। কোন সহায় নেই। সম্বল নেই। একেবারে নিঃস্ব। শূন্য হস্তে হরি সিং বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন।

বিপ্লবের আগুন পাথেয় করে হরি সিং একাকী চলেছেন।

হরি সিং জাহাজে বসে বসে ভাবছেন। বিপ্লবী বন্ধু সুকুমার ফিলিপাইনে থাকেন না? তা ছাড়া আমার কলকাতার ক'জন বন্ধু ম্যানিলায় আছেন। তার মধ্যে দুজন সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাদের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

ফিলিপাইন কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টি। তাদের জাহাজ থামলো মিন্ডোরা বলে একটা জায়গায়।

কিন্তু ভয় হোল। কি জানি হয়ত বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশ ওত পেতে বসে আছে। ভয় সর্বত্র। দেশকে ভালবাসা কত বড় অপরাধ।

তাই নানা বন্দর ঘুরে। নানা মানুষের সঙ্গে মিশে। নানা ছল চাতুরি করে। এক দুর্যোগপূর্ণ অপরাহ্নে তিনি ম্যানিলায় এসে নামলেন।

যে সব বন্ধুদের ধরলে কাজ হবে ভেবেছিলেন; কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তারা সবাই সরে পড়েছেন।

কে বিপদের ঝুকি ঘাড়ে নিতে চায় ?

তবে একটা কাজ হোল।

ম্যানিলাতে একটা খবর পেলেন। সান-ইয়াৎ সেন জাপানে পলাতক জীবন যাপন করছেন। তিনি ১৯১৩ সালের নান্‌কিন বিদ্রোহের পর চীন ছেড়ে পালিয়ে যান।

চীনের বিপ্লবী জাতীয় নেতা সান-ইয়াৎ সেন। নরেন ভাবলেন,—তাঁর কাছে নিশ্চয়ই কোন সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার।

সান-ইয়াৎ-সেন

১৯১২ সালে চীনে মাঞ্চু রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়। আর গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াৎ সেনকে সেই গণ-তন্ত্রের প্রথম সভাপতি করা হয়। কিন্তু তথা কথিত গণ তন্ত্রের পেছনে সেদিন জন-গণের কোন সমর্থন ছিলনা। সে জন্য নতুনভাবে জন-গণের গণ-তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চীনে দু'বার বিপ্লব হয়। দ্বিতীয়বার নান-কিন বিদ্রোহে সান-ইয়াৎ-সেনের পরাজয় ঘটে। তিনি চীন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

বিপ্লবী সান-ইয়াৎ-সেন ১৯১৩ সাল থেকে পালিয়ে জাপানে আছেন।

নরেনের তাঁর সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার। সেজন্য তাঁকে একবার জাপানে যেতে হবে! কিন্তু মুস্কিল হয়েছে জাপানকে নিয়ে। জাপান স্বাধীন প্রাচ্য জাতি। প্রগতিশীল ও সম্পদশালী। সবই ঠিক। কিন্তু জাপান ইংরেজের মিত্র। ভারত সম্পর্কে উদাসীন। সুতরাং জাপান ত ভারতীয় বিপ্লবীকে কোন সাহায্য দেবে না।

এক বন্ধু বললেন, সাহায্য ত দেবেই না। বরং সঙ্গে জাল পাশপোর্ট আছে জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবে। আর আপনাকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবে।

আর একজন বললেন,—শুধু তাই নয়। আপনি একজন পলাতক বিপ্লবী আসামী।

তাহলে? ধরা পড়লেত সব প্লান মাটি।

কিন্তু আমাকে ত জাপানে যেতেই হবে। বিপ্লবীকে সব সময় বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে হয়।

সুরাবারায় দু'জন পুলিশের গুপ্তচরকে প্রয়োজনে গুলী করে আমাকে মারতে হয় নি?

জাহাজে বসে এই সব কথাই নরেন ভাবছিলেন। শেষে জাপানে যাওয়াই ঠিক করলেন।

শুধু সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে।

আবার নাম পাল্টালেন। এবার নতুন নাম মিঃ হোয়াইট।

১৯১৬ সাল, এই জানুয়ারী। কোবে বন্দরে জাহাজ থামলো।

বহু লোক নামলো। চীনা, জাপানী, বর্মা, ইন্দোনেসিয়ান, মালয়বাসী, ভারতীয় আরও কত।

মিঃ হোয়াইট নামলেন। সঙ্গে অবশ্য জাল পাশপোর্ট। সুন্দর সুচেহারার এক ভদ্রলোক। জাপান দেখতে এসেছেন। প্রত্যহ হাজার হাজার বিদেশী টুরিষ্ট জাপানে বেড়াতে আসেন।

পুলিশ ও কাষ্টমস্ মনে করলো এও তেমনি একজন টুরিষ্ট। কোন সন্দেহ করলো না।

সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতে বলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

তারপর ট্রেনে চেপে টোকিও এলেন। বিরাট টোকিও। পঞ্চাশ লাখ মানুষের কর্ম্মচঞ্চল এই শহর টোকিও। অবশ্য আজ টোকিও লোক সংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। চারিদিকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির স্বাক্ষর।

সামনেই একখানা ট্যাক্সী। চড়ে বসলেন।

সান-ইয়াৎ-সেনের ঠিকানা আগে থেকে সংগ্রহ করা ছিল। অসুবিধা হোল না।

শহরের শেষপ্রান্ত। একটা কাঠের বাংলো। জাপান ফুলের দেশ। বাড়ীর সামনে একটি ছোট সুন্দর ফুলের বাগান। রং বেরংএর মরশুমী ফুল। বেশ রোদ উঠেছে। শীতের রোদ। ভারী আরামদায়ক। সান-ইয়াৎ-সেন বাগানে বসে সেদিনের খবরের কাগজ খানা পড়ছিলেন।

দরজায় বেল-টিপতেই একটা চোদ্দ পনেরো বছরের সুশ্রী চীনা ছেলে বেড়িয়ে এল।

নরেন তার হাতে একখানা শ্লিপ দিলেন। তাতে লেখা ছিল: আমি একজন ভারতীয়। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি সান-ইয়াৎ-সেনের কাছে নরেনকে নিয়ে এল। একটু মিষ্টি হেসে তিনি তাকালেন।

নরেন বললেন,—আমি একজন ভারতীয় বিপ্লবী। রাস বিহারী বসুর সঙ্গে কাজ করেছি। আপনার কাছে আমি কিছু অস্ত্র ও রণ সম্ভার চাই। আমি শুনেছি ভারত-বর্মা সীমান্তে অবস্থিত ইউনান ও চেচুয়ান প্রদেশে রাজ-তন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। আপনি কিছু দিন এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছিলেন।

সান-ইয়াৎ-সেন একটু চিন্তা করে বললেন,—ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি?

নরেন বললেন,— কিছু অস্ত্র আপনি এখান থেকে সীমান্ত পার করে, ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিন।

তাহলে চীনের মুক্তি-কামী সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা গভীর সহযোগিতা গড়ে উঠবে। উভয় দেশের বিপ্লব সফল হবে।

বেশ, কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনাকে চীনে অবস্থিত জার্মান রাজ-দূতের কাছে যেতে হবে।

তাঁকে বুঝিয়ে, তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার আদায় করতে হবে। তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করবো। এদের টাকা দরকার।

নরেন বুঝলেন,— এ অসাধ্য সাধন। একজন অজ্ঞাত নামা বিপ্লবীর পক্ষে এই প্রভূত অর্থ আদায় করা সহজ সাধ্য কাজ নয়।

বড় কঠিন কাজ। তবু হতাশ হলে চলবে না।

নরেন উত্তর দিলেন।

বেশ, আপনার কথামত আমি পিকিংএ গিয়ে জার্মান রাজ-দূতকে এ কথা বলবো। দেখি তিনি কি বলেন।

এ সব ব্যবস্থা ঠিক করে মিঃ হোয়াইট ওরফে নরেন সেখান থেকে বেড়িয়ে এলেন।

জাপানী পুলিশের সঙ্গে চাতুরী ঃ

কি জানি কি করে জাপানী পুলিশের কাছে খবর পৌছে গেছে।

একজন পলাতক ভারতীয় বিপ্লবী জাপানে লুকিয়ে এসেছে।

জাপানী পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সচেতন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই ভারতীয় বিপ্লবীটির সঙ্গে জাপানী পুলিশ পেরে উঠছে না।

এ বড় বিষম ঠাই। চমকে বিস্ময় সৃষ্টি করে। এক লহমায় উধাও।

একজন জাপানী পুলিশ বলছে,—

এই যেন দেখলাম না, সেণ্ট্রাল টিউব ষ্টেসনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

আর একজন বললে,—দেখলে ত ঠিক, কিন্তু গেল কোথায় ?

এযে ধরি ধরি করি। ধরিতে না পারি। কোথা যেন যায় মিলাইয়া।

অথচ ছ ফুটের ওপর লম্বা এক বিশাল ব্যক্তি।

জাপানী পুলিশের সঙ্গে মি হোয়াইটের লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল।

নরেন ভাবছেন,— ধরা পড়লে ত চলবে না। তাকে পিকিং এ পৌঁছুতেই হবে।

এক রেশমী সুতার ফাঁসীর দড়ি। সব সময় তার চোখের সামনে আসছে। তাই সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে।

এ দিকে যে মহা-মুস্কিল :

জাপানী পুলিশ ছায়ার মত তা'র কিছু নিয়েছে। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সে দিনটা ভোলবার নয়।

১৯১৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী। সেদিন একেবারে হাতেনাতে জাপানী পুলিশের খপপরে পড়লেন। পেছনে না ফিরেও বুঝতে পারলেন। এবার পুলিশ খুবই নিকটে। এই বুঝি ধরে। কি করেন! আজ আর রক্ষা পাবার কোন পথ নেই। বেশ ভয় পেলেন। কিন্তু দমলেন না। রাস্তা খুঁজতে লাগলেন।

হঠাৎ চোখে পড়লো। রাস্তার উপরই এক প্রকাণ্ড সমবায় ভাণ্ডার। মস্ত দোকান। বিরাট প্রাসাদ। টোকিও কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্'। অগণিত লোকের আনা-গোনা।

মিঃ হোয়াইট চট্ করে সেই বিরাট দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সে দেশের নিয়মে চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে দোকানের ভেতর কেউ ঢুকবে না। নরেন তাড়াতাড়ি নিজের চামড়ার জুতো দরজার বাইরে রাখলেন। কাপড়ের জুতোগুলোর মধ্যে একটার ভেতর তিনি পা গলিয়ে দিলেন। তারপর নির্বিকার চিত্তে ও প্রফুল্ল বদনে দোকানের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

দোকানের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে, বেশ ভাল করে দেখে নিলেন।

একটা জুতোর স্টলের সামনে দাঁড়ালেন। বাঃ বেশ সুন্দর জুতো। আর দামেও সস্তা। নিজের মনোমত একটা জুতো কিনলেন।

জাপানী সেলস্ গার্ল খুব যত্ন করে জুতো জোড়াটি তাঁর পায়ে পরিয়ে দিলেন। তারপর মচ্ মচ করতে করতে প্রফুল্ল চিত্তে অপর এক দরজা দিয়ে মিঃ হোয়াইট সোজা বেড়িয়ে গেলেন।

এদিকে জাপানী পুলিশ তাঁর জুতো পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তাঁর আগমন প্রতিক্ষায়। এই ভাবে পুলিশ কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো সেই জানে।

ততক্ষণে শিকার পালিয়েছে।

মিঃ হোয়াইট দোকান থেকে সোজা বেড়িয়েছেন। টিউব ধরে একেবারে সাউথ ষ্টেসন। নেমেই একটি ট্রেন হাতের গোড়ায় পেলেন। তাই চেপে উধাও। একেবারে জাহাজ ঘাট।

জাহাজ ঘাটে এসে দেখলেন। সামনেই কোরিয়া গামী জাহাজ। তাই চেপে বসে একেবারে সিউল। সিউলে নেমে আবার জাহাজ। এবার এলেন দাইরেণ বন্দর। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে মুকদেন হয়ে পিকিং।

যাক্ নিশ্চিন্ত। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

কিন্তু ধন্য জাপানী পুলিশের কর্মতৎপরতা। ধন্য তাদের উপস্থিত বুদ্ধি। আর অদ্ভুত তাদের গোয়েন্দা বিভাগের সংবাদ সংগ্রহের অভিনব দক্ষতা।

জাপানী পুলিশ ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে। চীনে অবস্থিত বৃটিশ এলাকার পুলিশকে।

পিকিং স্টেসনে নেমেই দেখলেন। চারিদিকে পুলিশের বিরাট সমারোহ। সামনে পিছনে সর্বত্র পুলিশ। বুঝতে বিলম্ব হোল না কাকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য এই অভাবিত ও অভিনব রাজ-সূয় যজ্ঞ।

কিন্তু তখন আর পালান সম্ভব নয়।

এবার উপস্থিত বুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। হাসি মুখে ধরা দিলেন। যেন কিছুই হয়নি। সবাই অবাক হয়ে দেখলো। একজন ভদ্রবেশী লোককে বন্দুকধারী পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কেউ কেউ উৎসুক হোল। কে এই লোকটা। ঐ পর্যন্ত। তারপর যে যার কাজে চলে গেল।

পরদিন যথারীতি বৃটিশ কনসাল জেনারেলের কোর্টে আসামীকে হাজির করা হোল।

বৃটিশ এলাকার কনসাল এক বৃদ্ধ ইংরাজ। অতি অমায়িক। মধুর স্বভাবের লোক।

আসামীর অল্প বয়স। সুদর্শন চেহারা। বুদ্ধির দীপ্তি। এই সব দেখে তিনি একটু অবাক হোলেন।

নরেন তাঁর সামনে ছলনা ও চাতুরির এক অদ্ভুত অভিনয় করলেন। বললেন,—

আমার নাম সি, মার্টিন। আমি একজন ভারতীয় ছাত্র। ছুটিতে দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছি। এ দেশটা দেখে আমি ভারতে ফিরে যাব। বিদেশ ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। পুলিশ কেন আমাকে ধরলো বুঝতে পারছি না।

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাব। সুন্দর আর সহজ ভাবে কথা বলার ধরণ। এই সব দেখে বৃদ্ধ কনসালের বিশ্বাস হোল। পুলিশকে বলেন,— আমি বিশ্বাস করি. এই ভারতীয় ছাত্রটি নির্দোষী। দেশ ভ্রমণ ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমি সি, মার্টিনকে খালাস দিতে চাই।

কিন্তু পুলিশ ঘোরতর আপত্তি জানাল। বৃটিশ পুলিশের কর্তা বললেন,— ভারতীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। সে সংবাদ না আসা পর্যন্ত একে জেলে আটকে রাখা হোক।

বৃদ্ধ কনসাল পুলিশের কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হোলেন না। কিন্তু

পুলিশের প্রবল আপত্তি। কি আর করেন। মুক্তি দেওয়া সম্ভব হোলনা।

তাই আদেশ দিলেন,—একটা হোটেলে মার্টিনকে নজরবন্দী রাখা হোক। আর এর ওপর যেন জুলুম করা না হয়।

মিঃ মার্টিন হোটেলে ঢুকেই পালাবার শুলুক-সন্ধান খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন হোটেলের একটু দূর দিয়ে একটা খাল। সেটা পার হলেই জার্মান এলাকা। তবে একটু অসুবিধা। হোটেলের চারি পাশে খুব উঁচু পাচিল।

মনে মনে হাসলেন। তা বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। রাতের অন্ধকারে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে দেওয়াল স্কেল করে একবার বাইরে পৌছিলে হয়। তারপর অনায়াসে সাঁতরে গেলেই চলবে। নিজের সুটকেশটি আগেই কখন কায়দা করে পাচার করে দিয়েছেন। এক চীনা কুলির হাত দিয়ে। ব্যস্—এবার নিশ্চিন্ত।

জার্মান - রাজদূত :

জার্মান দূতাবাসে নিরাপদে তিনি পৌছে গেলেন। দেখা করলেন জার্মান কনসাল্ জেনারেলের সঙ্গে।

তিনি সব শুনে বললেন,—

বেশ কথা। কিন্তু শুধু মুখের কথায় ত টাকা দেওয়া যাবে না। এর জন্য পাকা চুক্তিপত্র চাই। আর যাদের হাতে এই সব অস্ত্র শস্ত্র আছে, তাদেরও এই চুক্তি পত্রে অন্যতম পক্ষ ভুক্ত হতে হবে।

নরেন বুঝলেন। অত সহজে কেউ টাকা দেবে না। তাই অগত্যা রাজী হোলেন।

তাই হবে। কিন্তু এরজন্য সময় দিতে হবে।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক হোল।

আবার দুর্গম পথে পাড়ি দিতে হবে। দেহ ও মনে স্বভাবতঃই

ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। কিন্তু নরেনের দেহ অন্য ধাতুতে নির্মিত। তাঁর সংকল্প,—

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দু উৎসর্গ করতে হবে।

মনে নতুন উৎসাহ ও অমিত বল সঞ্চার করলেন।

অজানা পথের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। দুর দুর্গম পথে কয়েক মাস ঘুরতে হোল। কঠোর পরিশ্রম। বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের দেশ। কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটে গেল।

কতদিন জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেল। বনে হিংস্র পশু লোকালয়ে হিংস্র মানুষ। হিংস্র পশুকে যদিও বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু হিংস্র মানুষকে কোন বিশ্বাস নেই। তবুও চলেছেন। উপায় কি?

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। অনেক বিপদের ঝুকি ঘাড়ে নিয়ে পথ চললেন।

শেষে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের অতি দুর্গম ও বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে ; এক প্রভাতে ইউনান প্রদেশে এসে পৌছুলেন।

তারপর সান-ইয়াৎ-সেনের গোপন চিঠি লোক মারফত বিদ্রোহী নেতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন নরেন দূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এক চীনা অফিসার তাকে বিদ্রোহী নেতার নিকট নিয়ে গেলেন।

উভয়ে অতি গোপনে পরামর্শ করলেন।

নরেন বললেন,—জার্মান রাজ-দূত আপনাকে একটা পক্ষ করতে চান।

বিদ্রোহী নেতা খুসী হয়ে বললেন,—ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। ইংরেজ আমাদের উভয়ের শত্রু। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আমরা ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে চাই। ভারত থেকে ইংরেজকে আগে তাড়াতে হবে।

তিনি চুক্তি পত্রে নিঃসংকোচে স্বাক্ষর দিলেন। বিদ্রোহী নেতার

আতিথেয়তা ও আত্মীয়তা ভোলবার নয়। বিপ্লবী নরেন রাজকীয় সম্মান পেলেন। তারপর এক সপ্তাহ পরে পিকিংএর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ফিরে এসে অনেক আশা নিয়ে জার্মান কন্‌সাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে চুক্তিপত্র দেখালেন। রাজদূত চুক্তিপত্র খানি উল্টে পাল্টে দেখলেন। আবার একটা প্যাচ্‌ কষলেন।

বললেন,—বার্লিন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এ টাকা দেওয়া যাবে না।

নরেন এ কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন।

সে কি কথা? আপনার শর্ত পুরো পালন করলাম। এখন আপনি অন্য কথা বলছেন।

বেশ তর্কাতর্কি হোল দুজনে।

আমরা আশা করেছিলাম ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি জার্মানদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমাকে নিরর্থক হতাশ করলেন।

তবে আপনি আমার একটা উপকার করুন। আমাকে নিরাপদে বার্লিনে পৌঁছুবার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

তখন কন্‌সাল বললেন,—তোমার প্ল্যান কি?

আমি আমেরিকা হয়ে জার্মানীতে যেতে চাই। সেটাই নিরাপদ।

বেশ, আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই।

নরেন আপাততঃ নিশ্চিন্ত হোলেন।

অতল সমুদ্রে জাহাজ ঘেরাও:

এক মাল-বাহী জাহাজে নরেনকে তুলে দেওয়া হোল। এবার পাশপোর্টের নাম অনুযায়ী সি, মার্টিন সাজলেন। আর আমেরিকার পথের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে চললেন। অতল সমুদ্র। ঢেউএর বুকে নাচতে নাচতে তাঁর জাহাজ ছুটেছে। বুকটা একটু হাল্কা হোল।

ভাবলেন,—এবার কিছু দিনের জন্য বোধ হয় বিপদ মুক্ত হওয়া গেল। একবার আমেরিকা পৌঁছুতে পারলে হয়। তখন বৃটিশ সরকারকে কলা দেখিয়ে অস্ত্র আমদানির পথ সহজ ও সুগম করে নেওয়া যাবে। কিন্তু তখনও বিপদ কাটেনি।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ জোর চলেছে। জার্মান সাব-মেরিন সমুদ্র পথে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। 'এমডেনের' নাম তখন সবার মুখে মুখে। বৃটিশ রণতরি সমুদ্রের বুকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ জনক প্রতিটি জাহাজ তল্লাসী করছে।

গভীর সমুদ্রের বুকে জাহাজ জোরে ছুটেছে। সি. মার্টিন তাঁর কেবিনে শুয়ে আছেন। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করে জাহাজের বাঁশী বেজে উঠলো। তাঁর জাহাজটা তিনটে পাক্ খেয়ে সমুদ্রের বুকে ঘুরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সি. মার্টিন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসলেন। ব্যাপার কি? কোন বিপদ হোল নাকি? শত্রু আক্রমণ করেনি ত?

মাত্র দু তিন মিনিট সময় হয়ত এই ভাবে কেটেছে। জাহাজের কাপ্তেন ছুটে এলেন তাঁর কেবিনে।

সর্বনাশ! বৃটিশ রণতরি সন্দেহ করছে এ জাহাজে একজন ভারতীয় ফেরারী বিপ্লবী আছে। তারা জাহাজ সার্চ করবে।

মার্টিনের মুখে কোন ভাবান্তর হোল না। কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই সে মুখে। শুধু বললেন,—তাহলে কি করতে বলেন?

তোমাকে আমরা এখনই জাহাজের খোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চাই। ধরা পড়লে জাহাজ শুদ্ধ আমাদের সবাইকে বন্দী করবে। ইচ্ছে করলে জাহাজ স্কাট্ল (scuttle) করতে পারে।

মার্টিন নির্বিকার চিত্তে বললেন,—উত্তম, সেই ব্যবস্থাই করুন।

জাহাজের মধ্যে অনেক দিনের একটা ভাঙ্গা পুরোন কফিনের বাক্স ছিল।

ক্যাপ্টেন বললেন,—তোমাকে এই কফিনের বাক্সের মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত মার্টিন সেই কফিনের বাক্সের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। কফিনের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোল। শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্য দুটো ছোট ফুটো রাখা থাকলো।

তারপর চার জন লোক যেমন করে মরা নিয়ে যায়, তেমনি করে কফিনটি জাহাজের পাটাতনের নীচে লুকিয়ে রেখে এল। মার্টিন মরার মত সেই কফিনের মধ্যে আটকে পড়ে রইলেন।

বৃটিশ মিলিটারী অফিসার তন্ন তন্ন করে জাহাজ তল্লাসী করলেন। একজন অফিসার সেই কফিনের ওপর পা দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু কোন ভারতীয় বিপ্লবীকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

মার্টিন ওরফে নরেন সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। জাহাজও বেঁচে গেল।

ফাদার মার্টিন ঃ

জাহাজ কোবে বন্দরে এসে পৌছুল। এবার তাঁকে ট্রেন ধরে টোকিওতে আসতে হোল।

আমেরিকা যাবার পাশপোর্ট ছিল। কিন্তু ভিসা ছিল না। ভিসা চাই। ভিসা ছাড়া আমেরিকায় ঢুকতে পারবেন না।

কিন্তু ভিসা আদায় করা ত মুস্কিল। সত্যি কথা বললে ত ভিসা পাওয়া যাবে না।

পাশপোর্টে নাম ছিল সি, মার্টিন।

এবার তিনি ফাদার মার্টিন সাজলেন। দোকান থেকে একটা পাদরির পোষাক কিনলেন। একটা সোনার গিল্টি করা ক্রুশ কোথা থেকে কিনে নিয়ে এলেন। তারপর লম্বা কালো কোর্টের ওপর সোনার ক্রুশটি সুন্দর করে ঝুলিয়ে দিলেন। হাতে নিলেন একখানা বাইবেল।

শান্ত সৌম্য মূর্তি। তরুণ ক্রিশ্চান মিশনারি। চেনবার উপায় নেই।

আরশিতে নিজের চেহারা দেখলেন। আর হাসলেন। কেল্লাফতে। আর কারও ভুল হবে না—এই মিশনারিকে।

এবার এলেন আমেরিকান কনস্যুলেট অফিসে। ভিসা চাই। কাউন্টারে দাঁড়ালেন।

ভিসা অফিসার এক তরুণী। সুন্দরী মার্কিন মহিলা। তিনি মৃদু হেসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

ফাদার মার্টিন বললেন,—আমি একজন মিশনারি। থিওলজি পড়ার জন্য আমেরিকা হয়ে প্যারিস যেতে চাই।

মহিলা ভিসা অফিসার। একবার তরুণ পাদরির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিলেন। হাতে বাইবেল,—বুকে ক্রশ। সুতরাং দ্বিধা করলেন না। হাসিমুখে পাশপোর্টের ওপর শীল-মোহর অঙ্কিত হলো। ভিসা দিয়ে দিলেন। যাক্ নিশ্চিন্ত।

জাহাজ ছাড়তে তখনও দু'দিন বাকি। হাতে অনেক সময়। ভাবলেন,—বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। রাস্তা যেন ভুল না হয়।

এখানেও জাপানী পুলিশদের কায়দা করে, ধোঁকা দিলেন। ফাদার মার্টিন রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলেন।

নরেনের মিশনারির পোষাক। রাসবিহারী হাসতে লাগলেন।

তোমাকে চিনবার যো নেই। কে বলবে, তুমি ক্রীশ্চান মিশনারী ছাড়া আর কিছু। আমি ত তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি।

নরেন একটু হাসলেন।

রাসবিহারীর সঙ্গে গোপনে অনেক পরামর্শ হোল। তারপর ফাদার মার্টিন গেলেন সোজা ইয়োকোহামা বন্দরে। সেখান থেকে জাহাজে চাপলেন। কারও সন্দেহ হোল না।

তবু ভয়; পাছে কেউ তাকে চিনে ফেলে। তাই রোজ সকালে

বিকেলে ডেক্ চেয়ারে বসতেন। নিষ্ঠাবান ধার্মিক পাদরি। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাইবেল পড়তেন। সবাই ভাবতো। ফাদার মার্টিন সত্যিই একজন নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চান্ ধর্ম প্রচারক।

ফাদার মার্টিন ফেলে আসা দিন গুলোর কথা ভাবছেন। ভাবছেন ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য কত দেশই না ঘুরলাম।

দেড় বছর ধরে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান, কোরিয়া, সাংহাই, চীন আরও কত শহর, আরও কত দেশ দেখলাম।

কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশলাম। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। পদে পদে কত অভাবিত বিপদের সঙ্গে পরিচয় হোল। আর, সেই সব বিপদের হাত থেকে কি রোমাঞ্চকর কৌশলে রক্ষা পেলাম। আজ আমি নিশ্চিন্ত।

ফাদার মার্টিন মানস চোখে দেখলেন,—ঐ দূরে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক আমেরিকার জাতীয় পতাকা। সগৌরবে প্রভাতের নির্মল আলোকে পত পত করে উড়ছে।

একদিন রাজা রামমোহন রায় একখানা ফরাসী জাহাজে স্বাধীন ফরাসীর পতাকা দেখে বলেছিলেন,—আঃ কি আনন্দ? কি অসীম তৃপ্তি !!

অবশেষে আমেরিকায় ঃ

১৯১৬ সাল ২৭শে জুন।

এক মধুর প্রভাতে 'স্যানফ্রান্সিস্কো বন্দরে তাদের জাহাজ এসে নোঙর করলো। ফাদার মার্টিন জাহাজ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। কাষ্টমস্ ও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলেন। এবার তিনি আমেরিকার স্বাধীন 'মাটিতে পা দেবেন।

তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য আমেরিকার জন-মত

অত্যন্ত প্রবল। সর্বত্র একটা সাজ সাজ রব। সে দেশের আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। এই বুঝি আমেরিকাও যুদ্ধে নামে।

ফাদার মার্টিন পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। আমেরিকার রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। নতুন জগৎ।

চারিদিকে আকাশচুম্বী বিরাট প্রাসাদ। সম্পদ ও সমৃদ্ধির সীমাহীন স্বাক্ষর। কি বিচিত্র দেশ এই আমেরিকা!

আপাততঃ রাত্রে মাথা গুজবার জন্য একটা আস্তানা চাই। কাছাকাছি একটা ছোট হোটেল খুঁজে বার করলেন। কিছু খেয়ে হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। এবার কতকটা নিশ্চিন্ত।

আঃ, আমেরিকার আকাশে বাতাসে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস।

পরদিন সকাল। ঘুম ভাঙ্গতেই চোখে পড়লো। সেদিন সংবাদ পত্রের বড় বড় হরফে শিরোনামা,—

রহস্যময় শত্রুর আমেরিকায় প্রবেশ! বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিপ্লবী অথবা বিপজ্জনক জার্মান গুপ্তচর? কে এই ব্যক্তি?

তাইত? এ দেখছি আর এক বিপদ। তারা কি ফাদার মার্টিনকে চিনে ফেলেছে? জার্মান গুপ্তচর বলে গ্রেপ্তার করবে নাকি? তাহলে এখানে থাকা কি নিরাপদ হবে। এ ভাবে এই ছোট-হোটেলে আর থাকা চলবে না।

ফাদার মার্টিন চিন্তিত হোলেন। একটা বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয় চাই। আর চাই বিশ্বস্ত বন্ধু। কোথায় পাব?

কার কাছে যাবো? ডঃ তারক নাথ দাস। শৈলেন ঘোষ। সুধীন বসু। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সাধু। অনেকের কথাই মনে পড়ছে। কিন্তু আমি ত তাদের কারো ঠিকানা জানি না। তাহলে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ভারতের বিপ্লবী বন্ধু যাদুগোপাল মুখার্জীকে। তাঁর ছোট ভাই ধনগোপাল মুখার্জী থাকেন

কালিফোর্ণিয়া ষ্টেটে। ষ্টান-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। শহরটির নাম পালা-আল্টো। তার কাছেই যাই।

তাড়াতাড়ি ব্রেক্‌ফাষ্ট শেষ করলেন। ট্রেন ধরে ছুটলেন। ধনগোপালের সন্ধানে। আশ্রয় চাই, সাহায্য চাই, পরামর্শ চাই।

ধনগোপাল বহুদিন আমেরিকায় আছেন। সাহিত্যিক ও সুলেখক। খুবই সুনাম অর্জন করেছেন। বহু বই লিখেছেন। সুন্দর সুন্দর ইংরিজিতে কবিতা লেখেন। আর প্রবাসী ভারতীয়দের একজন দরদী বন্ধু। তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।

ধনগোপালের বাড়ী খুঁজে বার করতে খুব বেশী কষ্ট হোল না। সন্ধান নিয়ে তাঁর এপার্টমেণ্টে গিয়ে হাজির।

বেল টিপতেই হাস্যমুখে বেরিয়ে এলেন ধনগোপাল : সামনেই এক অপরিচিত তরুণ ভারতীয় পাদরী। একটু অবাক হোলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কাকে চান ?

তখন ফাদার মার্টিন আসল পরিচয় দিলেন।

আমার নাম নরেন ভট্টাচার্য। পালিয়ে এসেছি আমেরিকায়। অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার সাহায্য চাই।

আপনি নরেন ভট্টাচার্য ? আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। দাদার চিঠিতে আপনার কথা আছে।

ধনগোপাল সাদরে তাঁকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। থাকার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। নরেন নিশ্চিন্ত।

তখন দুই বন্ধুতে পরামর্শ চললো।

ধনগোপাল বল্লেন,—আপনাকে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করতে হবে। নির্মম ভাবে মুছে ফেলুন। অতীতের সব স্বাক্ষর। এমন কি নামটি পর্যন্ত।

আপনাকে নতুন নাম নিতে হবে। তাহলে এ দেশের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করা সহজ হবে। কি প্রস্তুত ?

নরেন হেসে বল্লেন,—বেশ, তাই হবে! দেশের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত।

সেদিন সন্ধ্যায় ষ্টান-ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটা মিটিং ছিল। নরেন্দ্রনাথ নতুন নামে সেই সভায় পরিচিত হোলেন।

নতুন নাম,—এম, এন, রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়)

১৯১৬ সালের ৩০শে জুন। সেদিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ষ্টান-ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নতুন মানুষ এম, এন, রায়ের জন্ম হোল। আর মৃত্যু হোল চাংড়িপোতার নরেন ভট্টাচার্যের।

ধনগোপাল বহু লোকের সঙ্গে নরেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এঁর নাম মিঃ এম, এন, রায়। হিন্দুস্থান থেকে এসেছেন। দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।

সবাই তাই বিশ্বাস করলো।

ষ্টান-ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম, এন, রায় প্রায়ই বেড়াতে যান। সেখানে অনেক ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আর কি ভাবে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে, সে কথা ভাবছেন।

একদিন অধ্যাপক বিনয় সরকারের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন,—

রায়, আপনি নিউইয়র্কে যান। সেখানে বার্লিন কমিটি নাম দিয়ে জার্মান সরকার একটা ইংরেজ বিরোধী সংস্থা গড়ে তুলেছেন। তাঁরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য দিতে পারেন।

সংবাদ শুনে রায় খুব আশান্বিত হোলেন।

তিনি আরও বললেন,—ভারতকে অস্ত্র, অর্থ বা অন্য ভাবে সাহায্য নিতে হলে নিউ-ইয়র্ক শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে। কারণ নিউ-ইয়র্ক শাখা সুপারিশ না করলে কোন কাজই হবে না।

সেই দিন রাত্রেই ধনগোপাল, শৈলেন ঘোষ ও আরও দু'তিন জন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে এ সম্পর্কে রায় আলাপ করলেন।

সবাই বল্লেন,—আপনাকে নিউ-ইয়র্ক যেতেই হবে।

বন্ধুরা চাঁদা তুলে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে দিলেন।

রায় পরদিনই ট্রেনে চেপে নিউ-ইয়র্ক যাত্রা করলেন।

অর্থে, সম্পদে ও কৃষ্টিতে আমেরিকার বৃহত্তম বাণিজ্যিকরাজধানী। এই নিউ-ইয়র্ক। মার্কিনদের শ্রেষ্ঠ শহর। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শহরে রুটি রোজগারের জন্য আসে। আবার কাজ শেষ হলে, শহর পরিত্যাগ করে যে যার ঘরে ফিরে যায়। কেউ কারও দিকে ফিরেও চায় না। চাইবার সময় নেই।

নিউ-ইয়র্কে নেমে রায় দিশেহারা হয়ে গেলেন। কাকেও চেনেন না। কোথায় যাবেন ভাবছেন। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাওয়াই ঠিক। সেখানে অনেক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

একটা সস্তা কাফেতে কিছু খেয়ে নিলেন। একটা টিউব ধরলেন। এলেন কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

সেটা ১৯১৬ সাল, ৮ই অক্টোবর। শুনলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হলের মধ্যে বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তৃতা দিচ্ছেন। একজন বিখ্যাত ভারতীয় কংগ্রেস নেতা। কৌতূহল হোল।

তাঁর ত সভায় যাবার প্রবেশ পত্র ছিল না। অগত্যা হলের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন,—কে এই ভারতীয় কংগ্রেস নেতা।

লালা লাজপত রায়ঃ

যিনি বেড়িয়ে এলেন তাঁকে দেখেই রায় চিনলেন। ইনি লালা লাজপত রায়।

আরেঃ! আমার সঙ্গে ত এঁর কলকাতায় ছিল।

লালা লাজপত রায়। কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে, আর আস্তে আস্তে পা ফেলে আসছিলেন।

ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের মধ্যেই এই ছ' ফুটের ওপর লম্বা লোকটিকে দেখেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

যেন. চেনা চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে! তাইত? দু' জনের চোখা চোখি হোল। লাজপত এগিয়ে এলেন। আরেঃ নরেন!

নরেন আস্তে আস্তে বললেন,— এখানে আমার নাম এম, এন, রায়। আপনি এই নামে ডাকবেন।

লাজপত জড়িয়ে ধরলেন রায়কে নিউ-ইয়র্কের পথে। সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায়। দুই বিপ্লবীতে মিলন হোল।

হেসে বললেন,—হ্যাঁ, তুমি—এম, এন, রায়।

এই সেই পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়। ১৯২০ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা বিশেষ অধিবেশনে ইনি হয়েছিলেন সভাপতি।

স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে কোন দিনই মুছবে না। আজও তাঁর নাম দেশের পথেঘাটে।

সর্ব ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের একদিন তিনি হয়েছিলেন কর্ণধার। ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই শহরে তিনি ছিলেন সভাপতি।

নির্ভীক পুরুষ সিংহ। তখনকার দিনে দুর্লভ মানুষ। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষ্যে লাহোরে তীব্র বিক্ষোভ ও গণ আন্দোলন হয়। তার পুরোভাবে ছিলেন লালা লাজপত রায়। পুলিশ তাকে নির্মম প্রহার করে। লাজপত রায় লাহোর স্টেসনে সংজ্ঞাশূণ্য হয়ে পড়ে যান। তিনি আর সেরে উঠতে পারলেন না। সেই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লালা লাজপত রায়ের পাঞ্জাবের গদর পার্টির সঙ্গেও যোগ ছিল।

নিউইয়র্ক শহরে মানবেন্দ্র রায়ের মত এক সর্ব-ত্যাগী, নিরলস কর্মী ও বীর বিপ্লবীকে হাতে গোড়ায় পেলেন। আনন্দে তিনি

আত্মহারা হলেন। রায়কে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। বহু ভাবে সাহায্য দিলেন। এমন কি আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত।

আমেরিকায় আসার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে রায় বল্লেন,—আমি নিউ-ইয়র্কে অবস্থিত বার্লিন কমিটির নিকট অস্ত্র শস্ত্রের জন্য আবেদন করতে এসেছি।

লাজপত এ কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল,—বেশ, বেশ, দেখি এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কতটুকু সাহায্য দিতে পারি।

কিন্তু দুঃখের কথা বহু চেষ্টা সত্বেও রায় অস্ত্র সংগ্রহে কৃতকার্য হলেন না। নিউ-ইয়র্ক কমিটির সুপারিশ। জার্মান সরকার সাহস করে গ্রহণ করতে পারিলেন না। তাঁরা টাল বাহানা করতে লাগলেন।

ভারতীয় বিপ্লবীদের বিশ্বাস করতে দ্বিধা-গ্রস্থ হোলেন। রায়ের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। রায় প্রচণ্ড মনোবেদনা পেলেন।

কিন্তু তিনি ত আশাবাদী। কোন বিপদে ও বিপর্যয়ে দমবার পাত্র নন। আবার নতুন করে ভাবতে বসলেন,—কোন পথে আমেরিকায় বসে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য দেওয়া যাবে। কোন পথে?

রাজ-নৈতিক মুক্তি হলেই যে জনগণের মুক্তি হবে,—সে কথা বলা চলে না:

একদিন রায় শুনলেন। কলোম্বিয়া ইউনিভারসিটি কাম্পাসের মধ্যে র‍্যাডিক্যালদের একটা মিটিং হবে।

খবরটা দিলেন একজন ভারতীয় ছাত্র।

জানেন মিঃ রায়, আজ র‍্যাডিক্যালদের একটা মিটিং হবে।

রায় আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—র‍্যাডিক্যাল কারা?

ছাত্রটি বললেন,— বর্তমানে আমেরিকায় বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ সোসালিষ্ট, কেউ সিণ্ডিক্যালিষ্ট, কেউ প্রগ্রেসিভ, কেউ বা নিহিলিষ্ট। এদের বলা হয় র‍্যাডিক্যাল। এরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা মানে না।

লেমণ্ট বলে একজন আমেরিকান র‍্যাডিক্যাল আজ বক্তৃতা দেবেন। রায় সেই সভায় উপস্থিত হোলেন। সভার জন সমাগম মন্দ হয়নি। সবাই ছাত্র।

লেমণ্ট বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

আমরা মনে করি। কোন দেশের বা জাতির কেবল মাত্র রাজ-নৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই।

আমরা ভাবছি। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, সর্বহারা বঞ্চিত মানুষের কথা। যাদের পেটে ভাত নেই। পরনে কাপড় নেই। মুখে হাসি নেই। চোখে দীপ্তি নেই। কণ্ঠে ভাষা নেই। সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই। সেই সব মানুষের যতদিন না অর্থ-নৈতিক মুক্তি হচ্ছে, তত দিন রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন ও অবাস্তব। তাই পুরাতনের অচলায়তন আমরা ধ্বংস করতে চাই।

আর একজন বক্তা উঠে দাড়ালেন।

কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক ও সামাজিক শোষণ বন্ধ করতে হবে।

আমরা র‍্যাডিক্যালিষ্ট।

আমাদের দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই। সর্ব দেশের, সর্ব কালের, নিপীড়িত, নির্যাতীত, ও অবহেলিত মানুষ, আমাদের নিতান্ত আপনার জন। পরম আত্মীয়। আমরা বিশ্ব নাগরিক।

তিনি আরও বলেন,—

যদি এই সর্বহারাদের অন্তরের কথা, তাদের ব্যথা-বেদনা, সত্যি সত্যি উপলব্ধি করতে চান, তাহলে এদের কথা যিনি গভীর অন্তর দিয়ে চিন্তা করেছেন। শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন।

বিশ্ব বিপ্লবের দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। সেই মহা-সাধক কার্ল-মার্কসের ডাস্‌-ক্যাপিটল ছাত্র হিসেবে পড়ে দেখবেন।

রায় তখন আর এক জগতে। তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন, তাঁর দৃষ্টিকোণ খুলে গেল। আর এক নতুন ভগবানের কথা তিনি শুনলেন। বসুধৈব কুটুম্বকম্‌।

জাতীয়তার যে কালো রেশমী পর্দা তার চোখের ওপর এতদিন ধরে ঝুলছিল, তা আজ ধীরে ধীরে চোখের ওপর থেকে সরে গেল।

তার জায়গায় ভেসে উঠলো। বিরাট আন্তর্জাতীয়তার এক স্বচ্ছ, সুন্দর ও সুনির্মল দিগন্ত। এক নতুন আদর্শ।

এম, এন, রায় র‍্যাডিক্যাল বনলেন। দলের নিষ্ঠাবান সক্রিয় সদস্য বলে সর্বত্র পরিচিত হোলেন। নতুন চিন্তা শুরু হোল।

তারপর প্রবল আগ্রহ, গভীর মনোযোগ ও পবিত্র নিষ্ঠা নিয়ে ডাস-ক্যাপিটল পড়তে বসলেন। ক্ষুধার্ত অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা। তাঁকে পাগল করে তুলেছে।

নতুন ভগবানের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

বিরাট আলোচনা-চক্র বসলো। আমেরিকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সব র‍্যাডিক্যালরা এলেন। রায়ের আগ্রহ প্রবল। উৎসাহ নিয়ে সর্বত্র কাজ শুরু হোল। বিশাল আমেরিকার মানুষ এই নতুন ভগবানের কথা শুনলো।

কার্ল-মার্কসের আদর্শ ও প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলাপ আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো।

রায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাগ্র চিত্তে ডাস্‌-ক্যাপিটল পড়ছেন। মহা সাধকের মত তপস্যায় ব্রত নিয়ে।

ভাবলেন শুধু দর্শন পড়লে হবে না। এই দর্শনের যিনি জনক, সেই আসল মানুষটাকে জানতে হবে। হাতে এল এক খানা বই। কার্ল-মার্কসের জীবন-কথা। তাই পড়তে শুরু করলেন। প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে।

কার্ল-মার্কস (১৮১৮—১৮৮৩)

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যে বইতে প্রথম বাস্তবরূপ নিল, সেই বইখানার নাম—ডাস্‌-ক্যাপিটল। তাঁর দর্শনের নাম মার্কস-বাদ। কার্ল-মার্কস্‌ ১৮১৮ সালে জার্মানীর অন্তর্গত ট্রিয়ার নামক এক গণ্ডগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল হেনিরিক মার্কস্‌। তিনি ছিলেন একজন বিত্তশালী 'জু'। পরে তাঁর বাবা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।

স্থানীয় স্কুলের পাঠ শেষ হলে, পুত্র কার্লকে বাবা পাঠালেন বন ও পরে বার্লিন বিশ্ব বিদ্যালয়ে। আইন পড়বার জন্য। কিন্তু কার্লের আইন পড়তে ভাল লাগলো না। তিনি সেই সময়কার দর্শনের আলোচনায় মেতে গেলেন।

তখন হেগেল ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর দর্শন হোল বিপ্লবের দর্শন। তাঁর দর্শনের নাম হোল, 'ডাইলেকটিক্‌ দর্শন'। তার মানে হোল, পরিবর্তন ধর্মী দর্শন। হেগেলই প্রথম বললেন। Change was rule of life পরিবর্তনই জীবনের শাশ্বত নিয়ম।

তরুণ কার্ল মার্কস। ক্ষুধার্ত মানুষের মত হেগেলের দর্শন গিলতে লাগলেন। এতবড় বৈপ্লবিক দর্শনের জনক ছিলেন হেগেল। প্রুসিয়া সরকার তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁরা গর্বের সঙ্গে বলতেন,—Hegel was like God walking on earth. আস্তে আস্তে হেগেলের দর্শন জন-প্রিয় করবার জন্য একটা আলোচনা চক্র গড়ে উঠলো। আর মার্কস হোলেন তার উদ্যোক্তা। হেগেলের মতে মার্কস দীক্ষা নিলেন। একজন পাকা দর্শনের ছাত্র বনে গেলেন।

এবার মার্কসের কর্ম-জীবন আরম্ভ হোল। তিনি সংবাদিক হবার জন্য এগিয়ে এলেন। জার্মানতে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত দলের একটা সংবাদপত্রের সম্পাদক হলেন। কাগজটির নাম,—Rheinische

Zeitung। মার্কস তখন উগ্রপন্থী র‍্যাডিক্যাল দলে চলে গেছেন।

এই সময় মার্কসের একজন বিপ্লবী মানুষের সঙ্গে আলাপ হোল। তাঁর নাম ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস্‌। মার্কসের লেখা পড়ে তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে উঠেন। একদিন তিনি মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এক সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। এই এঙ্গেলস্‌। মার্কস্‌ এতদিন খুঁজছিলেন তাঁর ব্যথার ব্যথী এক দরদী মানুষকে। এঙ্গেলসের মধ্যে খুঁজে পেলেন। সেই হারান মানুষটিকে। দুজনেই হেগেলের ভক্ত। তাদের ভালবাসা, বন্ধুত্ব এবং নিবিড় সহযোগিতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ও অক্ষুন্ন ছিল।

এঙ্গেলস্‌ না থাকলে মার্কসকে তুলে ধরতো কে? মার্কসের শ্রেষ্ঠ পুস্তক,—Das Kapital, সাধারণ মানুষের নজরে আসতো না। পৃথিবী বঞ্চিত হোত।

এই বিরাট গ্রন্থ লিখতে মার্কসের আঠার বছর সময় লেগেছিল। ১৮৬৫ সালে এই বই লেখা শেষ হয়। তিনটি বিরাট বিরাট খণ্ডে এই বেদ (দর্শন) লেখা শেষ হয়েছে। প্রথম খণ্ড ছাপতে দু'বছর সময় লেগেছিল। তখন মার্কস্‌ বেঁচে ছিলেন।

মার্কসের মৃত্যুর পর ২য় খণ্ড ১৮৮৫ সালে ৩য় খণ্ড ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এর জন্য এঙ্গেলস্‌ প্রাণান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন।

পঁচিশ শত পাতার হাতে লেখা ছোট-বড় কাগজ। তাতে আছে অসংখ্য পরিসংখ্যান। অতি ছোট ছোট, জড়ান, অস্পষ্ট লেখা। খোলা ও ছেড়া ছেড়া অসংখ্য কাগজের টুক্‌রো। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। বলা চলে অসাধ্য সাধন করে গেছেন এঙ্গেলস্‌।

একদিন এঙ্গেলসের সঙ্গে আলাপ করছেন কার্ল মার্কস। আলাপের

বিষয়বস্তু,—কম্যুনিজমের দর্শন ও প্রয়োগ কৌশল। মার্কসের মতে, এঙ্গেলস্ একজন পাকা কম্যুনিস্ট। আলাপ থেকে আরম্ভ হোল তুমুল তর্ক। হাতাহাতি হয় এমনি অবস্থা। কেউ নতি স্বীকার করার পাত্র নয়। হঠাৎ মার্কস বলে বসলেন—I do not know Communism. আমাকে সমাজ দর্শনের ছাত্র বলতে পার। শুনতে কেমন লাগে। তাই না?

সেই সময় জার্মান সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখলেন। ফলে জার্মানী থেকে তাঁকে বিতাড়িত করলো। পালিয়ে এলেন প্যারিসে।

প্যারিসে একটা উগ্র পন্থীদের কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হোলেন। প্যারিসে মার্কস অর্থ-নীতি নিয়ে খুব বেশী মনোযোগী হোলেন। এখানে মার্কসের বিখ্যাত মতবাদ,—dialectical materialism এর জন্ম হোল।

শেষ পর্যন্ত প্যারিস থেকে মার্কসও বিতাড়িত হোলেন। কিছু দিন ব্রুসেলস্ ও জার্মানী ঘুরে এবার এলেন লণ্ডনে।

১৮৪৯ সালে মার্কস লণ্ডনে পালিয়ে এলেন। একাধিক্রমে তেত্রিশ বছর মার্কস ইংলণ্ডে ছিলেন। লণ্ডনে ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ইংলণ্ড মার্কসকে আশ্রয় দিলেন।

লণ্ডনে এসে নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়লেন মার্কস। কোন উপার্জন নেই,—অথচ খরচ আছে। সংসারে স্ত্রী, নিজে, আর ছোট ছোট তিন চারটি ছেলে মেয়ে। এর ওপর ছিল তাঁদের বহু দিনের এক পুরোন ঝি। সেও পরিবারের লোক হয়ে গেছলো। সবার সঙ্গে হাসিমুখে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন সেই ঝি সহ্য করতো। মার্কস আদর করে সেই ঝিকে বলতেন,—আমার মা।

মাঝে মাঝে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে প্রবন্ধ লিখে মার্কস কিছু কিছু রোজগার করতেন।

সে সময় মার্কসের জীবনে কঠোর তপস্যা চলছিল। সকাল দশটা

থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত তাঁর কাটতো বৃটিশ মিউজিয়মে। বই পড়ে আর নোট লিখে।

খিদের জ্বালায় সর্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করতো। কোনদিন দু টুকরো রুটি জুটলো ত খুবই ভাল। আর না জুটলো? অনাহারে কাটিয়ে দিলেন দিনের পর দিন। না খেয়ে বৃটিশ মিউজিয়মে বসে পড়ছেন। অর্থনীতি এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ পুস্তক।

না খেয়ে মানুষ আর কতদিন পড়তে পারে। শেষে একদিন এমন হোল দিন আর চলে না। তখন মার্কস্ অনেক কষ্টে রেলে একটা কেরাণীর চাকুরি সংগ্রহ করলেন। কিন্তু সে চাকুরিও থাক্‌লো না। কারণ মার্কসের হাতের লেখা এত খারাপ যে রেল-কোম্পানী তাঁকে অপদার্থ মনে করে জবাব দিল!

অথচ দুটো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। ঘরে যে সামান্য আসবাবপত্র ছিল তাই এক এক করে বেচতে লাগলেন। শেষে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মার্কস এক বন্ধুকে লিখছেন।

আমার স্ত্রী গুরুতর পীড়িত। ছোট মেয়ে তারও অসুখ। ডাক্তারকে ভিজিট দেবার টাকা নেই। ডাক্তার ডাকতে পারছি না। আজ আট দশদিন ঘরে কিছু নেই। আমরা বাড়ী শুদ্ধ কয়েক টুকরো রুটি আর কটা আলু খেয়ে আছি। তাও বোধহয় আর জুটবে না।

আজ কয়েকটা শিলিং আর পেনি ধার করলাম। কারখানার শ্রমিকরা দিল। কি করবো। উপায় ছিল না। না হলে উপবাসে মরতে হবে।

দুই মেয়ে আর আমার একমাত্র ছেলে। কষ্টের মধ্যে মারা গেল। স্ত্রী নিজের হাতে তাদের কবরে রেখে এসেছে। উপায় ছিল না।

আর এক দিনের কথা। সেদিন ঘরে এক টুকরো খাবার নেই।

জিনি (মার্কসের স্ত্রী) চুপ করে বসে আছেন। মার্কস্ কোন কথা না বলে, আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। নিজের গায়ের গরম কোট আর জুতো জোড়াটা বিক্রি করলেন। তাই বিক্রি করে কটা শিলিং জোগাড় করলেন। তাতে কয়েকটা দিন চললো।

এদিকে মুস্কিল। এমন একটা গায়ে দেবার কিছু নেই যা মার্কস্ ব্যবহার করবেন। তার ওপর ইংলণ্ডের দারুণ শীত। বাড়ীতে দরজা জানালা বন্ধ করে মার্কস্ খালি গায়ে বসে আছেন! শীতে কাঁপছেন। আর মনে মনে ভাবছেন। এমনি করে আর কত দিন চলবে?

টুক্ টুক্ টুক্। হঠাৎ দরজায় কে টোকা দিল? জিনি তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিলেন। এঙ্গেলস্ এসে হাজির। সোজা ঢুকলেন মার্কসের ছোট্ট কুঠুরিতে। মার্কসকে দেখে অবাক! এ যেন সাংখ্যের পুরুষ! খালি গা, খালি পা! নির্বিকার! নির্লিপ্ত! সদা হাস্যময়! মহা সাধক।

এঙ্গেলস্ বললেন,—ব্যাপার কি? মার্কস হাসতে লাগলেন। জিনি বললেন,—মুরের জামা ও জুতো জোড়াটা বিক্রি করে আমাদের এখন দিন চলছে। [মার্কসের গায়ের রং খুব কালো ছিল বলে জিনি স্বামীকে আদর করে মূর বলতেন]

এঙ্গেলস্ তখনই বাজারে ছুটলেন। নতুন জামা, জুতো কিনলেন। ডাক্ টিকিটের পয়সা দিলেন। কয়েকটা সপ্তাহ চলার মত খরচ দিয়ে চলে গেলেন। খুব রাগ করলেন।

কেন আমাকে লেখো নি? মার্কসের আবার হাসি।

তখন মার্কস্ ডাস ক্যাপিটল লিখছেন। পেটে রুটি নেই। তার সঙ্গে আর এক বিপদ—সর্বাঙ্গে বিষফোড়া। অসহ্য যন্ত্রণা সর্ব-দেহে। যত পেট জ্বলছে; লেখার ভাষাও হচ্ছে তেমনি তীব্র, তেমনি ভীষণ, তেমনি কটু।

দিনের পর দিন শুধু পড়াশুনা। বিভিন্ন বিষয়,—রাজ-নীতি,

অর্থ-নীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, অঙ্ক-শাস্ত্র, মিলিটারী কলা-কৌশল। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার মন্থন করলেন মার্কস্। আর সে অমৃত বিশ্বে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি নীলকণ্ঠ।

১৮৬৪ সালে মার্কস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা গড়ে তুললেন। লিখলেন ১৮৬০ সালে; বিশ্ব বিখ্যাত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেষ্টো। জ্বালালেন বিশ্ব-বিপ্লবের হোমাগ্নি।

জীবনে ও কর্মে মার্কস ছিলেন অত্যন্ত বে-পরোয়া, একগুঁয়ে এবং কটুভাষী। অন্যায়কে কোনদিন মেনে নেননি।

যে কেউ তাঁর যুক্তি বুঝতে পারতো না, তাকেই তিনি অত্যন্ত রূঢ় ও কটু ভাষায় অপমান করে বসতেন!

এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে।

একদিন এক জার্মান যুবক মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। যুবকটির নাম,—ওয়েটলিং। বেচারী দরজীর কাজ করতেন। শ্রমিক আন্দোলনে যুবকটি খুব উৎসাহী কর্মী। মার্কসের নাম শুনে দেখা করতে এসেছেন।

মার্কস তার সঙ্গে সমাজ-তন্ত্র নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা শুরু করে দিলেন। গভীর দার্শনিক আলোচনা। সে বেচারী কার্লমার্কসের সঙ্গে এই তথ্য আলোচনা করতে পারবে কেন? চুপ করে বসে আছে। মার্কসের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে পাচ্ছে না। মার্কস চটে লাল তার ওপর।

চিৎকার করে বলে উঠলেন,—অজ্ঞতা কাউকে কোন ভাবে সাহায্য করবে না। বেচারী পালাতে পথ পায় না।

আবার যদি মতের মিল হোল, তাহলে তিনি ভারী খুশী। তার পিঠ চাপড়াতে আরম্ভ করবেন।

আর একটা গল্প:

একদিন এক ভদ্রলোক প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

তাঁর নাম প্রাউডন্। তিনি একখানা বই লিখেছেন। বইখানার নাম,—Property is theft. সম্পত্তি হোল চুরি।

মার্কস ভারী খুসী তার ওপর। তুমি ঠিক বলেছ। তুমিই আমাকে ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ। মার্কস্ তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

একদিন মার্কস আলোচনা করতে বসেছেন। সারপ্লাস ভ্যালু বলতে কি বোঝায়? মার্কস একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন:

মনে কর, একজন মেহনতি মানুষের বাঁচতে গেলে দৈনিক ছ' ঘণ্টা শ্রমের দরকার। তাহলে তার শ্রমের মূল্য হবে ১ ঘণ্টার মজুরি × ৬ ঘণ্টা; অর্থাৎ যদি তাকে ঘণ্টায় এক ডলার মজুরি দেওয়া হয়, তাহলে সে দৈনিক ছয় ডলার মজুরি পাবে। কিন্তু একজন শ্রমিক কারখানায় ছয় ঘণ্টা কাজ করে না। সে কাজ করে আট ঘণ্টা। তাহলে আট ঘণ্টার কাজ করিয়ে নিয়ে, তাকে ছয় ঘণ্টার মজুরি দেওয়া হোল। তাহলে এই দুই ঘণ্টা হোল পুঁজিপতির লাভ।

এই যে দুই ঘণ্টা কাজের জন্য মজুরি দেওয়া হচ্ছেনা, মার্কস্ তার নাম দিয়েছেন, সারপ্লাস্ ভ্যালু।

একদিন কথাচ্ছলে অনুগামীদের মার্কস বলেছিলেন,—কম্যুনিজম কি, তাই জানতে চাইছো তোমরা? এটা কি জান?

Communism is a cry born only of frustration and despair. তার মানে কম্যুনিজম হোল—

শুধু নৈরাশ্য আর পরাভবের বুক্ ফাটা কান্না। তাই তিনি এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছেন,—Communism is the Common destiny of the human race. সুতরাং কম্যুনিজম ব্যতীত মানুষের বাঁচবার পথ নেই।

কিন্তু মজার কথা হোল,—সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) আর পুঁজিবাদ (Capitalism), এই দুটো কথা নিয়ে আমাদের আজ তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই। অথচ কার্লমার্কস্ বলে গেলেন,—

British conquest of India had historically a

revolutionary significance. তাহলে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেও বিপ্লবের বীজ নীহিত ?

আর পুঁজিবাদ সম্বন্ধে মার্ক্স বললেন,—Capitalism historically had a progressive role to perform.।

ইতিহাস বলে,—প্রগতির জয়যাত্রার মূলে আছে পুঁজিবাদ! তাহলে ?

মানবেন্দ্র নাথ নিউইয়র্কে বসে ২৫০০ পাতার সমগ্র ডাস-ক্যাপিটলখানা পড়ে ফেললেন। তার সঙ্গে পড়লেন। কার্ল-মার্ক্সের জীবন ও কর্ম। মার্ক্সের দর্শন সম্বন্ধে তিনি গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করলেন। কম্যুনিজমে দীক্ষা নিলেন। মার্কসবাদের অনুগামী হোলেন। তাঁর মনে হোল, কার্ল-মার্কস সর্বহারার জীবন্ত ছবি। বুকের রক্ত দিয়ে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে' ডাস-ক্যাপিটল লেখা।

আমেরিকায় গ্রেপ্তার :

নিউ ইয়র্কে অস্ত্র সংগ্রহের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

গদর পার্টি'র সঙ্গেও যোগাযোগ করা গেলনা। চারিদিকে অন্ধকার।

কিন্তু রায়ের অভিধানে হতাশা বলে কিছু নেই। তাই আবার নতুন করে ভাবতে বসলেন। ঠিক করলেন। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে একবার আলাপ করা যাক। অস্ত্র সংগ্রহের যদি নতুন কোন ব্যবস্থা করা যায়।

লাজপত রায়ের সঙ্গে কথা হোল। তিনি বললেন,—রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আমেরিকায় এসেছেন। তার সঙ্গে একবার দেখা কর। মহেন্দ্র প্রতাপ লস্ এঞ্জেলসে আছেন।

এম, এন, রায় পরদিনই লস্ এঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে ভাগ্যক্রমে অধ্যাপক বিনয় সরকার, ডঃ তারক নাথ দাস, শৈলেন ঘোষ, সুধীন বসু ও আরও অনেক প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা হোল।

তাঁরা বোষ্টনে একটা গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। তারপর সেখান থেকে চেষ্টা চললো। কি ভাবে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা যাবে।

আমেরিকা তখন জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সুতরাং বহু জার্মান আত্ম-গোপন করে লুকিয়ে আমেরিকায় আছেন।

বোষ্টনকে কেন্দ্র করে সিকাগো, সান-ফ্রানসিসকো, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি শহরে গুপ্ত সমিতির কাজ শুরু হয়ে গেল।

আমেরিকার গোয়েন্দা পুলিশ সংবাদ পেয়েছে। এম্, এন, রায় জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সেদিন নিউ-ইয়র্কের কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় রায় বক্তৃতা শুনতে গেছলেন। সভার শেষে তিনি লাজপত রায়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরছেন।

দেখলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেন গেটের গোড়ায় একজন আমেরিকান পুলিশ সাবধান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন শ্বেত পাথরের খোদাই মূর্তি। সাদা পোষাক। মাথায় হেলমেট্। কোমরে রিভলভার। স্থির- গম্ভীর। কত ত লোক, গেট দিয়ে পার হোল। কাকেও পুলিশ কিছু বলছে না।

রায় যেই গেটের কাছে এলেন; অমনি সেই শ্বেত পাথরের মূর্তি থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ এল— stop. দাঁড়াও।

রায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। পুলিশ রায়কে গ্রেপ্তার করলো।

ওয়াল ষ্ট্রীট পুলিশ ষ্টেশনে রায়কে ধরে নিয়ে গেল।

সেই রাতেই পুলিশের বড় কর্তার সামনে রায়কে হাজির করা হোল।

রায়ের সহজ, সরল ও সপ্রতিভ ভাব। পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে আলাপ করলেন। যেন কিছুই হয়নি।

আমি একজন ভারতীয় ছাত্র। আমেরিকায় বেড়াতে এসেছি। পুলিশ নিশ্চয়ই ভুল করে আমাকে ধরেছে।

পুলিশের বড় সাহেব; মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। বিশ্বাস করলেন তাঁর কথা।

ঠিক আছে। ব্যক্তিগত জামিনে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। তুমি কাল বেলা দশটায়; ওয়াল ষ্ট্রীট পুলিশ আদালতে হাজির হবে।

রায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাসায় ফিরলেন।

পরদিন যথাসময়ে রায় কোর্টে হাজির হোলেন। সেখানে একই অভিনয় করলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললেন,—

পুলিশ সন্দেহ ক্রমে আমাকে ধরেছে। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনা। কি আমার অপরাধ ?

ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের কাছে রিপোর্ট নিলেন। কোন সঠিক অভিযোগ রায়ের বিরুদ্ধে পাওয়া গেল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়কে জামিনে মুক্তি দিলেন।

রায় মুক্ত হয়ে ফিরে এসে খবর পেলেন। আমেরিকায় পুলিশ ভারতের পুলিশকে লিখেছে। এই সব ষড়যন্ত্রের কথা।

ভারত থেকে কাগজ পত্রের জন্য আমেরিকার পুলিশ অপেক্ষা করছে। কাগজ পত্র না পেলে চার্জ ফ্রেম করার অসুবিধা আছে। তাই আমেরিকার পুলিশ রায়কে জামিনে খালাস দিয়েছে।

শৈলেন ঘোষ বললেন,—টামানি হলে একটা খবর এসেছে। পুলিশ শীঘ্রই স্যানফ্রান্সিসকোতে একটা বড় রকমের হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করবে। রায় হবেন তার প্রধান আসামী।

সাংহাই থেকে সুকুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এনেছে। সে হবে রাজসাক্ষী। গোপনীয় সূত্রেআরও জানতে পারলাম। কলিকাতা

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ডেনহামকে আমেরিকায় পাঠান হয়েছে। সে মামলা পরিচালনা করবে।

রায় চিন্তা করে বললেন। আমেরিকার কারাগারে একবার নিক্ষিপ্ত হলে হয়। আমাকে বন্দী অবস্থায় ভারতে পাঠাবে। আমার সকল পরিকল্পনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে।

রাজ-দ্রোহের অপরাধে আমাকে হয় ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হবে। না হয় যাবজ্জীবন আন্দামানের সেলুলার জেলে পচতে হবে।

সুতরাং ধরা পড়লে চলবে না। আমাকে পালাতে হবে।

ডঃ তারকনাথ দাসেরও সেই মত।

তিনি বললেন,—সংকট যে খুব ঘনিয়ে আসছে তা আমিও বুঝছি। কিন্তু আমেরিকার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালান সহজ নয়। তার ওপর আপনি একজন বিদেশী। তবু পালাতে হবে। আর কোন পথ নেই।

কোথায় পালাব ?

আমার মনেহয় পাশের রাজ্য মেক্সিকোতে পালানই নিরাপদ। মেক্সিকোতে এখন সমাজবাদী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে তাদের একটু মন-কষাকষি চলছে শুনেছি। সুতরাং এই সুযোগ।

তাই ঠিক হোল। রায় মেক্সিকোতে পালাবেন।

ক্রমশঃ রায় বুঝতে পারলেন। আমেরিকার গোয়েন্দা পুলিশ ; ছায়ার মত পথে ঘাটে তাঁকে অনুসরণ করছে। নিউ-ইয়র্কের সুদক্ষ পুলিশ। তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে।

রায় অসাধ্য সাধন করলেন। তিনি পালাবার সুযোগ খুঁজছিলেন। র‍্যাডিক্যাল দলের বন্ধুরা সাহায্য দিলেন।

সে দিন সন্ধ্যা থেকে প্রবল ঝড়

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর শীলা বৃষ্টি আরম্ভ হোল। ঘরের বার হয় কার সাধ্য। মহা প্রলয়।

পুলিশকে রায় গোলক ধাঁধাঁয় ফেললেন। দু'দিন আগেই তিনি এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। সেখানে লুকিয়ে থাকলেন।

তারপর মহাদুর্যোগের সুযোগ নিয়ে; সেই রাত্রেই অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিলেন। প্রবল বৃষ্টি ও দুর্যোগ; গভীর রাত্রি। বন্ধুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল।

Ready?

Yes.

বন্ধুরা সীমান্ত পার করে দিলেন। কাকপক্ষী টের পেল না।

অপরিচিত এক বিদেশী। বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। সহায় ও সম্বলহীন। মেক্সিকোতে পদার্পণ করলেন। নতুন আশার আলো। তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হোল।

কে যেন চিন্তিত রায়ের কানে কানে বলে গেল,—হবে হবে প্রভাত হবে, আধার যাবে কেটে।

মেক্সিকোতে এম, এন, রায়:

তারিখটা ছিল ১৯১৭ সালের ১১ই মে।

রায় অত্যন্ত গোপনে; সবার অজ্ঞাতে; মেক্সিকোতে এসে পৌছুলেন। প্রভাত হোলে একটা সস্তার হোটেল খুঁজে নিলেন।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছেন। এমন সময় কানে গেল। দু'জন বিদেশী আলাপ করছেন।

শুনেছ কাল পুয়েবলা শহরে আর ভারাক্রুজ বন্দর এলাকায় খুব গোলমাল হয়েছে। বহু লোক মারা গেছে। গুলী চলেছিল।

অপর ব্যক্তি বললেন,—আজ ছ' মাস ধরে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র গৃহ-যুদ্ধ। আর গোলমাল চলছে। একদিকে অভিজাত

সম্প্রদায়,—জমিদার, ব্যবসাদার ও বড়লোকের দল ; আর এক দিকে কারাঞ্জা সরকার।

দেখছি এ দেশে আর কাজ কারবার করা চলবে না।

কি করে চলবে বল। প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা সমাজবাদী সরকার গঠন করেছেন। দেশের জমি, খনিজসম্পদ ও বহু শিল্প ; জমিদার আর বিদেশী মালিকদের হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিয়েছেন। সে সব জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত। বড়লোকদের কথা একটুও ভাবলেন না। দেশের ও বিদেশের সব লোক চটে গেছে।

তাহলে দেশে কি করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

শান্তির কথা আর বলো না। কারাঞ্জা সরকারের জুলুমের ফলে দেশের সর্বত্র ভীষণ অরাজকতা দেখা দিয়েছে। আর নিরাপত্তা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। সরকার আর কদিন ?

আমেরিকায় থাকতেই এ দেশে সিভিলওয়ারের একটা গুজব শুনে রায় এসেছিলেন। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গে তাদের কথা-গুলো শুনতে লাগলেন। ইংরিজিতে আলাপ হচ্ছিল।

প্রথম লোকটি বলেই চলেছেন।

আর একটা মজার কথা শুনেছ। মেক্সিকোতে পাঞ্চোভিল্লা আর জাপাটা নামে দুটো গুণ্ডা প্রকৃতি লোক আছে। তারা সুযোগ বুঝে একটা অসামাজিক দল গড়ে তুলেছে। এদের পেছনে বড় লোকদের সব রকম সমর্থন আছে।

তারা দেশের সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা সুবিধাবাদী আর নীতিজ্ঞান বর্জিত।

তাদের কথা হোল,—এলো মেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই।

বন্ধুটি খুব হাসতে লাগলেন।

হাসির কথা নয়। এই গুণ্ডারা দূর দূর অঞ্চলের কৃষকদের কারাঞ্জার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারওপর আছে মার্কিন

সরকারের উস্কানি। তাহলে বুঝতে পারছো। দেশটাকে এই সব গুণ্ডারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য কি জান? কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষার জন্য কারাঞ্জা সরকার জমি, খনিজ-সম্পদ ও শিল্প জাতীয়করণ করলেন। তারা কিন্তু কারাঞ্জার এই বিপদের দিনে এগিয়ে এল না। কোন সাহায্য দিল না।

দুজন অপরিচিত বিদেশী। তাদের মুখে ওদেশের কথা শুনলেন। নতুন কথা।

রায় চিন্তা করলেন।

কেন তারা সাহায্য দিল না। বুঝতে বিলম্ব হোল না। তার কারণ কি? তারা মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। তারা বংশানুক্রমে দেখে আসছে। তারা উলুখড়! তারা সভ্যতার পিলসুজ! ওপরে শুধু আলো জ্বলবে। আর তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়বে।

তারা অশিক্ষায়, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরবে। তাদের কথা কেউ চিন্তা করবে না। আর্থিক অসাম্য, ও দারিদ্র্য তাদের নিত্য সাথী।

এই সমাজ ব্যবস্থাই; তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা ত দূরের কথা। ইহার বিরুদ্ধে স্বপ্ন দেখাও তাদের পক্ষে পাগলামি।

রায় চিন্তা করে দেখলেন,—তাদের এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুবা কিছুই করতে পারা যাবে না। বৈপ্লবিক পরিবর্তন!

এদিকে আমেরিকার রাজ-নীতিতে একটা ওলট পালট হোয়ে গেল। আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দিলেন। উডরো উইলসন হোয়াইট হাউস্ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

র‍্যাডিক্যালরা এই যুদ্ধে; আমেরিকার যোগদান মোটেই সমর্থন

করলেন না। তাঁরা প্রকাশ্যে ইহার বিরোধীতা করলেন। তখন মার্কিন সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বহু ব্যক্তিকে জেলে আটক করা হয়। অনেককে পুলিশের হাতে নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করতে হোল।

সুতরাং এই সব র‍্যাডিক্যালদের পক্ষে আমেরিকায় বসে কাজ করা আর সম্ভব হোল না। তাঁরা অনেকে গোপনে দেশ ছেড়ে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হোলেন।

রায় মেক্সিকোতে এসে এই সব র‍্যাডিক্যালিষ্ট, সোসালিষ্ট, এনার্কিস্ট এবং নিহিলিস্টদের খুঁজে বার করলেন।

তাদের সঙ্গে রায়ের পরামর্শ হোল। তাঁরা বল্লেন,—কারাঞ্জা সরকারকে উৎখাত ও ধ্বংস করার জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে। কারাঞ্জা সরকার সত্যাই খুব বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত।

তখন রায় বললেন,—আমাদের কাজ হবে সমাজবাদী সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা। তাকে রক্ষা করা।

আমাদের ভুললে চলবেনা। একটা শোষণহীন, সুন্দর, সভ্য ও মুক্ত সমাজ বিশ্বের সর্বত্র গড়ে তোলাই মার্কসবাদের লক্ষ্য।

মেক্সিকোর উর্বর জমিতে নতুন ফসল ফলবে। বিশ্বের মেহনতি মানুষ এক হবে। শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে।

র‍্যাডিক্যাল লেমণ্ট বললেন,—কারাঞ্জা সরকার নিঃসন্দেহে সমাজবাদী, প্রগতিশীল এবং অগ্রগামী। সুতরাং তাকে সাহায্য দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য। কিন্তু বাধা অনেক।

রায় ভেবে দেখলেন। সময় অনুকুল। কিন্তু সত্যাই বাধা অনেক। দেশে কোন শক্তি-শালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল নেই। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ নয়।

এ ছাড়াও ধনী, জমিদার আর কায়েমী স্বার্থের দালালরা ও

বাইরের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কারাঞ্জা সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তাই বললেন,—সামনে বাধা অনেক ঠিকই। কিন্তু আমি এগিয়ে যেতে চাই। সাহস দরকার।

মেক্সিকোতে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের একটা সোসালিস্ট পার্টি ছিল। রায় তাদের খুঁজে বার করলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার এবং উকিল। বেশীর ভাগই শিক্ষিত। সেইজন্য তাদের বোঝাতে রায়ের বিশেষ অসুবিধা হোল না।

রায় তাদের বোঝালেন।

গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ছেলে-মেয়েকে রাজ-নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গৃহ-যুদ্ধ দমনে বেতন-ভুক সৈন্যদের দিয়ে কাজ হবে না। ভাল ফল পাওয়া যাবে না। কারণ তাদের উৎকোচে বশীভূত করা সহজ।

তাই, এই সব সমাজের মানুষ দরকার।

তারা পিপলস্ আর্মি গঠন করবে। কারাঞ্জার বেতনভুক সৈন্যদের সাহায্য দেবে। দেশের অভ্যন্তরে জন-মত গঠন করবে। বিদ্রোহ দমন করবে। তারাই হবে কারাঞ্জা সরকারের অগ্রগামী রক্ষীদল। তাহলে কায়েমী স্বার্থ মাথা তুলতে পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা চাই। সেজন্য একটা মূল্যবান গোপন পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছি। সময়ান্তরে আমি তা প্রকাশ করবো।

এই সব সমাজবাদী রাজনৈতিকদল; রায়ের পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং পরিধি দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হোলেন।

তাদের মধ্যে একজন বললেন।

কালই আপনাকে কারাঞ্জা সরকারের বে-সরকারী দৈনিক

মুখপত্রের সম্পাদকের কাছে আমরা নিয়ে যাব। তাঁকে আপনার এই পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিন। এই সম্পাদক জেনারেল কারাঞ্জার খুবই বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় ব্যক্তি।

আর একজন বললেন,—আমার বিশ্বাস আপনার যুক্তি ও পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সম্পাদক গ্রহণ করবেন।

তাছাড়া, এই পরিকল্পনা একবার গৃহীত হোলে, আপনার কাজ করার কোন অসুবিধা হবে না। আপনার পেছনে একটা বিপ্লবী সরকারের সমর্থন থাকবে। এটাই বড় কথা।

রায় আশ্বস্ত হোলেন।

পরদিনই প্রতিশ্রুতি মত তাঁরা রায়কে সেই সম্পাদকের দপ্তরে নিয়ে এলেন। সমাজবাদী দৈনিক পত্রিকা।

সম্পাদক অত্যন্ত ভদ্রতা ও সৌজন্যের সঙ্গে রায়কে গ্রহণ করলেন। গোপনে আলাপ হোল।

রায় বললেন,—আমি একজন সমাজবাদী এবং মার্কসবাদী ভারতীয় বিপ্লবী। মেক্সিকোর বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আমি একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছি। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

সম্পাদক সেই লিখিত পরিকল্পনাটি হাতে নিলেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেটা পড়লেন। তারপর দুঘণ্টা ব্যাপী সেই সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে গভীর আলাপ-আলোচনা হোল।

সম্পাদকের বুঝতে বিলম্ব হোল না। রায় একজন সত্যকার সমাজবাদী ও মার্কসবাদী বিপ্লবী। রায়ের বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা ভাবাবেগশূন্য যুক্তি সম্পাদককে রায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও সম্ভ্রমশীল করে তুললো।

সম্পাদক খুসী হোয়ে বললেন,—

আপনার বক্তব্য, পরিকল্পনা ও যুক্তি আমি শুনলাম। আমার

খুব ভাল লেগেছে। আমি কথা দিচ্ছি। শীঘ্রই জেনারেল কারাঞ্জার সঙ্গে আপনার একটা ইণ্টারভিউ এর ব্যবস্থা করে দেব। কারাঞ্জাও খুব খুশী হবেন,—আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

রায় অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে বাসায় ফিরলেন।

প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জার সহিত সাক্ষাৎ

১৯১৭ সন, জুলাই মাস।

বোধকরি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। কারাঞ্জার প্রাইভেট সেক্রেটারি রায়কে চিঠি লিখেছেন,—আপনার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

রায় ইণ্টারভিউ পত্র পেলেন। তিনি বড় খুসী। তারপর এল সেই নির্দিষ্ট দিন। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

সোজা দপ্তরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কারাঞ্জা আর মন্ত্রী মণ্ডলী উপস্থিত। সবাই উদগ্রীব। সবাই রায়ের সঙ্গে আলাপ করতে চান। ভারতীয় বিপ্লবীকে দেখতে চান।

অত্যন্ত সমাদার করে তাঁরা রায়কে অভ্যর্থনা করলেন। কোন কোন মন্ত্রী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গভীর আন্তরিকতা।

কারাঞ্জা এই তেজোদ্দীপ্ত নবাগতকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। মার্কস বাদী তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী। তাঁকে দেখে কারাঞ্জা আশ্চর্য হোলেন। তাঁর মনে হলো, ইনি যেন মনুষ্যত্বের এক সুন্দর বিকাশ মূর্তি। বয়স মাত্র ত্রিশ!

কারাঞ্জা বললেন, আপনার কথা আমরা শুনেছি। আমাদের সরকার সমাজবাদী। সেজন্ত আমাদের সামনে বহুবিধ সমস্যা। ঘরে বাহিরে আমাদের সমস্যা। সমস্যার অন্ত নেই।

রায় তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। অত্যন্ত সহজ ভাষায় সমাজবাদের ইতিহাস; আর তার প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলোচনা হোল। সব কথা তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

তারপর আলোচনা প্রসঙ্গে রায় বললেন,

মেক্সিকোতে কোন শক্তিশালী সোসালিষ্ট পার্টি নেই। অথচ দেশের সরকার সমাজবাদী। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত। এঁরা হোলেন জাতির মেরুদণ্ড। এদের নিয়ে সমাজ-তান্ত্রিক দল গড়তে হবে। অন্য পথ নেই।

গৃহ যুদ্ধ দমনে; এরাই হবেন আপনার হাতিয়ার। বেতন ভুক পুলিশ ও মিলিটারি। তাদের দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। কোন দেশে হয় নি। অর্থের দ্বারা এদের সহজে বশ করা যায়। তাই বিশ্বাস করা চলে না।

কারাঞ্জা নতুন কথা শুনলেন।

আমরা ত এ দিকটা ভাবিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন।

রায় হাসতে হাসতে বললেন,—আমি নই। কার্লমার্কসই সেকথা বলেছেন। সমাজের সব চেয়ে নীচুতলা থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে।

কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত।

এরা হবেন grass root of the organisation. এদের চাই। এঁরাই মূল শিকড়। এদের ওপর নির্ভর করতে হবে।

কারাঞ্জা আর তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলি। তাঁরা খুসী হোলেন। তাঁদের মনে আর কোন দ্বিধা নেই। কোন সংশয় রইলো না।

আপনার নীতি আমরা গ্রহণ করলাম।

সেদিন থেকে রায়ের সমাদর। তিনি হোলেন সরকারের সম্মানিত অতিথি। জেনারেল কারাঞ্জার নিকট বন্ধু। শেষদিন পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। কোন ফাটল ধরেনি সে বন্ধুত্বে।

আমেরিকার মনরো নীতি

মেক্সিকোতে এসে রায়ের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল।

মনরো নীতির নামে সে দেশের সর্বত্র আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতা চলছিল। সমগ্র লাটিন আমেরিকায় মার্কিন পুঁজিপতির আর্থিক একাধিপত্য।

মনরো নীতি সমাজ-বিরোধী। সভ্য-সমাজ ইহা মেনে নিতে পারে না। নীতির পরিবর্তন চাই।

কিন্তু আমেরিকা নির্লজ্জের মত মনরো নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউরোপের মানুষের; লাটিন আমেরিকায় ব্যবসা করার অধিকার নেই। একটা অবাস্তব কথা? হাস্যকর। তাই নয় কি?

মেক্সিকোতে এই নীতিই এতদিন চলে আসছিল। কোন প্রতিবাদ হয় নি। হয়ত অনন্তকাল চলতো।

কিন্তু আমেরিকার দুর্ভাগ্য। মেক্সিকোর মানুষ। সমাজবাদ গ্রহণ করলেন। নতুন সরকার গঠিত হোল। সমাজবাদী সরকার।

তাঁরা খনি ও বৃহৎ শিল্প জাতীয় করণ করলেন। পুঁজিবাদীর কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগলো। তারা ভেঙ্গে পড়লো।

আমেরিকা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা দেশে গৃহ বিবাদ বাধিয়ে দিলেন। সেই ষড়যন্ত্র চারিদিকে। অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। সমাজ-বিরোধীদল সব জায়গায়। তারা সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সমাজবাদী সরকারের আসন টলে উঠা স্বাভাবিক। সরকার চিন্তিত হোলেন। চোখে অন্ধকার দেখলেন।

তাই রায় ঠিক করলেন। মনরো নীতি রুখতে হবে। নতুবা সমাজবাদী সরকারের পতন অনিবার্য। তাকে বাঁচাতে হবে।

সর্বত্র প্রচার কার্য শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুজিবাদীদের ভয় দেখান হোল। দেশের সর্বত্র ধর্মঘট শুরু হবে। আর্থিক জীবন হবে অচল ও পঙ্গু। বিপ্লব শুরু হোল।

দেশের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের দল। সরকারের পিছনে এলেন। একজোটে সবাই রুখে দাঁড়ালেন।

আমেরিকা ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেলেন। মেক্সিকো রক্ষা পেলো।

কেন স্পেনিশ ভাষা শিখলাম?

অতুল ঘোষের কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডের বাড়ী। সকলে বসে গল্প হচ্ছে। এম, এন, রায়, অতুল ঘোষ, গোপালদাস মজুমদার ও আরও অনেক আছেন।

অতুল ঘোষ বললেন—নরেন, তুমি শুধু ইংরিজি জানতে। অপর কোন ভাষা জানতে না। আজ তুমি পলিগট্। বহু ভাষাবিদ। তাই খুব আনন্দ হয়।

এম, এন, রায় হাসতে হাসতে বললেন,—অতুল, সবই প্রয়োজনের তাগিদ। আমাকে বিদেশী ভাষা শিখতে হোল।

আমি মেক্সিকোতে এলাম। দেখলাম দেশের জনসাধারণ স্পেনিশ ভাষায় কথা বলে। সরকারী ও বে-সরকারী কাজ। সব কাজেই স্পেনিশ ভাষা।

অথচ পাশেই একটা বিরাট দেশ। সভ্য ও সমৃদ্ধ আমেরিকা; কিন্তু এ দেশের লোক ইংরাজী বলে না।

আমি ভেবে দেখলাম। জন সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে আমাকে কাজ করতে হবে। সুতরাং স্পেনিশ ভাষা আমাকে শিখতেই হবে। অন্য পথ নেই।

দাম্ভিক আমেরিকা। মেক্সিকোতে ইংরাজী ঢোকাতে পারেনি। মেক্সিকোর লোকদের কথা চিন্তা করলাম। তাদের একটা জাতীয় চরিত্র আছে।

মেক্সিকোতে স্পেনিশ ভাষা শিখবার একটা স্কুল ছিল। ভর্তি হলাম সেখানে। মাত্র তিন মাস পড়লাম। স্পেনিশ ভাষায় বেশ জ্ঞান হোল।

মেক্সিকো ষ্টেট লাইব্রেরী।

রোজ পড়তে যেতাম। ভাল ভাল বই। মেক্সিকোর জাতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান আর রাজ-নীতি। বহু বিষয়ের বই পড়বার সুযোগ পেলাম।

দিনে দশ বার ঘণ্টা পড়তাম। লাইব্রেরীতে সারাদিন কাটতো।

তারপর লিখতে আরম্ভ করলাম। সে দেশের সংবাদ পত্রে লিখতাম। লিখতাম সাপ্তাহিক পত্রিকায়। আমার লেখা নিয়মিত বেরুতে লাগলো। সবাই পড়তো। মনরো নীতির ওপর একখানা বই লিখলাম। সেই আমার প্রথম বই; স্পেনিশ ভাষায়। সব কাগজে সেই বইখানি রিভিউ করলো। সকলের উচ্চ প্রশংসা পেলাম। স্পেনিশ ভাষায় অনেক বই লিখেছি।

অতুল ঘোষ বললেন,—তাহলে সে দেশের সু-লেখক ও সাহিত্যিক বলে গণ্য হলে।

সে কথার জবাব না দিয়ে, রায় বললেন,—পরে জার্মান, রাশিয়ান, ও ফরাসী ভাষা শিখলাম। সে সব ভাষায় বহু বই লিখলাম। কিন্তু স্পেনিশ ভাষা আমার সবচেয়ে প্রিয়।

সবাই উৎসুক হয়ে রায়ের কথা শুনলেন। তাঁর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

কালের প্রভাব অতিক্রম করেছে সে সাহিত্য। বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গণে সে অনবদ্য অবদান। সাহিত্য রসিকের বিচারে অগ্রগণ্য।

মেক্সিকোতে সোসালিষ্ট পার্টি গঠন :

মেক্সিকো শহরের শেষ প্রান্ত। এক অপরিসর রাস্তা। সেখানে ছোট্ট একটা ঘর। সোসালিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস।

এম, এন, রায় এসেছেন।

পাঁচ সাত জন তরুণ সোসালিষ্ট। সেই অফিসে কাজ করছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন পুরান কর্মী। রায়কে তাঁরা চিনতেন

সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

রায় বললেন,—আপনাদের সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

তিনি এখুনি আসবেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

তার কিছুক্ষণ পরেই সেক্রেটারি এলেন।

রায়ের সঙ্গে সেক্রেটারির পরিচয় হোল। তিনি রায়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর আগ্রহের সঙ্গে বললেন,—

আপনি কমরেড এম, এন, রায়? কালই আপনার কথা হচ্ছিল। আমি সব শুনেছি। বলুন আমি কি করতে পারি।

এম, এন, রায় হেসে বললেন,—এবার আমাদের কাজ আরম্ভ। কর্মীদের একটা তালিকা প্রস্তুত করুন। সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তুলুন। তারজন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা ও তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনুন। মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে। তবেই ত তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

আপনি ঠিকই বলেছেন।

তারপর এল সংগঠনের প্ল্যান ও প্রোগাম। দুজনে অনেকক্ষণ আলাপ হোল। রায় বললেন—এই ভাবে কাজ হবে।

এবার আরম্ভ হোল। রায়ের কার্যপরিক্রমা।

প্রতিটি শিল্প শহর। দূর দূর অঞ্চলের গ্রাম। সবার সঙ্গে রায় পরিচিত হোলেন। বললেন,—আমি তোমাদেরই লোক।

ছুটে এল গ্রামের মানুষ। কত কৌতূহল তাদের মনে। তারা নতুন কথা শুনতে চায়। শুনতে চায় বাধন হারার গান।

গ্রামের শান্ত পরিবেশ। রায় নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন।

গ্রামের চাষী ও ভূমিহীন কৃষক। সবাইকে সাদরে ডাকলেন। উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,—

লাঙল যার, জমি তার।

গ্রামের মানুষ। এমন কথা শোনেনি কোন দিন।

তারা আশ্বস্ত হোল। তারা বললে,—আপনি আমাদের নতুন কথা শোনালেন। নতুন জগতের সন্ধান দিলেন।

গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। নতুন উৎসাহ নিয়ে সবাই কাজে লেগে গেলেন।

শিল্প শহরগুলি রায় ঘুরলেন। গেলেন পুয়েবলা, ওয়াকসাকা, মন্‌টেরি। আরও কত শহরে।

সেইখানে শ্রমিকদের ডাকলেন। তাদের কানে নতুন মন্ত্র দিলেন,—রিক্ত যারা, সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।

তারপর মিল ও কারখানার মালিকদের হুমকি দিলেন।

মিল মালিক হুঁসিয়ার; শ্রমিকদল আছে তৈয়ার।

শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা।

রায় দেখলেন—ক্ষেত্র প্রস্তুত।

মেক্সিকোতে সোসালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মেক্সিকো বিশ্ববিত্তালয় প্রাঙ্গণ।

সেদিন ছাত্রদের এক বিরাট সভা বসেছে।

ভাইস-চ্যান্সেলার স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন।

মার্কসবাদী নেতা এম, এন, রায় উপস্থিত।

তিনি এই মহতী সভায় বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতায় বিষয় বস্তু,—মার্কসবাদের লক্ষ্য ও মন্‌রো নীতির প্রতিবাদ। ছাত্রদের উৎসাহ ও উত্তেজনার অন্ত নেই। হাজার হাজার তরুণ ছাত্র। তাঁরা সভা আলো করে বসেছেন। বিচিত্র শক্তির সমাবেশ।

এম, এন, রায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বিশুদ্ধ স্প্যেনিশ ভাষা। রায় সেই ভাষায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় কোন আবেগ ছিল না। ছিল যুক্তি।

রায় বললেন, মনরো নীতি সমাজ-বিরোধী। আর মার্কসবাদের

লক্ষ্য শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন এক সুন্দর ও সভ্য সমাজ গড়ে তোলা। সমাজবাদী কারাঞ্জা সরকার। সেই কাজে এগিয়ে চলেছেন। এই পথে জন-গণের মুক্তি আসবে।

ছাত্রেরা মন্ত্র মুগ্ধ। পরম ধৈর্য ও সহজ ঔদার্যের সঙ্গে সবাই সে বক্তৃতা শুনলেন।

জনমত গঠনের জন্য প্রচার দরকার। তাই এম, এন, রায় স্পেনিশ ভাষায় সোসালিজম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। সেগুলি বিভিন্ন শহরে বিলি হোল।

দূর দূরান্তের মানুষ।

সবাই পড়লো; সবাই জানলো; সবাই বুঝলো। বর্তমান সমস্যা কি। কোন পথে তার প্রতিকার।

রায়ের কণ্ঠ আশ্রয় করে মেক্সিকোর লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বঞ্চিতের দল শুনলো,—নতুন ভগবানের কথা।

অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক। হাজার হাজার কারখানার শ্রমিক। শত শত অফিস-আদালতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্মচারী। অগণিত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছুটে এল। জয় হবে, জয় হবে, হবে জয়।

সর্বত্র সীমাহীন উৎসাহ। প্রবল উদ্দীপনা। আর অফুরন্ত আনন্দ।

পুরাতনের পত্র পুট বিদীর্ণ করে নতুনের জয়গানে সবাই মুখরিত।

রায় দেখলেন,—সংগঠন ও সংহতি অভাবিত সাফল্যের পথে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত,—সময় উপযুক্ত।

এবার এম, এন, রায় নব-গঠিত সোসালিষ্ট পার্টির একটা সম্মেলন আহ্বানের জন্য বর্তমান কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করলেন,—একটা কন্‌ফারেন্স ডাকুন। তাঁরা সহজেই রাজী হোলেন। কন্‌ফারেন্স ডাকা হোল।

সমগ্র মেক্সিকোর দূর দুরান্তের শহর ও গ্রামাঞ্চল! সেখান থেকে শত শত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও হাজার হাজার দর্শক এসেছেন। সবাই সম্মেলনে যোগ দেবেন।

সর্বত্র একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গেল।

জেনারেল কারাঞ্জা আর তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলি এসেছেন। বিশিষ্ট সদস্যেরাও সেই সম্মেলনে উপস্থিত হোলেন। জেনারেল কারাঞ্জা সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

মেক্সিকোর হাজার হাজার মানুষ! সবাই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন। সভাপতির ঠিক পাশের আসনে বসে আছেন। বুদ্ধির আলোকে দীপ্তিমান মার্কসবাদী এক তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী। কমরেড এম, এন, রায়।

হাজার হাজার মানুষের উৎসুক দৃষ্টি! ডায়াসে উপবিষ্ট শুধু একটি মাত্র লোকের ওপর। শুব্ধ বিস্ময়ে, সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে, সবাই তাকিয়ে আছেন। তরুণ বিপ্লবীর মুখ থেকে নতুন কথা শুনবেন। নতুন পথের সন্ধান দেবেন।

সভাগৃহ নীরব ও নিস্তব্ধ। অদ্ভুত শান্ত ভাব ধারণ করেছে।

কয়েকজন মেক্সিকোর স্থানীয় নেতার বক্তৃতা হোল। এবার রায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সভায় উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক। তাঁরা শুনে অবাক হলেন। একজন বিদেশী মানুষ। বিশুদ্ধ স্পেনিশ ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর সেই ভাষা সুন্দর, সহজ এবং সরল। অনর্গল বক্তৃতা চললো দু ঘণ্টা ধরে। ভাষায় জড়তা নেই। কণ্ঠে বাধা নেই। ভাবে দ্বিধা নেই। যেন শ্রাবণের জলধারা। সবাই মন্ত্র-মুগ্ধ। অপূর্ব ও অভিনব সে ভাষণ।

সবাই আশ্চর্য হয়ে শুনলেন,—

সমাজবাদী সরকার না বাঁচলে, সমাজবাদ বাঁচতে পারে না।

সম্মেলন আশাতীত সাফল্য লাভ করলো।

নতুন সোসালিষ্ট পার্টি গঠিত হোল। পার্টির নামকরণ হোল,—সোসালিষ্ট পার্টি অব দি মেক্সিকো রিজিওন।

এবার নতুন নির্বাচন। কে এই নব-গঠিত সোসালিষ্ট পার্টির কর্ণধার হবেন? দেশের মধ্যে কে সেই যোগ্যতম ব্যক্তি?

সকলের মুখে শুধু একটি মাত্র নাম,—

কমরেড এম, এন, রায়।

মেক্সিকোর আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে, অসংখ্য মানুষের লক্ষ লক্ষ করতালি ও তুমুল হর্ষধ্বনীর ভেতর, জেনারেল কারাঞ্জা দীপ্তকণ্ঠে ও হাসিমুখে ঘোষণা করলেন,—

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি; কমরেড এম, এন, রায় সর্বসম্মতি ক্রমে মেক্সিকো সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হোলেন।

আবার করতালি।

পার্টির কর্মক্ষেত্র। মেক্সিকোর ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করলো। নিকটবর্তী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়লো। সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায়। কেউ বাদ নেই।

বৃটিশ হন্‌-ডুয়ার্স, গুয়েটামালা, কিউবা ও অন্যান্য শহর। সর্বত্র সোসালিষ্ট পার্টির শাখা অফিস খোলা হোল।

কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপিত হোল; মেক্সিকোর জনবহুল অঞ্চলে।

ল্যাটিন আমেরিকান লীগ। এই নামে একটা পৃথক সংস্থা গঠিত হোল। রায় এই কমিটিরও সেক্রেটারী নির্বাচিত হোলেন।

সভা শেষ হোল। জেনারেল কারাঞ্জা দাঁড়িয়ে উঠলেন। সাদরে রায়ের সঙ্গে আবেগের সহিত করমর্দন করলেন।

অপূর্ব সে দৃশ্য। মেক্সিকোর জনগণ অভিভূত হোলেন। সর্বত্র হর্ষধ্বনী আর আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

মেক্সিকোর জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো। হাসিমুখে রায় ঘরে ফিরলেন।

আজ তাঁর বড় আনন্দের দিন। আজ তাঁর ব্রত সাফল্যের পথে।

মেক্সিকোতে কাজ শুরু :

সেদিন রায় তাঁর দপ্তরে বসে আছেন। একখানা চিঠি হাতে এল। এসেছে পুয়েবলা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা থেকে। লিখেছেন ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

পুয়েবলা মেক্সিকোর একটা বড় শিল্প নগরী। বহু লোক সেখানে কাজ করেন।

সেক্রেটারী লিখছেন,—কমরেড রায়, আপনাকে শীঘ্র একবার পুয়েবলা আসতে হবে। আমাদের কারখানার মালিক। একজন আমেরিকার লোক। শ্রমিকদের বহুবিধ দুঃখ। কিন্তু মালিক নির্মম উদাসীন।

কারখানার আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। আলো বাতাস নেই। অন্ধকার ঘর। স্যাঁত সেঁতে মেঝে। টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। বাসের অযোগ্য।

সেই অবস্থায় মেয়ে পুরুষকে কাজ করতে হয়। দৈনিক বারো ঘণ্টা থেকে পনেরো ঘণ্টা কাজ।

কোন সাপ্তাহিক ছুটি নেই। কোন বিশ্রাম নেই। মজুরির হার অবিশ্বাস্যভাবে কম। শ্রমিকদের পশুর জীবন।

আমরা প্রতিকার চাই।

এই খবর পেলেন এম, এন, রায়। চিন্তিত হোলেন। তাই আর কাল বিলম্ব করলেন না। ছুটলেন পুয়েবলা।

সোসালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। কমরেড এম, এন, রায়। পুয়েবলা এসেছেন। তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে।

সংবাদটি শ্রমিক মহলে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই বাধন ছিড়ে বেরিয়ে এল।

চারিদিকে বিপুল উৎসাহ আর উত্তেজনা।

শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করেছে। সবাই বেরিয়ে এল দলে দলে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সবার মুখে এক কথা,—

সময় হয়েছে নিকট এবার, বাধন ছিড়িতে হবে।

কারখানার মালিক ভীত ও স্তম্ভিত।

কারখানার সামনে বিরাট মাঠ। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক। যেন উত্তাল জলতরঙ্গ। কে তার গতিরোধ করবে।

কমরেড রায় ভাষণ দিচ্ছেন। আর সেই বিরাট জন সমুদ্র মুগ্ধ মুগ্ধ। গিলছে তারা রায়ের কথাগুলো। কথা ত নয় যেন বুলেট।

শুধু একটা কারখানা নয়। পাশাপাশি কোন কারখানাই বাদ নেই। সবাই শুনছে। সে ভাষণ। সব হারাদের গান।

কমরেড রায় বলে চলেছেন।

ইতিহাস বলে, যুগ যুগ ধরে এই পুঁজিপতির দল তোমাদের শোষণ করে আসছে। তোমাদের শেষ রক্তবিন্দু নিঙড়ে নিচ্ছে।

তাই আজ তোমরা—নিঃস্ব, দরিদ্র, সর্বহারা ও বঞ্চিত। তোমাদের মানুষের অধিকার দেওয়া হয়নি। সমাজবাদ তোমাদের রক্ষা করবে।

সমাজবাদী কারাঞ্জা সরকারের পতাকা তলে দাঁড়াও।

অমনি চারিদিকে তুমুল হর্ষধ্বনী, আর করতালি।

কমরেড রায়ের কথায় আত্মীয়তার সুর। এমন কথা তারা শোনেনি কোনদিন। মনে হোল, আপন জন।

ইউনিয়নের সেক্রেটারি এলেন। তার সঙ্গে রায় আলাপ করলেন। সব কথা হোল।

বুঝলেন মেক্সিকো সরকারের অবস্থা। কোন শ্রমিক নীতি নেই। কোন পৃথক শ্রমিক দপ্তর নেই। নেই শ্রম-মন্ত্রী।

রায় কারাঞ্জার সঙ্গে দেখা করলেন। বোঝালেন তাঁকে।

পৃথক শ্রম দপ্তর আপনাকে খুলতে হবে। কারখানার আইন সংশোধন করুন। শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত করা দরকার। সমাজবাদী সরকারের নীতি, তবেই ত জয়যুক্ত হবে। শ্রমিক কল্যাণ সার্থক হবে।

কারাঞ্জা হেসে বললেন,—জন-প্রিয় সরকার আমিও চাই!

তাহলে এক কাজ করুন। ইংলণ্ডের অনুকরণে শপ ষ্টুয়ার্ড পদ সৃষ্টি করুন। শ্রমিকের কল্যাণ হবে।

মাত্র ১৯১৮ সালে ইংলণ্ড এই পথ নিয়েছে। শ্রমিক জগতে অভিনব ব্যবস্থা। কারখানার শান্তি ও শৃঙ্খলা, এতে ফিরে আসবে।

কারাঞ্জা নতুন কথা শুনলেন।

ক্যাবিনেটে এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

ক্যাবিনেট সদস্যেরা বললেন,—উত্তম প্রস্তাব।

পৃথক শ্রম-দপ্তর তাঁরা অনুমোদন করলেন।

আর সোসালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারিকে ভার দিলেন।

আপনি একজন যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বার করুন। তাঁকেই আমরা শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত করবো। আপনি সুপারিশ করবেন।

তাই হোল। রায় সোসালিষ্ট পার্টির অনুমোদন নিলেন। এক অভিজ্ঞ সদস্যকে শ্রম-মন্ত্রী করার জন্য সুপারিশ করলেন।

তিনি হোলেন। মেক্সিকোর প্রথম শ্রম-মন্ত্রী।

ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীরা খুব উৎসাহ বোধ করলেন।

১৯১৮ সাল। ঐতিহাসিক মে-দিবস।

মেক্সিকো ইংলণ্ডকে অনুকরণ করলো। এই দিন নিখিল মেক্সিকো ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হোল। রায় হোলেন কর্ণধার। শ্রমিক আনন্দে দিশেহারা।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। সবাই ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্য।

সর্বত্র সভা, শোভাযাত্রা আর বৈঠক। যেন মেক্সিকোর মরা গাঙ্গে বাণ ডেকেছে।

বিপুল উৎসাহ, উল্লাস ও উদ্দীপনা।

মেক্সিকোর কৃষক; তারাও পেছিয়ে নেই।

সবার মুখে এক কথা,—বাঁচতে হলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে।

কয়েক মাস পরের কথা।

ট্রেড-ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সভা ডাকা হয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকদের সভা।

এক প্রকাণ্ড লাল পতাকা। সভা আলো করে উড়ছে। সভাপতির আসনে কমরেড এম, এন, রায়।

মিটিং আরম্ভ হয়েছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারি; সভায় বক্তৃতা দেবেন। সবে শুরু করেছেন।

অমনি সভার শেষ প্রান্তের লোক, হৈ হৈ করে উঠলো। শুরু হোল, ইট ও পাথরের বৃষ্টি! আর মার মার শব্দ।

সবাই ছুটতে আরম্ভ করলো! কারো মাথা ফাটলো! কারও হাত ভাঙলো! কেউ আঘাত পেল! সভায় গণ্ডগোল! মারাত্মক উত্তেজনা। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা।

রায় ধীর, স্থির, গম্ভীর!

তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। এরা সমাজ-বিরোধী। এরা জাপাটার দলের লোক। মালিকের দালাল! পুজিপতি আমেরিকা; সভা পণ্ড করতে চায়।

এদের রুখতে হবে। রায় নির্ভয়ে ছুটলেন। ইট পাথরের বৃষ্টি তখনও চলছে! তার মধ্যে ছুটলেন! পেছনে অনুগামীর দল।

জাপাটার দল, বেগতিক দেখে ভয়ে পালাল। সভা আবার শান্ত হোল।

রায় ভাষণ দিলেন—একতাই বল।

তারপর উল্লসিত জনতা। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বলে উঠলো,—

কারাঞ্জা সরকার জিন্দাবাদ। কমরেড এম, এন, রায় জিন্দাবাদ।

ফেরারী আসামী রায়কে আমেরিকা অপহরণ করতে চায় :

আমেরিকা হতে একখানা চিঠি এসেছে। অতি পরিচিত হস্তাক্ষর। রায় তাড়াতাড়ি খামখানা ছিড়লেন। চিঠি লিখেছেন ধনগোপাল।

কলকাতা পুলিশের ডেন্‌হাম আমেরিকায় পৌছে গেছে! সবাই জেনেছে! আপনি একজন দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী। ফেরারী আসামী! তাই ষড়যন্ত্র চলছে! আপনাকে 'কিড্‌-ন্যাপ' করবে। ডেন্‌হাম শীঘ্র মেক্সিকোতে যাচ্ছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

চিঠি পড়ে রায় মনে মনে হাসলেন। তাঁর অভিধানে ভয় বলে কিছু নেই। তাই ভয় পেলেন না। তবে সতর্কতা অবলম্বনের কথা ভাবতে লাগলেন।

এদিকে আমেরিকা তলে তলে ষড়যন্ত্র করছেন। মেক্সিকোতে একটা বড় রকমের গৃহ-যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবেন।

একটা গরিলা সৈন্য দল। দেশের অভ্যন্তরে দানা বেধেছে। তাদের পেছনে আছে। আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্র। পুরো সমর্থন।

আমেরিকার পুলিশ খবর পেয়েছে। ফেরারী আসামী এম, এন, রায়; মেক্সিকো সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করছে। সুতরাং তাকে অপহরণ করা চাই।

সেই ষড়যন্ত্র চলছে।

দেশের আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। কারাঞ্জা সরকার ভয় পেলেন। সর্বত্র আমেরিকার গুপ্তচর। চারিদিকে পঞ্চম বাহিনী।

কারাঞ্জা রায়কে ডেকে পাঠালেন।

সব কথা শুনে রায় বললেন,—এতে ভয় পাবার কিছু নেই। দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত আজ সঙ্ঘবদ্ধ। দেশের ছাত্র ও তরুণ আমাদের সঙ্গে আছে।

বিরাট মিছিল ও জন সমাবেশ আহ্বান করেছি।

হাজার হাজার মানুষের সভা হবে। পুঁজিপতি, শিল্প-মালিক ও সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের দালালদের মুখোস খুলে দেবো। সেই ব্যবস্থা হচ্ছে।

মেক্সিকো, লিয়ো, ভিলা-হুরমোসা, পুরেবলা, ভেরাক্রুজ, সান্-ল্লাস। সর্বত্র সভা ডাকা হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা।

কারাঞ্জা সরকার বিস্মিত। তাঁরা দেখলেন। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষ। লাখে লাখে কারাঞ্জা সরকারের পেছনে। এক মন, এক প্রাণ।

সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি।

দেশের সর্বত্র রক্ষীদল গড়ে উঠেছে। এই রক্ষী দলে আছেন। কৃষক, শ্রমিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। সব দেশের মানুষ।

তাঁরা নতুন সংকল্প নিয়েছেন। রক্তের বদলে রক্ত।

আর সবার মুখে,—জয় হবে, জয় হবে, হবে জয়।

প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা রায়ের সংগঠন শক্তি দেখলেন। দেখলেন সমাজবাদের প্রতি রায়ের সীমাহীন নিষ্ঠা। বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হোলেন তিনি।

কারাঞ্জা বুঝলেন। আর ভয় নেই। মেঘ কেটে গেছে। প্রয়োজন হলে বিরাট ধর্মঘট হবে। জন জীবন হবে স্তব্ধ।

আমেরিকা বেগতিক দেখে কচ্ছপের মত ভিতরে মুখ লুকিয়ে ফেললেন।

কারাঞ্জা সরকারের নীতি জয়যুক্ত হোল।

কারাঞ্জা সরকারের বে-সরকারী উপদেষ্টা পদে এম, এন, রায় ঃ

১৯১৮ সালের জুন মাস। এক উজ্জ্বল প্রভাত। মেক্সিকো সরকার বসবাসের জন্য রায়কে একটা সুন্দর বাংলো দিয়েছেন। বাংলোর সামনে প্রশস্ত সবুজ লন। আর তার চারিপাশে ফুলের বাগান। বিভিন্ন রংয়ের মৌশুমি ফুল। চোখ জুড়িয়ে যায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান রায় যত্ন সহকারে শিখেছেন। বিভিন্ন ফুলের নতুন ধরণের কলম তৈরী করেন। নানাজাতীয় ফুল।

রায় আগে ঘোড়ায় চড়তেন। ভাল অভ্যাস ছিল। মেক্সিকো সরকার রায়কে একটি সুন্দর ঘোড়া উপহার দিয়েছেন। সাদা ঘোড়া। ওয়েলার জাতীয়। রায় প্রত্যহ সকালে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান। প্রাতঃ ভ্রমণ। বীরত্ব ব্যঞ্জক সে দৃশ্য।

সে দিন রায় প্রাতঃভ্রমণ করে সবে ফিরেছেন। ঘোড়াটিকে আদর করছেন। বাগান আলো করে ফুল ফুটে রয়েছে। তাই দেখছেন।

এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

রায় টেলিফোন কানে তুলে,—

হ্যালো, আমি রায় বলছি।

অপর দিক থেকে উত্তর এল,—

আমি জেঃ কারঞ্জার প্রাইভেট সেক্রেটারী। এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করছি।

বলুন

আজ বিকেলে কেবিনেটের একটা জরুরী মিটিং আছে। প্রেসি-ডেন্ট কারাঞ্জা আপনাকে গভর্ণমেন্টের বে-সরকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে চান। সেজন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন।

রায় খুসী হয়ে বললেন—আমার কোন আপত্তি নেই।

সারা মেক্সিকোতে এই নতুন খবরটি ছড়িয়ে পড়লো। সোসালিষ্ট

পার্টি'র সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে তিনি এতদিন সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা পাচ্ছিলেন। বে-সরকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়াতে সে সম্মান ও সমাদর আরও বৃদ্ধি পেল। সবার মুখে রায়ের নাম।

রায়ের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কাজের দায়িত্বও বেড়েছে।

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

বিরাট পার্টি অফিস। কত লোক সেখানে কাজ করে। কত টাইপিষ্ট। কত কেরানী।

দূর দূর অঞ্চল থেকে লোক আসছে।

নিত্য বহু অভিযোগ রায়কে শুনতে হচ্ছে। কত মেয়ে। কত পুরুষের ভীড়।

রায়ের দপ্তরে বিরাট টেবিল। তার ওপর তিনটে টেলিফোন। সুসজ্জিত অফিস।

রায়ের অফিস সেক্রেটারি গাম্বিয়া। সব সময় কর্মব্যস্ত। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কারও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

পাশের ঘরে পার্টি মিটিং হচ্ছে।

সারা মেক্সিকোর খবর রায়কে রাখতে হয়। সমগ্র জাতির কথা তাঁকে ভাবতে হয়। সাম্রাজ্যবাদীর বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেছে।

শোষণ মুক্ত, প্রগতিশীল সমাজবাদী রাষ্ট্র। মেক্সিকোতে প্রতিষ্ঠিত।

কমরেড রায় আজ নিশ্চিন্ত।

জ্ঞানই শক্তি :

(Knowledge is power)

দেরাদুনে রায়ের সহকর্মী বন্ধুরা প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হোতেন।

একদিন এমনি একটা ঘরোয়া বৈঠকে কার্ণিক, রাম সিংহ, বাজাজ, বিমল প্রসাদ, আরও অনেকে উপস্থিত।

কথা প্রসঙ্গে রামসিংহ বললেন,—আপনি ত মহা সাধক। জীবন ভোর জ্ঞান অর্জন করেই গেলেন। রাজ-নীতি করতে অত পড়াশুনার কি দরকার হয়?

এম, এন, রায় একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন,—এ প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করেছেন। আমি দেখলাম জ্ঞানই শক্তি। এ কথা প্লেটো অনেক দিন আগেই বলে গেছেন।

মেক্সিকোর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র। শক্ত হয়ে এখানে দাঁড়াতে হবে। আমাকে প্রভূত শক্তি অর্জন করতে হবে। সে শক্তি হোল জ্ঞান।

আর জ্ঞান-অর্জন। এই ব্যাপারে একজন আমার জীবনে সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি ফরাসী শিল্পী ও দার্শনিক লিয়োঁনাডো দ্য ভিঞ্চি। সবাই অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন।

শিল্প-জগতে লিয়োঁনাডো নিঃসন্দেহে আদর্শশিল্পী। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য যে কত সুগভির। কত অতল স্পর্শী। সে সংবাদ অনেকেরই জানা নেই।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস মন্থন করে; তিনি সাধনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন সত্যই মহা সাধক।

তিনি ছিলেন একাধারে সব। চিত্রকর, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি বিদ্যা বিশারদ, পদার্থ বিদ্যাবিদ, জীবতত্ত্ববিদ, আরও কত।

তাঁর ছিল আশ্চর্য প্রতিভা। ছবি আঁকতে গেলেন। ছবি আঁকতে বসে দেখলেন। জ্যামিতির পুরো জ্ঞান থাকা চাই। নইলে ছবি আঁকা যাবে না। অমনি জ্যামিতি নিয়ে পড়তে বসলেন। আবার জ্যামিতি পড়তে গিয়ে দেখলেন। জ্যামিতির ভিত্তি হোল অঙ্ক। তাই ছাত্র হিসেবে গোড়া থেকে অঙ্ক শিখতে বসলেন। আশ্চর্য। তাই না?

সত্যিই এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হয় যেন গল্প শুনছি।

আরো শুনুন; লিয়োঁনার্ডোর একবার ইচ্ছা হোল মানুষের মূর্তি গড়বেন। ভাস্কর হবার তাঁর খুব ইচ্ছা। কিন্তু খুবই অসুবিধায় পড়লেন। মানুষের দেহে অসংখ্য শিরা ও উপশিরা। সে গুলো ঠিক মত গড়বেন কি করে? তাঁর ত 'এনাটমি' জানা নেই। অমনি বসে গেলেন 'এনাটমির' চর্চ্চা করতো।

মানুষের দেহের হাত পা মুখ সব গড়লেন। এবার চোখ; চোখ গড়বেন কি ভাবে। চোখের গঠন যে অত্যন্ত জটিল। সুতরাং চোখ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা চাই।

ছুটলেন মেডিকেল কলেজের চোখের অধ্যাপকের কাছে। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিলেন।

রায় বলেই চলেছেন,—শুধু শেখা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে; তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাই আজ তিনি আদর্শ শিল্পী।

তিনি মহা সাধক। আমি মনে মনে তাঁকে গুরুর পদে বরণ করলাম। ঠিক করলাম। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে আমাকে শক্তি অর্জন করতে হবে। তাই লিয়োঁনার্ডো দ্য ভিঞ্চির মত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে হবে।

আমি ত তখন কম্যুনিষ্ট। বিপুল বিশ্বে আছে অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার। যদি মন্থন করতে না পারি, তাহলে আমি কিসের কম্যুনিষ্ট?

তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। রেনেসাঁ যুগের ঋষিদের মুখগুলো।

আমি দেখতে পেলাম। দান্তে, পেটরার্চ, বোকাসিও, লিয়োঁনার্ডো, রাফেল, গালিলিও, আরও আরও কত মুখ। ভারতীয় ঋষিরাও বাদ গেলেন না।

বন্ধুরা অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলেন। সত্যই সে এক অনবদ্য কাহিনী। কারো মুখে কথা নেই।

একটু চুপ করে থেকে রায় বললেন,—এঁদের জীবন দর্শন ও পুস্তক সমুহ পড়লাম। এঁদের পরে বলা হোত মানববাদী।

একদিন লাইব্রেরীতে একখানা মূল্যবান পুস্তকের সন্ধান পেলাম। বইখানি লিখেছেন; ইটালির অন্তর্গত নেপলস্ শহরের রোমান-ল অধ্যাপক ভিকো। তাঁর বইখানার নাম,—Principles of New Science.

আশ্চর্য বই। আমি ক্ষুধার্ত মানুষের মত বইখানা গিলতে লাগলাম।

তখন মাথায় ঢুকেছে; পড়ার নেশা। রজার বেকন আর আলবার্টাস ম্যাগনাস। তাঁদের বই গুলো। খুঁজে বার করলাম।

হাতে এল; আরব দেশের চিন্তাশীল লেখক ও দার্শনিক এভেরোর সুবিখ্যাত পুস্তক,—মানুষের মুক্তি।

এক বন্ধু সংগ্রহ করে দিলেন। মনীষী ইবন্ খাল্‌তুনের পৃথিবীর ইতিহাস। ইবন খালতুন আরব দেশের লোক।

তাছাড়া কত বই পড়লাম; জ্ঞান-বিজ্ঞানের।

ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বোটানি, বায়োলজি, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র। কিছুই বাদ দিই নি।

কিসের নেশায় আমাকে পাগল করে তুলেছিল। বুঝলাম, জ্ঞান অনন্ত।

আজ আমি বেশ বুঝেছি। Man is the maker of the social world. মানুষই এই সামাজিক পৃথিবী গড়েছে।

আজ আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কোন দ্বিধা নেই। এক মানুষই সর্ব মানুষ। এক জাতিই সর্ব জাতি। এই বোধ প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা পেয়েছি।

আইনষ্টাইন একদিন আমাকে বলেছিলেন,—আদর্শ মানুষ সর্ব-বন্ধন, সর্ব-উপাধী মুক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমি ভুলিনি। Man never progress from error to truth, but from truth to truth.

ভল্‌টিয়ার ভারী সুন্দর একটা কথা বলেছেন,—Enlightened common sense could solve all problems.

তাই ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক-সনে, দেশ-দেশান্তরে।

কার্ণিক এতক্ষণ চুপকরে শুনছিলেন। রায়ের কথা। এবার বল্লেন,—এখন বুঝলাম, জ্ঞানই শক্তি।

বলশেভিক রাশিয়া

১৯১৭ সাল।

রাশিয়ায় জারতন্ত্র খতম হয়েছে। সেই সুযোগে কেরেনস্কি অস্থায়ী সরকার গঠন করেছেন।

বলশেভিকদের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়েছে। ট্রট্‌স্কি বন্দী হয়েছেন। প্রাভদা কাগজ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লেনিন পালিয়েছেন। জিনোভিফ্ লুকিয়ে পড়েছেন। সর্বত্র অন্ধকার।

দেশের খুব দুর্দিন। কেরেনস্কি মাত্র তিন মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তার মধ্যে এত কাণ্ড!

শেষপর্যন্ত লেনিনের হাতেই তাঁর পরাজয় ঘটলো। প্রাণভয়ে তিনি পালালেন। রাশিয়া ছেড়ে নিরুদ্দেশ হোলেন। কোথায় গেলেন। কেউ জানে না।

বহুদিন তাঁর খবর নেই। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল। কেরেনস্কী ৮৯ বছর বয়সে নিউ-ইয়র্কে মারা গেলেন। মাত্র সেদিন। তারিখটা ছিল ১১ই জুন ১৯৭০ সাল। যাক সে কথা। এবার লেনিন।

লেনিন ক্ষমতায় ফিরে এলেন। দেখলেন তাঁর ঘরে বাইরে শত্রু। ঘরে শ্বেত রাশিয়ান। বাইরে সাম্রাজ্যবাদী। কোথায় যাবেন?

লেনিনের সঙ্গে সবাই কুট-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

রাশিয়া এক ঘরে। সকলে বয়কট করেছে। এমন করি বেশ কটা মাস কেটে গেল।

আমেরিকা ব্যবসায়ীর জাতি। তাঁরা দেখলেন, সবাই রাশিয়াকে ত্যাগ করেছে। এই মহা-সুযোগ। রাশিয়ার বাজার অধিকার করা যাক। তাহলে, প্রচুর অর্থ ঘরে আসবে।

তাই আমেরিকা গোপনে ব্যবসা-সম্পর্ক গড়তে আগ্রহ দেখালেন। লেনিন সহজেই রাজী হোলেন।

সেটা ১৯১৮ সাল।

একটা ট্রেড-ডেলিগেশন রাশিয়া আমেরিকায় পাঠালেন। তাঁরা অত্যন্ত গোপনে সে দেশে যাত্রা করলেন।

বরোডিনকে এই ট্রেড-ডেলিগেশনের কর্তা করে পাঠান হোল।

তখন রাশিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শূন্য।

জারের ধনাগারে হীরে, মুক্ত, জহরৎ ও মূল্যবান বহু অলঙ্কার ছিল। বরোডিন সেগুলো সঙ্গে নিলেন। বৈদেশিক মুদ্রার কাজ করবে।

এক সুটকেশ ভর্তি সেই সব অলঙ্কার।

গোপনে আমেরিকায় এলেন। বরোডিনকে আমেরিকার পুলিশের কি রকম সন্দেহ হোল। তারা জাহাজ ঘাটে তাঁকে গ্রেপ্তার রলো।

তিনি দেখলেন মহা বিপদ।

হীরে, মুক্তো, জহরৎ ভরা সুটকেশ। পুলিশের হাতে পড়লে সর্বনাশ! সব যাবে। তিনি সর্বস্বান্ত হবেন। পুলিশকে বিশ্বাস নেই। তাহলে উপায়?

পাশেই এক সহ-যাত্রী ছিলেন। পুলিশ ধরবার আগে। তাড়াতাড়ি সুটকেশটি তার হাতে তুলে দিলেন।

বললেন,—আপনি দয়াকরে এই স্যুটকেশটি আপনার কাছে রাখুন। আমি এখনই আসছি।

এই বলে বরোডিন পুলিশের সঙ্গে চলে গেলেন। অপরিচিত ভদ্রলোক। তিনি দেখলেন ভারী মজা। স্যুটকেশটি নিয়ে নিজের পথ দেখলেন। অজ্ঞাত কুলশীল। কে চেনে।

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ বরোডিনকে ছেড়ে দিল। তিনি তাড়াতাড়ি স্যুটকেশের উদ্দেশ্যে ছুটে এলেন। ততক্ষণে ভদ্রলোক উধাও।

বরোডিনের মনের অবস্থা তখন পাগলের মত। চারিদিকে ছুটোছুটি করলেন। না পেলেন স্যুটকেশ। না পেলেন সেই লোকটির দেখা। ছুটোছুটিই সার হোল। চোখে অন্ধকার দেখলেন।

বরোডিন কপর্দক শূন্য। একেবারে নিরুপায়, নিঃসম্বল। কোথায় যাবেন? অনেক চিন্তা করলেন। আশার ক্ষীণ আলো চোখে পড়লো। তাইতো! পাশেই সোসালিষ্ট দেশ মেক্সিকো। ঠিক করলেন, মেক্সিকোতে যাবেন। তাহলে হয়ত একটা ব্যবস্থা হবে। তাই গেলেন।

মেক্সিকোর রাজপথ! একা দাঁড়িয়েছেন।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পথে আলাপ হোল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সোসালিষ্ট পার্টির সদস্য।

বরোডিন তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেন।

তিনি সব শুনে বললেন,—আপনি এক কাজ করুন। আমাদের পার্টির সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করুন।

বরোডিন অকূল পাথারে—কূলের সন্ধান পেলেন।

সেই ভদ্রলোকটি বরোডিনকে সোসালিষ্ট পার্টির সদর দপ্তরে নিয়ে এলেন।

তখন মেক্সিকো সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল কমরেড এম, এন, রায়।

১৯১৮ সালের এক স্মরণীয় দিন।

এম, এন, রায় তাঁর সদর দপ্তরে বসে কাজ করছেন।

এমন সময় একটা ছোট কাগজ নিয়ে পোর্টার রায়ের সামনে হাজির।

তাতে লেখা—বরোডিন।

রায় অবাক! বরোডিন? আশ্চর্য!

তখনই পোর্টারকে হুকুম করলেন।

সসম্মানে বরোডিনকে নিয়ে এস।

বরোডিনের মুখে রায় সব শুনলেন। শুনলেন, ট্রেড-ডেলিগেশনের ইতিহাস। রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা। বুঝলেন বরোডিন অর্থাভাবে খুব বিপদে পড়েছেন। তাঁর সাহায্য চান।

দুই বিপ্লবীতে আলাপ হোল।

বরোডিন বললেন, কমরেড রায়, আমি সত্যিই খুব বিপদে পড়েছি।

তারজন্য ভাবনা কি! আমি আজই প্রয়োজনীয় ডলারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি ডেলিগেশানের সভ্যদের নিয়ে আসুন।

আর মেক্সিকোর পুলিশ কমিশনারকে সংবাদ দিচ্ছি। পুলিশ সেই হারান সুটকেশ নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তারপর পার্টির এক বিশেষ সদস্যকে ডাকলেন।

কমরেড বরোডিন আমাদের সম্মানিত অতিথি। আপনি এঁর জন্য একটা ভাল হোটেল ঠিক করে দিন।

কমরেড বরোডিন। রাশিয়ার বিখ্যাত লোক। লেনিনের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র।

বরোডিন রায়ের কাণ্ড দেখলেন। গভীর ভাবে রায়কে বিচার করলেন। লক্ষ্য করলেন তাঁর গতিবিধি।

ভারী অবাক লাগলো। একজন ভারতীয় বিপ্লবী। সমগ্র মেক্সিকোবাসীর হৃদয় জয় করেছেন। আশ্চর্য!

মেক্সিকোর সোসালিষ্ট পার্টির গোড়ার ইতিহাস শুনলেন। বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। সবার মুখে এক কথা।

এক ছোট্ট অবহেলিত রাজনৈতিক দল। আজ দেশের শীর্ষে উন্নীত। এ সবই সম্ভব হয়েছে। এক মাত্র কমরেড এম, এন, রায়ের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অভূতপূর্ব উদ্যমে।

সত্যিই আশ্চর্য। তাই না?

মেক্সিকো সোসালিষ্ট পার্টির জাতীয় কনফারেন্স

১৯১৯ সাল।

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল। এবার সোসালিষ্ট পার্টির বার্ষিক অধিবেশন। মহাসমারোহে পালিত হবে।

প্রথম জাতীয় কনফারেন্স। সভাপতির পদে কমরেড এম, এন, রায়। আর নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আছেন, জেনারেল কারাঞ্জা তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী, ও সদস্যবৃন্দ। এ ছাড়াও এক হাজারের ওপর ডেলিগেট। তারা এসেছেন মেক্সিকোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। ল্যাটিন আমেরিকা থেকেও এসেছেন অনেকে। কয়েক হাজার দর্শক।

সভার কাজ আরম্ভ হয়েছে। জেনারেল কারাঞ্জা বসেছেন। রায়ের ঠিক ডান পাশের চেয়ারটিতে। মাঝে মাঝে দুজনে আলাপ হচ্ছে। ফিস ফিস করে কথা বলছেন। আর দুজনেই হাসছেন। দিলখোলা হাসি।

বরোডিন সেই সভায় নিমন্ত্রিত। তিনিও এসেছেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছেন; জেঃ কারাঞ্জা আর রায়ের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা কত সুগভীর। যেন একবৃন্তে দুটি ফুল।

বরোডিন দেখে অবাক হোলেন। সত্যিই অবাক কাণ্ড!

সেই কনফারেন্সে কত প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা হোল। কত নতুন নতুন প্রস্তাব গৃহীত হোল।

হাজার হাজার মন্ত্রমুগ্ধ ডেলিগেট আর দর্শক। অদ্ভুত যোগ্যতা আর অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সভার কাজ পরিচালিত হোল।

বৈদেশিক নীতি ও সমাজবাদের অপূর্ব বিশ্লেষণ করলেন। কমরেড এম, এন, রায় যেন বিপ্লব বহ্নি।

মুগ্ধ বরোডিন। সভার সমগ্র বিবরণ; খুটিনাটি সব তথ্য; সবই লিখলেন লেনিনকে।

বরোডিন লিখলেন।

এক আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে আলাপ হোল। তাঁর নাম কমরেড এম, এন, রায়। তিনি একজন ভারতীয় বিপ্লবী।

কারাঞ্জা সরকারের অকৃত্রিম বন্ধু। মেক্সিকো সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি। আমার বিপদের দিনের বন্ধু।

চিঠি পড়ে লেনিনও আশ্চর্য।

লেনিন লিখে পাঠালেন।

এই আশ্চর্য মানুষটিকে আমি একবার দেখতে চাই।

মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পার্টি :

সবাই রায়ের মুখ থেকে শুনতে চায়। মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট পার্টি কিভাবে গড়ে উঠলো। সে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

বোম্বাই 'ইণ্ডিপেনডেণ্ট ইণ্ডিয়া' অফিসে সবাই বসে গল্প হচ্ছে। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশীও আছেন। আছেন আরও অনেকে। এই সব কথাই হচ্ছিল।

গোপালন বললেন—রাশিয়ার বাইরে প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা। আর সে সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী একজন ভারতবাসী।

তাই আপনার মুখ থেকে আমাদের শুনতে ইচ্ছে করে।

কমরেড রায় চুপ করে থেকে বললেন।

তখন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বিরাট জার্মান শক্তি পরাজিত। কাইজারের উচ্চ শির ধুলায় লুণ্ঠিত।

ইংরেজ আর আমেরিকা বিজেতার আসনে। তাদের দম্ভ ও দর্পের শেষ নেই। সবাইকে চোখ রাঙাচ্ছে।

মেক্সিকো সরকার, সমাজবাদী। কোন বিদেশী রাষ্ট্র তার বন্ধু নেই। আমেরিকা তার শত্রু।

কারাঞ্জা সরকার খুবই বিব্রত বোধ করলেন।

তাদের ভয় হোল। হয়ত আমেরিকা আবার মনরো-নীতির নাম করে হামলা শুরু হবে।

একদিন বিকেলবেলা।

পার্টি অফিসে বসে আছি। হঠাৎ জেনারেল কারাঞ্জা এসে হাজির।

আশ্চর্য হলাম। কি ব্যাপার ?

কথা আছে।

তখন আমরা দুজনে বসলাম। অনেক গোপন পরামর্শ হোল। অনেক বিষয় আলাপ করলাম।

শেষে কারাঞ্জা হেসে বললেন।

আবার নতুন ভাবনা এল।

আমি উত্তর দিলাম।

আমিও এ বিষয়ে চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়! কমিউনিষ্ট রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিৎ।

বিরাট রাশিয়া। আজ বন্ধু হীন।

কোন বিদেশী রাষ্ট্র তার বন্ধু নেই। সবাই তার সঙ্গে কূট-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এই সুযোগ। আমাদের এগুতে হবে।

কারাঞ্জা চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

আপনি কি করতে চান ?

একটু চিন্তা করে আমি বললাম।

আপনি বরোডিনের মুখে শুনেছেন। মহান লেনিন চাইছেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। আমাদের সেই পথে যেতে হবে।

তাছাড়া আমাদের রাষ্ট্র সমাজবাদী। আমরা সহজেই রাশিয়ার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবো। সেটা সম্ভব হবে। যদি আমরা সোসালিষ্ট পার্টির নামটা বদলাই। সোসালিষ্ট পার্টিকে কমিউনিষ্ট পার্টি বলে ঘোষণা করতে হবে। গঠনতন্ত্র বদলাতে হবে।

প্রফুল্ল মুখে কারাঞ্জা বললেন,—ইহা কি সম্ভব ?

আমিও মনে মনে তাই চাই। উল্লসিত হয়ে জবাব দিলাম। কেন সম্ভব নয় ?

আপনি আমার প্রস্তাব কি সমর্থন করেন ? তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমার পূর্ণ-সমর্থন আছে।

জেনারেল কারাঞ্জার সমর্থন আদায় করলাম। মনটা হাল্কা হোল। পরদিনই সোসালিষ্ট পার্টির একটা মিটিং ছিল। এই প্রস্তাব সেখানে উত্থাপন করলাম। সবাই একবাক্যে রাজী।

তাঁদের সম্মতি নিলাম। সাধারণ সভা ডাকলাম। ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিলাম। পার্টির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হোল।

১৯১৯ সালের মে মাস। মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হোল। নাম দেওয়া হোল—কমিউনিষ্ট পার্টি অব মেক্সিকো।

রাশিয়ার বাইরে। এই সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি। আর সে গৌরব ও মর্যাদা মেক্সিকোর।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী হেসে বললেন,—একজন বিদেশীর পক্ষে এটা কম বড় শ্লাঘার ও গর্বের বিষয় নয়।

আপনি হোলেন মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল। কত বড় রাজকীয় সম্মান আপনার।

রায় চুপ করে থাকলেন। ব্যক্তিগত প্রশংসা তিনি এড়িয়ে চলতেন।

মহান লেনিন কর্তৃক কমরেড এম, এন, রায় আমন্ত্রিত

এদিকে আর এক ব্যাপার হোল।

মহান লেনিন রাশিয়ায় বসে খবর পেলেন। মেক্সিকোর জনগণ কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেছেন।

আর সেই পার্টি গঠনের মূলে আছেন। একজন ভারতীয়। কমরেড এম, এন, রায়।

লেনিন আনন্দিত। বরোডিনকে লিখলেন—সব খবর জানাও।

যা ভাবা যায়নি। তাই হোল।

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। হঠাৎ রায় একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিখানা বরোডিন লিখেছেন।

আশ্চর্য হলেন রায়। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে দেখলেন। চিঠিতে লেখা আছে।

কমরেড লেনিন আপনাকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শীঘ্রই কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। আপনি যোগ দিলে, তিনি সুখী হবেন।

তখন এম, এন, রায় খুব ব্যস্ত। মেক্সিকো ও ল্যাটিন আমেরিকায় ঘুরতে হচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

বিরাট কর্মসূচী। দিকে দিকে কাজ চলেছে। বিশ্রাম নেই! তখন মেক্সিকো ত্যাগ অসম্ভব। রায় নিরুপায়।

সেই দিনই লেনিনকে চিঠি দিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ সে ভাষা।

রায় লিখলেন,—

আপনার নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। আপনার সৌজন্যে আমি অভিভূত। যাবার খুবই ইচ্ছা। কিন্তু বর্তমানে পার্টির কাজে

অত্যন্ত ব্যস্ত। সুতরাং আমার পক্ষে এখনই যাওয়া সম্ভব নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। লেনিনের কাছ থেকে আবার চিঠি এল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে; আপনার যোগ দেওয়া খুব প্রয়োজন।

রাশিয়ার ভৌগলিক সীমানার অপর পারে ভারত। আপনি রাশিয়ায় আসুন।

এখান থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য দেওয়া সহজ হবে। সুদূর মেক্সিকো থেকে সহজ হবে না। আপনি সত্বর আসুন।

রায়ের এখানেই ব্যথা। লেনিন তাই ইচ্ছাকরে ব্যথার স্থানে হাত দিলেন। বুকে আগুন জ্বলছে। রায় বিশ্ব-পরিক্রমায় চলেছেন। লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা।

মহান লেনিনের দ্বিতীয় আহ্বান। রায় তা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

লেনিনের নিকট চিঠি গেল,—আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

এম, এন, রায় অত্যন্ত গোপনে প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার সঙ্গে দেখা করলেন।

এই দেখুন কমরেড লেনিনের চিঠি। তিনি আমাকে রাশিয়ায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

কারাঞ্জা লেনিনের চিঠিখানা ভাল করে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা বেরুল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—

খুব আনন্দের কথা। কিন্তু আমরা ত আপনাকে হারালাম।

কারাঞ্জার কথা শুনে, রায়ের চোখের কোণ ভিজে এল। কি আত্মীয়তার সুর।

কারাঞ্জা আবার বললেন।

মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে আপনাকে ছাড়তে রাজি হচ্ছি।

আপনি আমাদের দুর্দিনের বন্ধু। তাই ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। তবু আমরা সুখী। আপনার যাত্রাপথ সুখের হোক।

রায় নীরব। একটা কথা নেই তাঁর মুখে।

কারাঞ্জার ইচ্ছা। রায়কে একটা বিরাট বিদায় অভিনন্দন দেবেন। কিন্তু তা হোল না। তখনও আমেরিকা আর ইংলণ্ড চেষ্টা করছে। রায়কে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। চারিদিকে গুপ্তচর। মেক্সিকোর সর্বত্র। তারা ওত পেতে বসে আছে।

বিদায় অভিনন্দন হোল না বটে। কিন্তু রায়ের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা হোল।

কারাঞ্জা নিজের দায়িত্বে সব ঠিক করলেন। রায় হোলেন, প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। তাঁকে কূটনৈতিক পাশপোর্ট দেওয়া হোল।

তবু সতর্কতা ও গোপনীয়তা। দেওয়ালেরও কান আছে। যেন কোন দিক থেকে, কোন ক্ষতি না হয়।

বিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রের চোখে ধুলো দিতে হবে। তাই পাশপোর্টে নতুন নাম দেওয়া হোল। ভি, গার্সিয়া। এবার তাঁর বাবা ইংরেজ এবং মা মেক্সিকোর লোক।

ইংরেজ অথবা আমেরিকা। কেউ আর তাঁকে ভারতীয় বলে সন্দেহ করবে না।

ভি, গার্সিয়া প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার ব্যক্তিগত দূত। বিশেষ মিশনে বিদেশে চলেছেন।

তবু ভয়। পাছে বিপদ ঘটে।

জাহাজ ছাড়বার আর মাত্র পনেরো দিন বাকি। রায় কাজের অছিলায় মেক্সিকো শহর ছাড়লেন। সবাই ভাবলো; রায় টুরে বেরিয়েছেন।

কিন্তু সেটা যে অগস্ত যাত্রা, সেদিন কেউ তা ভাবেনি।

১৯১৯ সাল, ৩০ সে অক্টোবর।

মেক্সিকো বন্দর। ভেরাক্রুজ জাহাজ ছাড়বে। ছাড়বার কথা সকাল ন'টায়।

আর মাত্র দশ মিনিট বাকি! কিন্তু প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিগত দূত মিঃ গার্সিয়া এখনও এসে পৌছলেন না। বহু যাত্রী বুকে নিয়ে ভেরাক্রুজ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জাহাজের ভোঁ বেজে উঠলো। সিড়ি তোলা আরম্ভ হয় হয়।

এমন সময় গার্সিয়া ছুটতে ছুটতে এসে জাহাজে উঠলেন।

হাতে বিশেষ দূতের পাশপোর্ট। পুলিশ ও বন্দরের অফিসার। তাঁকে সসম্মানে রাস্তা করে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দিল।

সুদীর্ঘ ত্রিশ মাস। রায় মেক্সিকোতে ছিলেন।

আজ প্রিয় মেক্সিকোর তীর-ভূমি ছেড়ে যাবেন।

জাহাজের খোলা ডেক।

অদূরে মেক্সিকোর তীর। কত মানুষের ভীড়। রায় এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন! সেই দিকে। চোখ ফেরাতে পারছেন না।

প্রিয় মেক্সিকো, প্রিয় জনগণ।

চোখ দিয়ে দুফোটা জল গড়িয়ে পড়লো। টস্ টস্ করে। রুমাল দিয়ে মুছে ফেললেন।

কবির কথা মনে হোল।

এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান।

কত চিন্তা মনে আসছে।

সে দিনের অজ্ঞাত কুলশীল এক নগণ্য বিদেশী। মেক্সিকোর জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেলাম।

আজ ফিরে যাচ্ছি।

অসামান্য সাফল্য আর অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে।

বিদায় ! মেক্সিকো, বিদায় !!

কিউবার হাভানা বন্দর

তখনও বিপদ কাটেনি। চারিদিকে সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্র। সুতরাং ভয়ে ভয়ে চলতে হচ্ছে। কখন কি হয়।

পথিমধ্যে কিউবার হাভানা বন্দর। জাহাজ থামবে। হাভানা বড় বন্দর। মাল, রসদ ও যাত্রী ওঠা নামা করবে। কত দেশের মানুষ।

কিউবা তখন আমেরিকার তাঁবেদার। প্রটেক্টরেট রাষ্ট্র। ইংরেজ আর আমেরিকার গুপ্তচর ঘুরছে। পুলিশ টের পেলেই বিপদ। দুই রাষ্ট্রের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ঝুলছে। পুলিশ ওত পেতে বসে আছে। তবু রায়ের অবস্থা,—চিত্ত ভাবনা হীন।

এম, এন, রায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে চালান। মেক্সিকোতে দু'তিন বার অপহরণ করবার চেষ্টা করেছে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। সেই সব কথা। জাহাজে বসে ভাবছেন।

উজ্জ্বল দিবালোক। ভেরাক্রুজ ধীরে ধীরে হাভানা বন্দরে প্রবেশ করলো।

গার্সিয়া জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বন্দরের আশে পাশে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য। চারিদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য। গার্সিয়া এক দৃষ্টে, তাই চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। অপূর্ব !

আর কি যেন ভাবছিলেন।

হঠাৎ একটা অস্ফুট চাপা গুঞ্জনে ; তাঁর চমক ভাঙ্গলো। সবাই চাপা গলায় বলাবলি করছে। জাহাজ আর যাবে না।

বন্দরে লাগাতর ধর্মঘট। চমকে উঠলেন। ধর্মঘট ? তাইতো ? সারি সারি অসংখ্য জাহাজ দাঁড়িয়ে। কবে জাহাজ ছাড়বে ? তার

তো কোন স্থিরতা নেই। কেউ বলতে পারলো না। আগে তঃ লক্ষ্য করিনি। সর্বনাশ!

সব জাহাজ আটকে পড়েছে। চারিদিকে জোর পিকেটিং চলছে। অত্যন্ত শক্তিশালী ইউনিয়ন।

তাহলে? গার্সিয়া চিন্তিত হোলেন। আমেরিকান আর বৃটিশ পুলিশ। কোন রকমে সন্দেহ করলে হয়। তাহলে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার।

রায়ের উৎকণ্ঠা হোল। এ ভাবে হাভানায় বসে থাকা সম্ভব নয়। অনির্দিষ্ট কাল। তাঁকে রাশিয়া যেতে হবে। দেরী করা চলবে না।

অসম্ভব। ভাবতে বসলেন। মাথায় এক মতলব এল। লাটিন আমেরিকার ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী। সবাই তাঁর নাম জানে। কিউবার ইউনিয়নের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

তাই খুব গোপনে ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে একখানা চিঠি লিখলেন।

আমি এম, এন, রায়। কমরেড লেনিনের আমন্ত্রণে রাশিয়াতে যাচ্ছি। কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালে যোগ দেব। এখানে আটকে থাকলে; শ্রমিক স্বার্থে ক্ষতি হবে। অবিলম্বে ভেরাক্রুজ ছেড়ে দিতে হবে।

অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনতার সঙ্গে চিঠিখানি পাঠান হোল। এক অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাত দিয়ে চিঠি গেল। ইউনিয়নের সেক্রেটারি চিঠি পেয়ে অবাক। আরে! ভেরাক্রুজে কমরেড এম, এন, রায় আছেন? আশ্চর্য! সর্বত্র তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রমিকদের নিতান্ত আপনার জন। কমরেড রায়ের অসুবিধা হবে?

সঙ্গে সঙ্গে ভেরাক্রুজ থেকে পিকেট তুলে নেওয়া হোল।

আর ইউনিয়নের সেক্রেটারি ঘোষণা করলেন। যাত্রী বাহী

জাহাজ আটক করা তাঁদের নীতি নয়। তাই পিকেট তুলে নেওয়া হোল।

আসল কারণ অবশ্য কেউ জানলোনা।

পরদিন ভোরেই ভেরাক্রুজ বিজয় গর্বে; ধূম উদ্গীরণ করে ছুটলো। ঢেউ এর মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে মনের আনন্দে কিউবার হাভানা বন্দর ভেরাক্রুজ পরিত্যাগ করলো; এবার গন্তব্য পথে।

কমরেড রায় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ভেরাক্রুজ কত দেশ ঘুরলো। কত বিভিন্ন বন্দরে থামলো। ইউরোপের বিভিন্ন ঘাটে পাড়ি জমাল। কত বিভিন্ন মানুষের সমাগম হোল। এল স্পেন, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড। এল কত নতুন দেশ। নতুন মানুষ। নতুন ভাষা। নতুন আচার। নতুন চোখ জুড়ান প্রাকৃতিক দৃশ্য।

শেষে ঘুরে ঘুরে ভেরাক্রুজ এল জার্মানীতে।

এম, এন, রায় আশ্বস্ত হয়ে নামলেন। ঠিক করলেন। এ দেশে কিছুদিন থাকবেন।

কার্লমার্কসের প্রিয় জন্মভুমি জার্মানী! কিন্তু তিনি ত কাকেও চেনেন না। গেলেন বার্লিন।

বার্লিনে অনেক কমিউনিষ্ট আছেন।

এক হোটেলে দেখা হোল। কয়েক জন বিশিষ্ট কমুউনিষ্ট নেতার সঙ্গে।

প্রথমে যার সঙ্গে আলাপ হোল। তাঁর নাম কমরেড থেল-হাইমার। তারপর পরিচয় হোল কমরেড হেনরিক আর ব্রাণ্ডালারের সঙ্গে।

থেল-হাইমার বললেন।

কমরেড রায়; আমরা আপনার নাম শুনেছি। আপনি

মেক্সিকোতে ইতিহাস তৈরী করেছেন। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রায় হাসতে লাগলেন। সবার সঙ্গে আলাপ হোল। হোটেলে বসেই গল্প হচ্ছে।

কথায় কথায় মার্কসবাদের কথা উঠলো। কথা উঠলো সভ্য সমাজের।

রায় বললেন,—আমরা সবাই চাই; শোষণ মুক্ত এক সভ্য সমাজ। মার্কস সেই কথাই বলে গেছেন।

তারপর রায় মার্কসবাদ নিয়ে গভীর আলোচনা আরম্ভ করলেন।

রায়ের পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতা দেখে তাঁরা সবাই মুগ্ধ। এক তরুণ মার্কসবাদী। কি অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য। সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

ব্রাণ্ডলার বললেন।

কমরেড রায়, আমরা আপনাকে চাই। মার্কসীয় দর্শনে আপনার জ্ঞান দেখে আমরা অভিভূত। আপনি জার্মানীতে থাকুন। কার্ল মার্কসের জন্মভূমিতে কাজ শুরু করুন।

রায় সহাস্যবদনে তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন,—মস্কো থেকে ঘুরে নিশ্চয়ই এখানে আসবো। জার্মানীর সমাজ-জীবন আমাকে মুগ্ধ করেছে।

রায় জার্মানীর বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ালেন। গেলেন লীপজিগ, কোলন, হামবুর্গ, ডুসেলডর্ফ, বন। আরও কত শহর।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

একজন ছাত্র বললেন।

কমরেড রায়, আপনি মার্কসবাদের ওপর; একটা সেমিনার খুলুন। বহু ছাত্র জানতে চায়, শুনতে চায়, আপনার মুখ থেকে মার্কসবাদ।

বেশ, সে ব্যবস্থা পরে হবে। বর্তমানে আমি লেনিনের আমন্ত্রণে মস্কো চলেছি। ফিরে আসি। ইচ্ছা আছে। মার্কসের দর্শন আমি জার্মানীতে প্রচার করবো। সেমিনার খুলবো।

এই ভাবে কিছুদিন রায় জার্মানীতে কাটালেন। তারপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ ছাড়লো। রায় রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

অল্প কয়েক দিনের পরিচয়। এর মধ্যে জার্মানীর সঙ্গে রায়ের মিষ্ট-মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

রায় জাহাজে বসে চিন্তা করলেন।—জার্মানীর সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টির কোথায় যেন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তা না হলে, জার্মানী আমাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করলো কেন? সর্বত্র আত্মীয়তার সুর।

মহান লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস। পেট্রোগ্রাদ বন্দর। রায়ের জাহাজ এসে থামলো। রায় নির্ভাবনায় নামলেন। আর কোন ভয় নেই।

এবার ট্রেনে করে মস্কো।

বিরাট লৌহশকট। বহু সংখ্যক যাত্রী বহন করে চলেছে।

যথা সময়ে গন্তব্য স্থলে সবাই পৌঁছে গেলেন।

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর। এই মস্কো। সুখ দুঃখের মালা গাঁথা এই শহর।

সেদিন কন কনে শীত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। অনবরত গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ছে। বরফে চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। যেন বিধবার বেশ। শুধু বরফ, বরফ, আর বরফ। এই বরফের ভয়ে একদিন নেপো-

লিয়ানকে পালাতে হয়েছিল। মস্কোর দরজা থেকে। লক্ষ লোকের বলি হয়েছিল। এই বরফ সমুদ্রে।

একটা বন্ধ মোটর। রায় তাতে চেপে বসলেন। মোটরে এলেন ; ক্রেমলিন্ প্রাসাদ।

তারিখটা ছিল ২৫শে ডিসেম্বর ১৯১৯ সাল।

ক্রেমলিন প্রাসাদে কর্মব্যস্ত লেনিন। কথা বলার সময় নেই। জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা।

টাওয়ারের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো।

কমরেড রায়। নিজের নাম লেখা কার্ড। দ্বার রক্ষীর হাতে দিলেন।

এই সেই ক্রেমলিন প্রাসাদ। বিশ্ব বিশ্রুত, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জারের ক্রেমলিন।

আজ সেই প্রাসাদের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। এক তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী।

দেখা হবে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানুষ ; পৃথিবীর সর্বহারা বঞ্চিতের অকৃত্রিম বন্ধু ; মানবের মুক্তিদাতা ; মহান লেনিনের সঙ্গে।

ভাবতেও কেমন হয় ! তাই না ?

দুরু দুরু বুক। শঙ্কিত পদ। সর্বদেহে রোমাঞ্চকর এক অদ্ভুত অনুভূতি !

রায় প্রতীক্ষা করছেন।

কিসের এক অনির্বচনীয় আনন্দ। সর্বশরীরে রোমাঞ্চ এনেছে। এক পুলক শিহরণ।

কিন্তু ভাবের আবেগে রায় কোনদিন চঞ্চল হন না। তাই কার্ড পাঠিয়ে ; নীরবে অপেক্ষা করলেন। ডাকের প্রতীক্ষায়।

অল্প কয়েক মিনিট পর। রক্ষী ক্ষিপ্রপদে ছুটে এলেন। পথ দেখিয়ে লেনিনের অফিসে রায়কে সসম্মানে নিয়ে গেলেন।

রাশিয়ার সর্বময় কর্তা। মহান লেনিন।

তাঁর সঙ্গে দেখা হোল। ভারতীয় বিপ্লবী। কমরেড এম, এন, রায়ের।

সাগর এসে মহা সাগরে মিশলো।

লেনিন অবাক বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে কর মর্দন করলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন।

আপনি কমরেড এম, এন, রায় ?

লেনিনের প্রশ্নের উত্তরে ; রায় মাথা ঈষৎ নামিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে বললেন।

আমি এম, এন, রায়।

তখনও লেনিন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মৃদু মৃদু হাসছেন। আর বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

তখন রায়ের বয়স মাত্র বত্রিশ বছর।

এক অতি অল্প বয়সী তরুণ বিপ্লবী। মেক্সিকোতে প্লাবন সৃষ্টি করে এসেছেন। মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল। আশ্চর্য !

লেনিন বিস্মিত হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন ? সে কথা একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

তোমাকে দেখে, আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলাম। কেন জান ?

আমি ভেবেছিলাম। দেখবো প্রাচ্যের এক প্রাচীন পক্ক কেশ, পক্ক শশ্রু বৃদ্ধকে।

কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলাম।

বুদ্ধিদ্দীপ্ত, প্রতিভাবান এক সুন্দর তরুণকে।

আজ দেখছি বয়োবৃদ্ধ না হলেও ; একজন জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

মহামতি লেনিনের সঙ্গে কমরেড রায়ের ঘনিষ্ঠতা ঃ

কমরেড এম, এন, রায়। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সম্মানিত অতিথি। সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

শহরের শেষ প্রান্তে। এক মনোরম দাচা। সেখানে রায়ের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলোকে রাশিয়ায় দাচা বলে।

প্রত্যেক দাচা সংলগ্ন ফল ও ফুলের বাগান। নানা জাতের। নানা রঙের ফুল। নানা রকম ফল। চেরী, পীচ, আরকট। অত্যন্ত লোভনীয়। লতার পাতায় ফুলে-ফলে ঘেরা দাচা। কোকিল শিষ দিচ্ছে। পাপীয়া গান গাইছে। ডালে ডালে ফুল ফুটে আছে।

এক শান্ত, সুন্দর, নির্জন পরিবেশ।

লেনিনের অবসর কোথায়? তবু মাঝে মাঝে রায়কে ডেকে পাঠান।

মার্কসবাদকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন লেনিন। মার্কসের চিন্তা-ধারা। লেনিনের হাতে রূপায়িত হয়েছে কমিউনিজমে। মার্কস ও লেনিন। দুই মহা মানব। বিশ্বত্রাতা।

লেনিন দেখলেন।

মার্কসবাদ সম্পর্কে রায়ের পড়াশুনা গভীর। তাছাড়া বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার মন্থন করে; তিনি অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করেছেন।

রায়ের সঙ্গে আলাপ করে লেনিন মুগ্ধ। উভয়ের অন্তরঙ্গতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল।

লেনিন বয়সে রায়ের চেয়ে সাতাশ বছরের বড়। রায়ের প্রতি তাঁর একটা সহজাত প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটা মোটেই বিচিত্র ছিল না। স্বাভাবিক।

ম্যাডাম ক্রুপস্কায়া। লেনিনের স্ত্রী।

তিনিও রায়কে স্নেহ করতেন।

চায়ের টেবিলে। তাঁদের কত গল্প হোত। ভারতীয় আচার, বিচার ও কুসংস্কার নিয়ে। হাস্য, পরিহাস আর রসিকতা চলতো।

একদিন হাসতে হাসতে ক্রুপস্‌কায়া বললেন।

রায়, তুমি ত দেশে গেলেই একঘরে হবে।

রায় আশ্চর্য হয়ে বললেন,—কেন?

ম্যাডাম ক্রুপসকায়া বাইরে গাম্ভীর্যের ভাণ করে বললেন। কেন? কেন আবার কি? কালাপানি পার হোলে; তোমাদের জাতি যায় না? তার ওপর তুমি ভটচাজ বামুন। তোমাকে মাথা নেড়া করে; পুরুত ডেকে; প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার ওপর এমন একটি বস্তু খেতে হবে; যা খাদ্য নয়।

লেনিন হো হো করে হেসে উঠলেন।

এমনি করে হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে তাঁদের অন্তরঙ্গতা বেড়েই চলেছিল। কোনদিন ক্ষুন্ন হয়নি।

একদিন লেনিন বললেন।

দেখ রায়, এবার দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে; একটা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের সামনে একটা গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে; কি ভাবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করবো। সেটাই সমস্যা।

আমি একটা থিসিস্‌ লিখেছি। এটা পড়ে দেখো। আর তুমিও এ সম্বন্ধে একটা থিসিস্ লেখো।

এম, এন, রায় খুব সন্তুষ্ট হোলেন।

উত্তম প্রস্তাব। আমি এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করি। পরে আপনাকে জানাব।

রায় গভীর ভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন।

হ্যাঁ, ইতিমধ্যে রায় রুশ ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হবে। পেট্রোগ্রাদে। জুলাই মাসে। এখনও একমাস বাকি।

রায় প্রস্তুত হচ্ছেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস :

পেট্রোগ্রাদে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বসবে। সমগ্র রাশিয়ায় সাড়া পড়ে গিয়েছে। সুদূর সাইবেরিয়ার দুর্গম প্রান্ত থেকেও ডেলিগেট আসছেন। উরাল পর্বতমালার লোকেরাও বাদ নেই।

সর্বত্র প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ।

অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছে।

১৯২০ সালের ২০শে জুলাই। নির্ধারিত দিনে; এক হাজার ডেলিগেট উপস্থিত। দর্শকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

বিরাট হল। প্রকাণ্ড ডায়াস। ডায়াসের প্রথম শ্রেণীতে বসে আছেন। রাশিয়ার সকল প্রখ্যাত নেতা। ট্রটস্কি, ষ্টালিন, বুখারিণ, মলোটভ, ম্যালেনকভ, জিনোভিফ, কালিনিন, কাগানোভিচ আরও সব নেতারা। লেনিন সভাপতি।

এইসব প্রধান নেতাদের সঙ্গে বসে আছেন। প্রথম সারিতে। কমরেড এম, এন, রায়। এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ। বয়স মাত্র বত্রিশ বছর। সুঠাম, সুন্দর চেহারা।

কলোনিয়াল কমিশনে প্রতিপাদ্য বিষয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য, কোন শ্রেণীর লোকদের সাহায্য দেওয়া হবে।

সভা আরম্ভ হবার আর এক ঘণ্টা বাকি।

লেনিন রায়কে ডেকে পাঠালেন।

দেখ রায়, তোমার থিসিস্ আমি পড়লাম। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। সেজন্য দুঃখিত।

আমার মত; কলোনিয়াল দেশে বিপ্লব গড়ে তুলতে; সকলকেই চাই। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত আর দেশীয় বুর্জোয়া। এই চার শ্রেণীরই সাহায্য প্রয়োজন। কাকেও বাদ দেওয়া চলবে না।

ধনী জমিদার, ব্যবসাদার আর বড়লোক। জাতীয় আন্দোলনে, এদেরও নেতৃত্ব চাই। সবই বৈপ্লবিক আন্দোলন।

রায় বললেন।

আমার মত হোল। বৈপ্লবিক আন্দোলনে; তিন শ্রেণীকে সাহায্য দিতে হবে। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত।

ধনীকশ্রেণী অর্থে বুর্জোয়া। তাদের সাহায্য দেওয়া চলতে পারে না।

বুর্জোয়া কোন দিন বিপ্লবী হতে পারবে না। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ সম্পুর্ণ বিভিন্ন।

ধনীকশ্রেণী কাজ হাসিলের ফিকিরে ঘুরবে। সাময়িক ভাবে গরম গরম বুলি বলবে। এই পর্যন্ত।

সাম্রাজ্য বিরোধী ধনীর দল। প্রয়োজনে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করবে; শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে। সব ঠিক।

কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর; আর তারা কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের পাশে এসে দাঁড়াবে না। এক সাথে গণ-বিপ্লব করবে না। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য। মুখোস খুলে যাবে।

তখন বেধে যাবে, শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংগ্রাম।

লেনিনের এই বিষয় নিয়ে রায়ের সঙ্গে গুরুতর মত বিরোধ হোল। রায় কোন আপোষ করতে পারলেন না।

রায়ের বিরোধী মত। লেনিন অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে বিচার করলেন। অনেক আলাপ আলোচনা হোল।

শেষে একটু হেসে বললেন।

রায়, তোমার থিসিস্ আমি গ্রহণ করতে পারলাম না বটে। কিন্তু তোমার থিসিসও কংগ্রেসে উপস্থিত করা হবে। আমি সুপারিশ করেছি। কংগ্রেস বিচার করবেন।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে।

লেনিন এবং রায়। উভয়ের থিসিস্ কংগ্রেসে যথা সময়ে উপস্থিত করা হোল।

ডেলিগেটগণ তুটি থিসিস্ দেখলেন।

তারপর আরম্ভ হোল। গভীর বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণ। উভয় থিসিস্ই আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে; কংগ্রেসে গৃহীত হোল।

একজন তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী। লেনিনের বিরুদ্ধে স্বীয় মত সাহসের সঙ্গে উপস্থিত করলেন।

আর মহান লেনিন পরম ঔদার্য্যের সঙ্গে তা শুনলেন। সেই বিরোধী মতের বিচার বিশ্লেষণ উপভোগ করলেন। স্বীয় মতের কিছু কিছু অংশ সংশোধন হোল। তাও হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। অবাক কাণ্ড!

আজকের দিনে এ কথা চিন্তা করাও যায় না। আজকের মানুষ পরমত অসহিষ্ণু। আজ কোথায় বিরুদ্ধ মতের স্থান নেই।

সভার শেষে লেনিন তাঁর অন্যতম প্রধান সহকর্মী কালিনিনকে বলেছিলেন,—

আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রাচ্যের একজন চিন্তাশীল যুবক। নতুন মত; সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছে। আমার মত খণ্ডন করার মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। রায় নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি! আমি এই রকম লোকই চাই।

স্মল-বুরোর সদস্য :

দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়েছে। তার কয়েক সপ্তাহ পরের কথা।

লেনিনের সেক্রেটারী রায়কে টেলিফোন করলেন।

আজ সকাল দশটায় আসুন : কমরেড লেনিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিশেষ প্রয়োজন।

রায় একটু আশ্চর্য হোলেন।

লেনিন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই। সব সময় কাজ আর কাজ। কর্ম জীবনের যন্ত্র। কর্ম সাধনার মন্ত্র।

লেনিনের কাছ থেকে জরুরী তলব। কাল বিলম্ব করলেন না। নির্ধারিত সময়ে ক্রেমলিন প্রাসাদে এলেন।

ক্রেমলিন প্রাসাদ। সেখানে দুটি ঘর নিয়ে ; লেনিনের বাস-গৃহ। আসবাব পত্র অত্যন্ত সাধারণ ও পুরোন। দুটি টেবিল। কয়েকখানা চেয়ার। কোন জাঁক জমক নেই। আশ্চর্য ! মহাসাধক লেনিন।

রায় প্রবেশ করলেন। দেখলেন একটা চায়ের আসর বসবে। তার আয়োজন হচ্ছে।

লেনিন দাঁড়িয়ে আছেন। একেবারে ঘরোয়া মানুষ। হাসতে হাসতে, রায়ের হাত ধরে ; পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

সেখানে মলোটভ, শেভারনিক, জিনোভিফ, ট্রটস্কি, ষ্টালিন, টমস্কি, বুখারিণ, ম্যালেনকভ আরও কয়েক জন নেতা উপস্থিত।

সবাই রায়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মলোটভ হাসতে হাসতে বললেন,—কন্‌গ্রাচুলেশনস্—

রায় একটু অবাক হোলেন।

লেনিন বললেন'—তোমাকে আমরা কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের স্মল বুরোর সদস্য মনোনীত করেছি।

তুমি আজ থেকে স্মল বুরোর সভ্য।

রায় লেনিনের ব্যবহারে অভিভূত। এক বন্ধুকে বললেন, এই সে দিন কলোনিয়াল কমিশনে লেনিনের বিরোধীতা করলাম।

আর আজ লেনিন আমাকে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করলেন। এত শীঘ্র আমি আশা করি নি। আজ বুঝলাম। লেনিন কত মহান, কত উদার, কত মহানুভব।

রায়ের কাজের দায়িত্ব বেড়ে গেল। তখন ইউক্রেণ, বাকু ও সেন্ট্রাল এশিয়ার স্থানে স্থানে বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। রায় খোঁজ নিলেন। কি করে সব বন্ধ করা যায়।

তখন মলোটভ ইউক্রেণ কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি। রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মলোটভ বললেন—ঠিক আছে। আপনি গ্রামগুলো দেখে আসুন। তাহলে সব খবর পাবেন।

রায় ইউক্রেণ ও বাকু অঞ্চলে ঘুরলেন।

মলোটভ ও কাগানোভিচের সঙ্গে কাজ করলেন। জনগণের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রাখলেন।

রায়ের কার্য পরিক্রমা; লেনিন গভীর ভাবে লক্ষ্য করছিলেন। কাগানোভিচকে বললেন,—রায় যোগ্য ব্যক্তি।

১৯২১ সালের ৮ই মার্চ।

বলশেভিক পার্টির দশম পার্টি কংগ্রেস; আহুত হোল। সেই পার্টিতে কাগানোভিচ ও মলোটভ রায়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। কাগানোভিচ পার্টি মিটিংএ বললেন,—

কমরেড রায়কে আমরা ইউক্রেণ ও বাকু অঞ্চলের; গ্রামে গ্রামে ঘুরে, কাজ করতে দেখেছি। রায় একজন নিরলস কর্মী। অক্লান্ত পরিশ্রমী। যোগ্য ব্যক্তি। সেই পার্টিতে ৬৯৪ জন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। কমরেড রায়ের কাজ দেখে সবাই খুসী।

লেনিন রায়ের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোলেন।

সভ্যপদে মনোনীত হবার পর; মাত্র তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে।

এবার স্মল-বুরোর সভাপতি মণ্ডলীতে রায়ের নাম প্রস্তাব করা হল।

সদস্যেরা এক বাক্যে সম্মত হোলেন। খুব হাততালি পড়লো!

বিপ্লবের ইতিহাসে কমরেড এম, এন, রায় স্বীকৃতি পেলেন।

তাসখণ্ডে ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে কমিউনিজম প্রচার ঃ

১৯২০ সালের আগষ্ট মাস।

লেনিন রায়কে ডেকে বললেন।

জার সাম্রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে অনেক মুসলমান রাজ্য আছে।

উজবেক, তুর্কীমেন, তাজিক, তাসখণ্ড, সমরখণ্ড।

এরা অক্টোবর বিপ্লবের সুযোগ নিয়েছে। সবাই চায় স্বাতন্ত্র।

এদের সোভিয়েট গণতন্ত্রের সামিল করতে হবে।

তোমাকে এই কাজের ভার দিলাম।

রায় হেসে বললেন।

দেখি কি করতে পারি।

সেই দিনই রায় তাসখণ্ডে যাত্রা করলেন। ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত এই তাসখণ্ড। তাসখণ্ডে এসে দেখলেন!

একদল মেন-শেভিক জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন। তাঁরা মুসলমানদের ক্ষেপাচ্ছেন।

একটা মসজিদে মিটিং হচ্ছিল।

খবর পেয়ে রায় গিয়ে হাজির। শ্রোতা একদল মুসলমান যুবক।

বক্তৃতা দিচ্ছেন। একজন জাতীয়তাবাদী টার্টার। নাম সুলতান গালিভ। প্রভাবশালী ব্যক্তি।

দূর থেকে তাঁর গলাটাই বেশী শোনা গেল।

কমিউনিষ্টরা ঈশ্বর মানে না। ধর্ম, সমাজ, মোল্লা, মসজিদ সব ভেঙ্গে তছনছ করবে।

একজন উলেমা ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন।

তোবা, তোবা, মোল্লা, মসজিদ; কিছুই রাখবে না। নামাজ পড়তে দেবে না?

রায় তাদের বললেন।

বেশ, কমিউনিষ্টরা ঈশ্বর মানে না। কিন্তু তারা কটা মস্জিদ ভেঙ্গেছে। ক'টা মোল্লার গলা কেটেছে। ক' জায়গায় নামাজ বন্ধ করেছে।

তখন সবাই চুপ।

রায় খবর নিয়ে দেখলেন। দুজন প্রভাবশালী উজবেক আছেন। একজনের নাম ফৈয়জুল্লা। আর একজনের নাম খদিজেভ। তারাই যত নষ্টের মূল। অথচ তারা বিপ্লবের বন্ধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রায় তাদের মুখোস খুলে দিলেন।

আপনারা ত কুলাক? বৃহৎ জমির মালিক। গরীব চাষীর গলা কেটে; আপনারা ফুলে ফেপে উঠেছেন। কি বুঝবেন গরীবের দুঃখ? এবার নতুন ঈশ্বরের পূজা হবে।

তাসখণ্ডে প্রবল আন্দোলন শুরু হোল।

লাঙল যার, জমি তার।

মুসলমান জনগণ ভেঙ্গে পড়লো।

বেগতিক দেখে ফৈয়জুল্লা আর খাদিজেভ সরে পড়লেন।

রায়কে সাহায্য করবার জন্য পার্টি থেকে দু'জন রাশিয়ান কমরেডকে পাঠান হয়েছে।

এদের নাম সকলনিকভ আর সাভারভ।

শিক্ষিত মুসলমান যুবক। দলে দলে রায়ের কাছে এলেন। রায়ের সঙ্গে কথা হোল। রায় বললেন।

শোষণ-মুক্ত নতুন সমাজ গড়তে হবে। জনগণকে বাঁচাতে হবে। ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজী চলবে না। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

রায় নানা কৌশল ও নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করলেন। মুসলমানদের হৃদয় জয় হোল।

মৌলভি, মোল্লা ও উলেমা পেছিয়ে গেলেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাস।

অল ইউনিয়ন অব দি সোভিয়েটস্। প্রথম সভা আহুত হয়েছে। লেনিন সভাপতি।

সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল। সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হোল। কোন বাধা এল না। সর্বহারার জয় হোল।

লেনিন রায়ের কর্মশক্তি দেখে মুগ্ধ।

১৯২২ সাল : রায় ভারতে অস্ত্র পাঠাবার চেষ্টা করলেন।

তাসখণ্ডে রায় আর একটা সুযোগ পেলেন। তাঁর হাতে প্রচুর অস্ত্র এল। সোভিয়েট রণ-সম্ভার।

রায়ের অনুগামী একদল দুর্ধর্ষ তরুণ টার্টার। তাদের ডেকে বললেন।

ভারত পরাধীন। সর্বত্র ইংরেজের নাগপাশ। শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশকে মুক্ত করতে হবে। ঐ দূরে দেখা যায় ভারত সীমান্ত। চল চল ভারত চল।

সবাই ছুটলো। সেই ডাকে।

হাতে প্রচুর অস্ত্র এসেছে।

বিরাট বিরাট ট্রাক বোঝাই অস্ত্র। কত রাইফেল! কত মরটার কত গুলি বারুদ! সব প্রস্তুত। চাই বিপ্লবী মানুষ।

সবাই খাসগড় পার হলেন। পার হোলেন দূর দুরান্তের পথ। দাঁড়ালেন এসে এক পাহাড়ের তলায়। একেবারে ভারত সীমান্ত।

দূরে লাল নীল সবুজের খেলা। পাহাড়ের গায় পাহাড়। যেন কোলাকুলি করে দাঁড়িয়ে। তার দিকে এক দৃষ্টিতে রায় চেয়ে আছেন।

উৎসাহে, আনন্দে তিনি দিশে হারা।

ঐ দূরে দেখা যায়। ভারতের পবিত্র মাটি। জননী জন্মভূমি।

স্বপ্নের ভারত; সাধনার ভারত; সোনার ভারত।

দেহ ও মনে কেমন যেন একটা অজানা শিহরণ।

গোপনে লোক পাঠালেন। ভারতের অভ্যন্তরে। ডাক দিলেন।

রক্ত রক্তকে ডাকলো। অস্ত্র নাও, এস, ইংরেজ তাড়াও। এই সুযোগ। হেলায় হারিও না।

কিন্তু হায়!

বিপ্লবী মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে। কেউ শুনলো না। সেই বুকফাটা কান্না।

রায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

কমিউনিষ্ট ইউনিভারসিটি ফর্ দি টইলার্স অব দি ইষ্ট : প্রাচ্যের মেহনতি মানুষের কমিউনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

বিপ্লবী মানুষ তৈরী করতে হবে।

এই একমাত্র চিন্তা। রায়কে পাগল করে তুললো। একটা পরিকল্পনা, প্রস্তুত করলেন। দেখা করলেন, পার্টি সদস্যদের সঙ্গে! বোঝালেন তাঁদের।

কালিনিনের সঙ্গে দেখা করলেন।

বললেন, আমি তাসখণ্ড, সমরখণ্ড উজবেগ ঘুরলাম। মিশলাম বহু মুসলিম তরুণদের সঙ্গে। তারা কম্যুনিজম সম্বন্ধে জানতে চায়। আমাদের কিছু করা উচিৎ।

তাহলে আপনি লেনিনের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার স্কীম তাঁকে বোঝান।

রায় লেনিনকে একখানা চিঠি লিখলেন। আমি বিপ্লবী মানুষ তৈরী করতে চাই। পরিকল্পনা পাঠালাম। বিচার করে দেখবেন।

কদিন পরে চিঠির জবাব এল।

তোমার পরিকল্পনা আমি পড়লাম। ঠিক আছে। তবে আমি এটা একটা কমিটিতে পাঠালাম। তাঁরা এর বিচার করে মতামত দেবেন।

রায় খুসী হোলেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি'র সদস্যেরা এ ব্যাপারে খুব আন্তরিকতা দেখালেন।

শিলিয়ানিকভ বললেন, প্রাচ্যের বিপ্লবীদের জন্য কমিউনিষ্ট ইউনিভারসিটি গড়া হোক। আমরা রায়ে মত সমর্থন করি।

ট্রটস্কির ও সেই অভিমত।

প্রস্তাব গৃহীত হোল। নাম দেওয়া হোল। কমিউনিষ্ট ইউনিভার্সিটি ফর্ দি টইলার্স অব দি ইষ্ট-প্রাচ্যের মেহনতি মানুষের কম্যুনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোল।

কমরেড এম, এন, রায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডাইরেক্টর নির্বাচিত হোলেন।

কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেস :

প্রাচ্যের মেহনতি মানুষের কম্যুনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়। বেশ জমে উঠেছে। ডাইরেক্টর এম, এন রায়। নিয়মিত দেখাশুনা করছেন। কাজ ভালই চলেছে। বহুছাত্র। সবাই জানতে চায়। শিখতে চায়। লেনিন রায়ের কাছে একটা সারকুলার পাঠালেন। রায় দেখলেন। ট্রেড-ইউনিয়নের মত ও পথ নিয়ে মতবিরোধ হচ্ছে। তারই উল্লেখ আছে।

ট্রট্স্কি বলছেন।

লাল ফৌজ আমরা গড়েছি। জাতি শিখবে মিলিটারি ডিসিপ্লিন। ট্রেড-ইউনিয়ন গড়বো। মিলিটারি প্যাটার্নে। কেউ বাদ যাবেনা।

লেনিন বললেন।

এটা ভুল। ট্রেড-ইউনিয়ন হবে,—A school of adminis tration, a school of management, a school of Communism.

ট্রেড-ইউনিয়নকে আত্ম-শক্তি ওপর নির্ভর করতে হবে। ফৌজী মনোভাবে কাজ হবেনা।

রায় লেনিনের কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেলেন। বললেন, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আদর্শেকাজ হবে।

৮ই মার্চ, ১৯২১ সাল।

লেনিন নিউ-ইকনমিক পলিসি (N. E. P.) চালু করেছেন। পার্টির মধ্যে একদল উগ্রপন্থী ছিলেন। তাঁরা প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা বললেন। আমরা পেছিয়ে যাচ্ছি। পুঁজিবাদে ফিরছি। এন, ই, পি আমরা চাইনা।

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ।

এই দুটি মতের তাৎপর্য নিয়ে গভীর আলাপ হলো। রায় কৌশলে বোঝালেন। কেন লেনিন এই পথ নিলেন।

সকলনিকভ, রিকভ আর কে কে ছিলেন। তাঁরা শুনলেন। বিরোধীতা আস্তে আস্তে কমে এল।

এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল।

অক্টোবর বিপ্লবের বিপুল উৎসাহ। তখনও অত্যন্ত প্রবল। কমিউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনাল; চতুর্থ কংগ্রেস বসবে।

দিন স্থির হয়েছে। জুলাই, ১৯২২ সাল।

বহু ডেলিগেট। সভায় যোগ দিয়েছেন। চতুর্থ কংগ্রেস বসেছে; নতুন সদস্য নির্বাচনের কথা উঠলো।

সবাই কমরেড এম, এন, রায়ের নাম প্রস্তাব করলেন।

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ প্রচারে, রায়ের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব অসামান্য।

রায় চতুর্থ কংগ্রেসে; সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য নির্বাচিত হলেন। তাঁর কাজের দায়িত্ব খুবই বেড়ে গেল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে; কাজ করবার রায় সুযোগ পেলেন। হাতে ক্ষমতা এসেছে। প্রচুর ক্ষমতা।

নিয়মিত প্রচার কার্য চলতে লাগলো।

রায়ের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ শুরু হোল। বাংলার বিপ্লবী নেতাদের রায় গোপনে চিঠি লিখলেন; হরিদা, কাজ আরম্ভ করুন। আর ভয় নেই। সুযোগ এসে গেছে। দেশকে তৈরী করুন।

একদিন হরিদার হাতে এক বাণ্ডিল বিদেশী ডাক এল। খুলে দেখলেন। বহু লেখা, পত্র, পত্রিকা ও প্রবন্ধ। পাঠিয়েছেন কমরেড এম, এন, রায়। রাশিয়া থেকে সেগুলি এসেছে।

বহু মূল্যবান পুস্তিকা, পত্রিকা ও প্রবন্ধ।

হরিকুমার বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে সে গুলো পৌছে দিলেন। প্রবল উৎসাহে কাজ আরম্ভ হোল।

জার্মানীতে এম, এন, রায়:

রায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সদস্য। সুতরাং তার দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাঁর ওপর ভার পড়েছে। ঘুরতে হবে। ইটালি, স্পেন ও সুইজারল্যাণ্ড। সব ঘুরছেন।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। লেনিন রায়কে চিঠি দিলেন।

তোমাকে জার্মানীতে যেতে হবে। কমিউনিজম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র জার্মানী। তুমি জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতা; থেল হাইমারের সঙ্গে দেখা করবে।

পার্টির নির্দেশে রায় জার্মানীতে এলেন।

রায় দেখলেন। জার্মানরা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি। সেখানে

সোসালিষ্ট বা কমিউনিষ্টদের স্থান নেই। বিস্‌মার্কের আমল থেকে, সোসালিষ্টদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তখন অবশ্য কমিউনিজমের জন্ম হয়নি।

লক্ষ লক্ষ জার্মান। সেদিনও বিশ্বাস করতেন। জার্মানীতে কোনদিন কমিউনিজমের স্থান হবে না। আজও হয়নি। তবে নতুন চিন্তা শুরু হয়েছে।

রায় বার্লিনে এলেন। কয়েকজন নামকরা সোসালিষ্ট। তাদের সঙ্গে আলাপ হোল। তার মধ্যে হ্যারম্যান মূলার একজন। তিনি ১৯১২ সালে জার্মান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। উইল হেলম পিক্; নামকরা কমিউনিষ্ট নেতা। জার্মানীর আর একজন নামকরা সোসালিষ্ট নেতা; তার নাম জুলিয়াস্ লীবার। হিটলার তাকে হত্যা করেন। জার্মানীর বর্তমান চ্যান্সেলার ব্রাণ্ডটের তিনি ছিলেন পিতৃ স্থানীয়। তিনি বললেন—রায় এ দেশে কাজ করুন।

বার্লিনের একটা হোটেলে, রায় একটা ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন। সবাই সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

সেখানে জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতা থেল-হাইমার, হেন্‌রিক, উইলহেলম পিক্, ব্রাণ্ডালার, ডঃ নিউম্যান প্রভৃতি সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

কথায় কথায় হেন্‌রিক বললেন।

জার্মান সরকার কমিউনিজমের বিরুদ্ধে।

রায় হেসে জবাব দিলেন।

সে কথা ঠিক। আর তার বড় প্রমাণ; ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ। আমার সে দিনটা আজও মনে আছে। ১৯১৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

জার্মান সৈন্য। পবিত্র সোভিয়েট ভূমি, আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য কমিউনিজমের ধ্বংস। তাই নয় কি?

থেল-হাইমার নীরবে এই আলোচনা শুনছিলেন। এইবার মুখ খুললেন।

মিলিটারি দিক থেকে; জার্মান আর্মি নিঃসন্দেহে বহুগুণ শক্তিশালী। তারা সেদিন পেট্রোগ্রাদ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। পোলাণ্ড আর ইউক্রেণ অক্লেশে কেড়ে নিল। তাই ভয় হয়। কিভাবে এ দেশে কমিউনিজমের প্রচার হবে।

তখন ব্রাণ্ডলার বললেন।

তা ঠিক। কিন্তু নারভা আর পিস্‌কভে? রেড আর্মির হাতে জার্মানী প্রচণ্ড মার খায়নি?

শেষ পর্যন্ত রায় বললেন। আমাদের সতর্ক হয়ে কাজে এগুতে হবে।

তখন জার্মানী এক ও অখণ্ড। রায় সমগ্র জার্মানী ঘুরলেন। শিল্প-নগরী হামবুর্গ, কোলন, লিপজিগ। সর্বত্র প্রচার কাজ আরম্ভ হোল।

পার্টির কাজে রায় ও ব্রাণ্ডলার কোলনের 'কেবল' কারখানায় গেলেন। ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠালেন।

তাকে ব্রাণ্ডলার বললেন,—আপনাদের এখানে কমিউনিজম প্রচারের জন্য এটা গোপন 'সেল' তৈরী করতে চাই।

সেক্রেটারি খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কাজ আরম্ভ হোল।

এই ভাবে বিভিন্ন শহরে গোপনে কাজ চলছে।

রায় তখনও জার্মান ভাষা ভাল জানেন না। জার্মান ভাষা শিখতে বসলেন।

মাত্র ছ' মাস। সুন্দর ভাবে জার্মান ভাষা আয়ত্ত করলেন।

তারপর পড়তে শুরু করলেন। জার্মান ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ-নীতি।

একদিন পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা।

ছাত্রটি বললেন,—আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ষ্টাইন আসবেন। ল অব রিলেটিভিটি সম্বন্ধে তাঁর থিয়োরীর ব্যাখ্যা হবে।

রায় খুব খুসী।

বেশ, আমিও যাব।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে মনীষী-আইনষ্টাইনের সঙ্গে রায়ের পরিচয় হোল।

রায়ের সঙ্গে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করে আইন ষ্টাইন মুগ্ধ হোলেন।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন।

আমার বাড়ীতে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো।

সেদিন থেকে রায়ের সঙ্গে আইন ষ্টাইনের হৃদ্যতা অন্তরঙ্গের পর্যায়ে উঠেছিল।

১৯২২ সাল। বার্লিন থেকে এক মূল্যবান পুস্তক রায় প্রকাশ করেন। বইখানির নাম India in transition.

অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তক। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সুন্দর ও মনোরম ভাষায় লেখা।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বইখানির খুবই চাহিদা। জহরলাল বইখানি সংগ্রহ করলেন। তাঁর খুব ভাল লাগলো।

তা ছাড়া, একখানা দ্বৈ-মাসিক পত্রিকা। রায় নিয়মিত লিখতে লাগলেন। বার্লিন থেকে প্রকাশিত।

পত্রিকাখানির নাম,—The Vanguard of Indian independence.

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দেখা করতে এল।

রায় একটা সেমিনার খুললেন।

সেখানে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্পর্কে আলোচনা চললো।

কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোর প্রচার আরম্ভ হোল।

ব্রাণ্ডালার বললেন।

কমরেড রায়, বন, হামবুর্গ, লীপজিগে কাজ শুরু করুন।

লাল প্রচার পত্র। জার্মানীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। সবার হাতে লাল কাগজ।

কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে কাল'মার্কসের বাণী নব জাগরণের সৃষ্টি করলো। সর্বত্র সভা, শোভাযাত্রা আরম্ভ হোল।

সর্বত্র প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা।

রায় বললেন, সমাজবাদী সরকার গঠনে জনগণকে চাই।

জার্মান সরকার কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপ ভাল চোখে দেখলেন না।

তাঁরা রায়কে অবঞ্ছিত মনে করলেন।

রায় প্রায় ষোল সতের মাস জার্মানীতে আছেন। সব সময় কাজ আর কাজ।

এবার পুলিশ পেছনে লাগলো।

পুলিশের চোখে রায় একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। পুলিশ একদিন তাঁকে থানায় ডেকে নিয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল। তখনকার মত রক্ষা পেলেন।

হঠাৎ পুলিশ রায়কে গ্রেপ্তার করলো। সাতদিন তিনি পুলিশ হাজতে ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের আদেশে; রায়কে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা হোল। রায়ের আর কি করবার আছে।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ। রায় জার্মানী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হোলেন।

কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের প্রিসিডিয়মে
এম, এন, রায়ঃ

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টি। রায়ের কাজে মুগ্ধ। বিশেষ জার্মানীতে রায় কমিউনিজম প্রচারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। সকলের প্রশংসা পেলেন। আর পেলেন সকলের শ্রদ্ধা।

১৯২৪ সাল। পার্টির শীর্ষ স্থানীয় নেতারা আলোচনায় বসেছেন।

প্রিসিডিয়মে নতুন সদস্য নির্বাচিত হবে।

কালিনিন, কাগানোভিচ, ট্রট্স্কি, বুখারিণ, জিনোভিফ, কেমেনিভ, ক্রুশ্চেভ, ষ্টালিন আরও অনেক আছেন।

প্রিসিডিয়মে সদস্য নির্বাচনে রায়ের নাম উঠলো।

কালিনিন বললেন—

কমরেড এম, এন, রায়কে প্রিসিডিয়মে নির্বাচিত করা হোক।

কমিউনিষ্ট পার্টি রায়ের গুণে মুগ্ধ।

সবাই এক বাক্যে কালিনিনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এবার এম, এন, রায়ের স্থান হোল। ষ্টালিন, ট্রট্স্কি, বুখারিণের সমপর্যায়। পূর্ণ ভোটাধিকার পেলেন। কোন পার্থক্য রইলোনা। পার্টির সর্বময় কর্তাদের একজন হোলেন।

ভাবতেও কেমন হয়। তাই না?

রায় প্যারিসে এসেছেন

জার্মানী থেকে রায় বিতাড়িত।

পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথায় যাবেন?

এবার তাঁর ইউরোপের হেড-কোয়ার্টাস হোল,—জুরিকে। সেখানেও থাকতে পারলেন না। পুলিশ পেছনে লাগলো। সব দেশেই কমিউনিজম,—একটা আতঙ্ক।

পার্টি থেকে নির্দেশ এল,—প্যারিসে যাও। তাই প্যারিসে এসেছেন। ইউরোপের মধ্যমণি ফ্রান্স।

ফরাসীর পবিত্র মাটিতে পা দিলেন।

কি আনন্দ! বিপ্লবের লীলাভূমি ফরাসী। সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব,—এই কথা জগতকে প্রথম শোনাল। এই ফরাসী দেশ।

ভল্‌টিয়ার, রুশো, রবসপায়ার, ডান্‌টনের দেশ।

ফরাসীর মাটিতে মানুষ; প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। রক্তাক্ত সংগ্রাম! পৃথিবী আজও সে কথা ভোলেনি।

কার্লমার্কস দীর্ঘদিন কাটিয়ে গেলেন,—এই দেশে। ডাইয়ালেকৃটিকাল মেট্রিরিয়ালিজমের এখানে জন্ম।

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রগতির উৎস।

ফরাসী দেশকে রায়ের খুব ভাল লাগলো। সহজ, সরল, দিলখোলা ফরাসীর মানুষ। তারা হাসতে জানে। ভাবপ্রবণ জাতি।

প্যারিসের একটা হোটেলে আছেন।

একটি ছাত্র এল। নান্‌তোয়া বিশ্ব-বিত্থালয়ের ছাত্র।

আমরা মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

রায় বললেন—বেশ।

বিশ্ববিত্থালয় প্রাঙ্গণে সভা হোল।

শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।

রোমাঞ্চকর তার ভাষা। ছাত্রেরা অবাক হয়ে শুনলেন। সে ভাষণ। সবার উপর মানুষ সত্য।

খবর গেল সোরবনে।

সেখানকার ছাত্রেরা ছুটে এলেন।

একটা সেমিনার খুলুন। আমরা জানতে চাই। মার্কসের কথা।

তারপর বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হোল।

ফ্রান্সের প্রতিটি শহরে; প্রতিটি গ্রামে; প্রতিটি জনপদে।

নান্ত, রেন, লিয়োঁ, এাসবুর্গ।

সভা আর শোভা যাত্রা।

কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত দলের মানুষ।

এগিয়ে এল। হাজারে হাজারে।

ফরাসীর আকাশ বাতাস; বিদীর্ণ করলো,—শুধু একটি মাত্র শ্লোগান,—Workers of the world unite.

বিশ্বের মেহনতি মানুষ এক হও।

পুরাতনের পত্রপুট বিদীর্ণ করে নতুনের জয়গানে সবাই মুখরিত।

ফরাসী সরকার ভীত ও স্তম্ভিত!

ফরাসী পুলিশ বললেন,—আর চুপ করে থাকা যায় না। কমিউনিজমের প্রচার বন্ধ করতে হবে।

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

রায় হোটেলে বসে আছেন।

দুজন ফরাসী পুলিশ এসে হাজির। হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। পুলিশ রায়কে গ্রেপ্তার করে, থানায় নিয়ে গেল। তিনি নির্বিকার চিত্তে চলে গেলেন! যেন কিছুই নয়। সাংখ্যের পুরুষ।

হাজতে আটকে পড়ে রইলেন। দেখতে দেখতে এক মাস হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করে। এই পর্যন্ত। আর তিনি হাজতে বসে বই পড়েন।

কিন্তু ছাড়তে দেরী করছে কেন?

একটু চিন্তা হোল। ফরাসী চন্দননগরের কথা ভাবলেন। ফরাসী পুলিশ, বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না ত?

গার্ডেনরীচে ডাকাতির পর। কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন চন্দননগরে। মতিলাল রায়ের প্রবর্তক আশ্রমে। এই সব কথা মনের কোনে উঁকি দিচ্ছিল।

যাক এবার নিশ্চিন্ত।

একদিন সকালে। ফরাসী পুলিশ তাঁকে হটাৎ মুক্তি দিল। রায় রাশিয়ায় ফিরে এলেন।

মনে মনে হাসলেন। লাট্টুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ভালবেসেছিলাম এই ধরনীরে। তাই কোথাও স্থান হচ্ছে না।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।

কোমিনটার্ণের পঞ্চম কংগ্রেস :

১৯২৪ সালের জুন মাস। রায় তখনও ফরাসীতে আছেন।

ফরাসীর গ্রামাঞ্চলে প্রচার কাজ চলেছে। রায় কৃষকদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কাজ পরিদর্শন করছেন।

ভ্রমণ সেরে রায় প্যারিসে ফিরে এলেন। ফিরেই দেখলেন। জরুরী তলব।

রাশিয়া থেকে চিঠি এসেছে।

১৩ই জুন, কোমিনটার্ণের পঞ্চম কংগ্রেস বসছে। ই, সি, সি, আই, কমিটিতে নির্বাচন হবে। আপনার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন। পত্র পাঠ চলে আসুন।

ই, সি, সি, আই হোল,—কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের কার্যকরী কমিটি। সুতরাং এটা খুবই শক্তিশালী সংস্থা। ইহার সভ্য হবার সৌভাগ্য অল্প কমরেডের ভাগ্যেই হয়।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাস। চব্বিশ তারিখ।

লেনিনের মৃত্যু হয়েছে। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পাটি আজ পিতৃহীন। কমরেডরা বিমর্ষ। লেনিন সমাধি। সর্বহারার তীর্থ।

লেনিনের মৃত্যুর পর। এই প্রথম পার্টি মিটিং। সবাই উপস্থিত।

ক্রুশ্চেভ প্রস্তাব করলেন। নতুন সদস্যদের নাম। সবাই এক মত। অন্য নাম নেই। এইটাই কমিউনিষ্ট পার্টির রীতি।

একে একে সদস্যের নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়। আর তুমুল হাততালি।

ক্রুশ্চেভ রায়ের নাম প্রস্তাব করলেন। তার সঙ্গে সামান্য ব্যক্তিগত পরিচয়।

মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পার্টির স্রষ্টা। ভারতীয় বিপ্লবী কমরেড এম, এন, রায়।

অমনি চারিদিক থেকে অসংখ্য করতালি।

সেই একই মিটিংএ ; ষ্টালিন ও কমরেড রায় ; এক সাথে নির্বাচিত হোলেন।

সেই বছর শেষের দিকে।

কলোনিয়াল কমিশনে নির্বাচন হবে।

ষ্টালিন বল্লেন,—কম্‌রেড রায় আপনাকে আমরা কলোনিয়াল কমিটিতে চাই।

ষ্টালিন আর এম, এন, রায়।

উভয়ের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ গভীর হয়।

ষ্টালিন বললেন।

কলোনিয়াল কমিটিতে মানুলিস্‌কি, ক্যাটায়ামা ও আমার সাথে আপনি কাজ করবেন। আমরা ঠিক করেছি। প্রাচ্যে কমিউনিজম প্রচারের সর্বময় কর্তৃত্ব; আপনার হাতেই ছেড়ে দেব। লেনিনের সেই মত ছিল।

এই নির্বাচনে এম, এন, রায়ের স্থান ; রাশিয়ায় কত উচ্চে ; তা সহজেই অনুমান করা যাবে।

পরাধীন ভারতের চিন্তা

রায় সেদিন সম্মানের শীর্ষে। তবু শৃঙ্খলিত ভারতের কথা ভুলতে পারছেন না।

ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সর্বহারা-শোষিত জনগণ। তাদের কথা কি ভোলা যায় ? ভোলেননি। ভুলতেও পারেন না।

শুনলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক (১৯২১) অধিবেশন হবে। হবে আমেদাবাদে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। হজরৎ মোহানী। দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

রায় ভাবছেন।

বিদেশীর নাগপাশ। ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তারপর শুরু হবে। দেশ গড়ার কাজ, শোষণহীন সমাজ। এই সুযোগ।

১৯২১ সাল। রায় এসেছেন সুইজারল্যাণ্ডে। দেখা হোল অধ্যাপক বিনয় সরকারের সঙ্গে। দুজনের একই ব্যথা।

রায় বললেন।

বিনয়বাবু,—কংগ্রেসকে এবার পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব নিতে হবে। তা ছাড়া পথ নেই। আন্দোলন দানা বাধবে না। আপনি কি বলেন?

আমি ত সেই কথাই ভাবছি। আপনি পারেন ত কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দেখুন কি বলে।

রায় গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন।

আজই সেই ব্যবস্থা করবো। সেদিনই চিঠি লিখতে বসলেন।

প্রথম চিঠিখানা লিখলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে:

আমেদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিন।

তারপর চিঠি লিখলেন।

সুরেন হালদার, আই, বি, সেন, সাতকড়িপতি রায়, সুরেন ঘোষ, কেলকার, কে, এম, মুন্সী, আরও অনেককে।

একই কথা।

কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করুন। কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করুন।

রায় চুপ করে থাকতে পারছেন না। মনটা আকুলি বিকুলি করছে। তাই চিঠির পর চিঠি।

চিররঞ্জন (ভোম্বল—দেশবন্ধুর পুত্র) কে লিখলেন।

বাবাকে ভাল করে বোঝান! পূর্ণস্বাধীনতাই জাতির কাম্য!

হজরত মোহানীকে লিখলেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের একটা খসড়া পাঠালাম। আপনি জোর দিন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

কিন্তু দুঃখের কথা।

কংগ্রেস নেতারা; রায়ের আগ্রহ ও অন্তরের ব্যাকুলতা; উপলব্ধি করতে পারলেন না।

স্বাধীনতার প্রস্তাব আমেদাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত হোল না।

স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, প্রস্তাবের বিরোধীতা করলেন।

রায়ের আবেদন ব্যর্থ হোল।

ভারতে কমিউনিজম প্রচার :

১৯২২ সাল।

কমরেড এম, এন, রায়, কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের নির্বাচিত সদস্য। তাঁর ওপর ভার পড়েছে। প্রাচ্যে কমিউনিজম প্রচারের।

তখনও ভারতে; কমিউনিজমের ভাবধারা; প্রবেশ করে নি। কার্লমার্কসের নাম ক'জন জানে?

কমিউনিজম প্রচারে; ভারত উপযুক্ত ক্ষেত্র।

রাশিয়ায় একটা কমিটি বসেছে।

রায় সেই কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটিতে আছেন সকলনিকভ, রিকভ, কাগানোভিচ, মলোটভ।

ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

রায় ভাবলেন।

জাতীয় কংগ্রেস। একটা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। কার্ল মার্কসের আদর্শ; কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

তাহলে বিরাট ভারতে, এক শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে।

সকলনিকভ সেকথা সমর্থন করলেন।

ভারত কলোনিয়াল দেশ। কমিউনিজম প্রচারের সত্যিই উপযুক্ত ক্ষেত্র।

তবে খুব সাবধানে ; আর সতর্ক হয়ে ; কাজ করতে হবে।

রায় ঠিক করলেন।

কংগ্রেস নেতাদের কাছে ; কমিউনিজম সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধ পাঠাবেন। তাঁরা আগে জানুন। কমিউনিজমের ভাবধারা।

কি ভাবে পাঠাবেন ?

রাশিয়ার কমিউনিজমকে ; ইংরেজ ভাল চোখে দেখে না। চার্চিল ত মহা চটা। রাশিয়ার ওপর।

তবে খোদ ইংলণ্ডের কথা আলাদা। সেখানে ১৯২০ সাল থেকে ; একদল তরুণ কমিউনিষ্ট বসে আছেন। কার্লমার্কসের শিষ্য। তাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

কিন্তু ভারতে ইংরেজ কমিউনিজম ঢুকতে দেবে না। তাই কৌশলে ও গোপনে এগুতে হবে।

রায় খোঁজ নিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে এক দল বামপন্থী আছেন। তাদের নাম সংগ্রহ করলেন।

তাদের মধ্যে সুরেশ ব্যানার্জী, এন, এম, যোশী, বঙ্কিম মুখার্জী, রাম মনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কেলকার প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

রায় দেখলেন।

ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর। সেখান থেকে ভারতে নিয়মিত জাহাজ যায়।

কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ।' ভারতের বৃহৎ বন্দর।

রায় ইউরোপে বসে, জাহাজের লস্করদের সঙ্গে আলাপ করলেন।

বেশীর ভাগই ভারতীয় লস্কর। তারা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির লোক। কিছু গোয়ানিজ।

সেদিন কলকাতাগামী একখানা জাহাজ ছাড়বে। জাহাজে বহু ভারতীয় লস্কর। লস্করদের সর্দারের নাম। খাদিম মীয়া।

রায় খাদিম মীয়ার সঙ্গে আলাপ করলেন। তাকে বললেন,—মীয়া সাহেব তোমাকে এই কাগজ গুলো; পৌছে দিতে হবে।

কোথায় কর্তা ?

কলকাতার কংগ্রেস অফিসে। সেক্রেটারি বাবুর হাতে। এই নাও পঞ্চাশ মার্কস। কিন্তু সাবধান। খুব গোপনে কাজ করতে হবে। দেশের কাজ।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন কর্তা। এ কাম আমরা হামেসাই করে থাকি। এই বলে একটু মুচ্কি হাসলো খাদিম।

তারপর বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজ পোর্টে। একই ভাবে কাজ শুরু হোল।

ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ তার গন্ধও পেলো না। এই ভাবে বেশ কিছুদিন চললো।

বে-আইনী ভাবে এম, এন, রায়ের বহু পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধ। জাহাজের খালাসিদের হাত দিয়ে ভারতে পৌছুতে লাগলো। বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে বিলি হোল। নতুন ভগবানের কথা।

জাতীয় কংগ্রেসের বহু কর্মী। কার্ল মার্কসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন। পরে তাঁরা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।

কংগ্রেসের যুব সম্প্রদায়।

কমিউনিজমের আদর্শে প্রভাবান্বিত।

কমরেড এম, এন, রায়। বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা ও প্রবন্ধ; বিভিন্ন নামে একাই লিখে যাচ্ছেন। তরোয়াল হার মানলো,—কলমের শক্তির কাছে। জ্বলে ওঠে আগুন যেন।

দেশের যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে; কমিউনিজমের ভাবধারা; ছড়িয়ে পড়লো।

কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যে ঘরোয়া বৈঠক শুরু। বেশ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা চললো।

ব্যাপারটা পুলিশের নজরে আসতে বিলম্ব হোলনা।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। সতর্ক হয়ে উঠলো। দিল্লী সচকিত। বৃটিশ সিংহ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

পুলিশ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কড়ানজর রাখলো।

১৯২৩ সাল। করাচী বন্দরে এক বিদেশী জাহাজ ভিড়লো। পুলিশ দেখলো। তিনজন লস্কর। প্রত্যেকের হাতে, একটা করে কি এক বাণ্ডিল। কেমন যেন চনমনে ভাব।

বাণ্ডিল শুদ্ধ লোকগুলোকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো।

পুলিশের হাতে কিল-চড়-ঘুসি, আর ধমকানি খেয়ে; লোকগুলো সব বলে ফেললো। পুলিশ দেখলো, সর্বনাশ! এ'যে কমিউনিজমের বই।

পুলিশ জানতে পারলো।

এম, এন, রায় রাশিয়া, জার্মানী, স্পেন, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড থেকে; গোপনে এইসব বই; আর প্রবন্ধ পাঠান। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সেগুলো দেশে দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। নিয়মিত বিলি হচ্ছে। তাহলে দেশটা কমিউনিষ্ট হবে নাকি?

পোষ্টাফিসে সন্দেহজনক সব বই, চিঠি পত্রের ওপর পুলিশ কড়া নজর রাখলো। বিদেশী ডাক। সেন্সার করতে শুরু করলো।

এত কড়াকড়ি; তবু কাষ্টমস্ আর পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে, গোপন পথে বহু পুস্তক পত্রিকা পাচার হচ্ছে পুলিশ হদিস পাচ্ছেনা।

এমনি করে বেশ কিছুদিন চললো।

১৯২৩ সাল। অক্টোবর মাস।

পুলিশ একই দিনে সর্বত্র সার্চ করলো। সাড়া ভারতে পুলিশ ছুটলো। দেশ তোলপাড় করে তুললো।

বহু পুস্তক ও পত্রিকা ধরা পড়লো

এম, এন, রায়ের বহু চিঠি। বার্লিন থেকে লিখেছেন। সব ধরা পড়লো। একখানা চিঠি। বঙ্কিম মুখার্জীকে বার্লিন থেকে লিখেছেন। পিপলস্ পার্টি গঠন করুন। কৃষক ও শ্রমিককে দলে নিন। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের কমিউনিজমে দীক্ষিত করুন।

পিপলস্ পার্টির মধ্যে, এমন সব সদস্য নিয়ে আসুন; যারা আসলে কমিউনিষ্ট। কিন্তু গোপনে তাঁরা কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবেন। শোষিত জনগণের মুক্তি আমাদের লক্ষ্য। কাজে ঝাপিয়ে পড়ুন।

ভারত সরকারের চক্ষু স্থির।

কমিউনিজম? সর্বনাশ!

রায়ের লেখা। বহু উত্তেজক পত্র, পত্রিকা, প্রবন্ধ ও পুস্তক। সরকারের হাতে এসেছে। সব বাজেয়াপ্ত হোল। বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোল। পুলিশ দিশেহারা।

তারপর ১৯২৪ সালে; কাণপুর ষড়যন্ত্র মামলা; রুজু করা হোল। এম, এন, রায় প্রধান আসামী।

কিন্তু তিনি ত তখন ধরা-ছোয়ার বাইরে।

লেনিন: কমিউনিজমের স্রষ্টা

বিশ্বের দুর্ভাগ্য। ১৯২৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী। মহান লেনিন; গর্কিতে অকালে প্রাণ ত্যাগ করলেন। আরব্ধ কার্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

প্রকাশ, তিনি আততায়ীর নির্মম হস্তে গুলি বিদ্ধ হন। তারই ফলে মৃত্যু হয়।

লেনিনের জন্ম; ১৮৬০ সালের ২২শে এপ্রিল। এক গণ্ড গ্রামে। গ্রামটির নাম সিম্‌বিরিস্ক। তাঁর পুরো নাম ছিল। ভ্লাডিমির ইলিচ লেনিন।

লেনিন কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা। কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা; তিনি বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন!

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব দেখা দেয়। এই বিপ্লবে দেশের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থ-নীতির পুরাতন বনিয়াদ। ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

লেনিন বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল; মাত্র দেড় কোটি। তার মধ্যে বিশ হাজার লোক। বলশেভিক পার্টির সদস্য।

লেনিন সোসালিজম প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৮ সালে, লেনিন বললেন।

The will of a class is some times fulfilled by a dictator.

হাতে শক্তি এল। লেনিন কাজ শুরু করলেন।

We must organise every thing, তিনি গড়লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন, যুব-সঙ্ঘ, রাজ্যপরিচালক মণ্ডলি, কনট্রোল কমিশন, প্রচার কেন্দ্র, চেকা পুলিশ। আরও কত।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি, হান্টিংটন্‌ বললেন,—Lenin was not a disciple of Marx, rather Marx was a precursor of Lenin.

লেনিনকে মার্কেসের শিষ্য না বলে বলা উচিৎ; মার্কস ছিলেন লেনিনের অগ্রদূত।

সত্যিই তাই। লেনিনই মার্কসকে তুলে ধরলেন। মার্কস বলতেন, প্রধানতঃ শিল্পে অগ্রগামী দেশে; কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে।

লেনিন দেখালেন,—তা নয়।

পেছিয়ে পড়া কৃষিপ্রধান দেশেও; সাফল্যপূর্ণ সমাজবাদী বিপ্লব সম্ভব। যেমন রাশিয়ায়।

আমেরিকার টাইমস্ পত্রিকা বলেছেন।

That Marxism continues to survive as a movement is a tribute to Lenin, who transformed a social theory into a plan of political action.

তাই আজও লেনিনের সমাধিতে লেখা আছে।

Lenin will always live.

Lenin will always give.

লেনিন গুণগ্রাহী এম, এন, রায়; বিরাট ও মহান লেনিনের কথা নিয়ে; বন্ধু মহলে সব সময় আলাপ করতেন। বলতেন—লেনিনকে পড়, লেনিনকে জান। আজ লেনিনকে জানবার দিন এসেছে।

কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনাল ডেলিগেশনের প্রধান করে এম, এন, রায়কে চীনে পাঠান হোল :

১৯২৬ সাল, ১৩ই নভেম্বর।

কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের কার্যকরী কমিটির মিটিং মস্কৌতে বসেছে। আছেন ষ্টালিন, কালিনিন, বরোডিন, ক্যাটায়ামা, কাগানোভিচ, এম, এন, রায়, আরও অনেক। কমিউনিজমে সহায়তা দিতে; চীনে ডেলিগেশন পাঠান সম্পর্কে; প্রস্তাব নেওয়া হবে।

ষ্টালিন বললেন।

ডেলিগেশনের পলিশি। আগে থেকে নির্ধারিত থাকবে! পরিচালনায় যেন ভুল না হয়।

এম, এন, রায় উঠে দাঁড়ালেন।

চীনা-বিপ্লব কৃষি ভিত্তিক হওয়া চাই। চীনের ধনী জমিদার, শিল্পপতি আর সমর নায়কগণ। কিয়োমিং-টাং দখল করে বসে আছেন। তাঁদের সরাসরি সহায়তা দিলে ভুল হবে।

চীন কৃষি প্রধান দেশ। চীনের দরিদ্র; ভূমিগান, সর্বহারা কৃষক। তাদের সহায়তা দিতে হবে।

ষ্টালিন এই মত গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন,—না, চীনের সমর নায়কগণ; প্রধানতঃ বৃহৎ জমির মালিক। ভূমি আন্দোলন করলে; এই সব সমর নায়কগণ; আমাদের বিরুদ্ধে যাবেন। ফলে আন্দোলনের ক্ষতি হবে।

রায় জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানালেন।

কৃষকদের হাতে নিতে হবে। এ ছাড়া আমাদের পথ নেই। তবে গোড়া থেকে ব্যাপক ভাবে; কৃষি বিপ্লব আমরা করবো না। কিয়ো-মিং-টাং দলে; যে সব ভূমিহীন কৃষক সদস্য আছেন; তাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে! খুব সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে।

সে কথা শুনে ষ্টালিন বললেন! তাহলে কমিটির বিবেচনার জন্য আপনার থিসিস উপস্থিত করুন।

এম, এন, রায় থিসিস উপস্থিত করলেন। বিচার-বিতর্কের পর; রায়ের থিসিস ষ্টালিন মেনে নিলেন। বললেন—ঠিক আছে।

ক্যাটায়ামা, এবং অন্যান্য সবাই; রায়ের যুক্তি উপলব্ধি করলেন। রায় সকলের প্রশংসা পেলেন।

কমিউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনাল রায়ের থিসিস অনুমোদন করলেন। রায়ের নীতি স্বীকৃতি পেল।

এবার ষ্টালিন প্রস্তাব করলেন।

কমরেড এম, এন, রায়কে; ডেলিগেশনের প্রধান করে, চীনে পাঠান হোক।

তাই হোল। সবাই রাজী।

কয়েক দিন পর। রায় চীন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ডেলিগেশনের এক বিরাট দল। বরোডিনও আছেন।

রায়কে রাজোচিত সম্মানে ; বিদায় দেওয়া হোল। রায় হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। এবার চীনের পথে।

ট্রানস্ সাইবেরিয়ান্ রেলপথ। বিরাট স্পেশাল্ ট্রেন। মস্কৌ থেকে ছাড়লো। পেলেন বিদায় অভিনন্দন। সকলের শুভ-ইচ্ছা। ট্রেন ছুটেছে। কত গ্রাম, কত শহর, কত জনপদ, কত বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য, কত অদ্ভুত সৌন্দর্য। তার মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটেছে।

ক'দিন পর ; তাঁর ট্রেন এসে থামলো ; ঐতিহাসিক শহর ও বন্দর ব্লাডিভষ্টকে। রুশ-জাপান যুদ্ধের স্মৃতি। আজও বর্ত্তমান।

ব্লাডিভষ্টক এক প্রসিদ্ধ বন্দর। প্রাচ্যের দরজা।

রায় অবাক হয়ে দেখলেন। তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যাবার জন্য বিরাট ব্যবস্থা। কোন খানে কোন ফাঁক নেই।

একখানা প্রকাণ্ড রুশ জাহাজ। বন্দরে অপেক্ষা করছে। জাহাজের বিশালতা। সীমাহীন বৈভব। সাধারণকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করবে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ; রায়ের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করেছেন।

জাহাজের ক্যাপ্টেন এক নেভি অফিসার।

তিনি বললেন,—জাহাজ সাংহাই বন্দরে থামবে না। সোজা কাণ্টনে যাবে।

হেসে রায় বললেন—আমি জানি।

রায় জানতেন। সাংহাইতে ভয় আছে। বৃটিশ পুলিশ একবার সংবাদ পেলে হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। ইংরেজ তাঁকে ভোলেনি। তিনি পলাতক আসামী। তাই আগে থেকে ; সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট, সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

রায় মনের আনন্দে ; ঢেউএর বুকে নাচতে নাচতে কাণ্টনে চলেছেন। সঙ্গে দলবল।

কাণ্টনে এসে পৌছুলেন। এক চীনা কমিউনিষ্ট। জাহাজে কমরেড রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। মিষ্টি হেসে করমর্দন হোল।

কমরেড রায়, আপনাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। প্লেনে হংকো যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এয়ারপোর্টে বসেই আছেন। প্লেন আর ছাড়ে না। রায় একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছেন।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে জানতে পারলেন।

প্লেন যাবেনা। প্লেনের মোটর ভেঙ্গে গেছে। তাহলে উপায়?

আপনাকে ট্রেনে করে হংকো নিয়ে যাওয়া হবে।

বেশ, তাই চলুন।

কিন্তু রায়ের মনে একটা খটকা লাগলো।

চীনের মাটিতে পা দিতেই যেন একটা অশুভ সংকেত। একটা অমঙ্গলের আবছায়া।

কিন্তু রায়ের সংস্কার মুক্ত মন। তাই আমল দিলেন না।

ট্রেনে চড়লেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন চললো।

তারপর হঠাৎ ট্রেনটা মাঝ পথে থেমে গেল। এক নির্জন স্থান। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। হয়ত দূরে একটা গ্রাম আছে। কেমন যেন থমথমে ভাব। জন মানবের চিহ্ন নেই। অজানা অচেনা দেশ।

চীনা কমরেডটি মুখটি ফেকাসে করে নেমে এলেন।

ট্রেন হংকো যাবেনা। আপনাকে এখানেই নামতে হবে।

মাঝপথে?

হাঁ, উপায় নেই।

রায় নেমে পড়লেন। ট্রেন ছেড়ে দিল। রায় চিন্তিত হোলেন। কেমন যেন মনে হোল।

কিছুক্ষণ পরে একটা গোলমাল কানে এল। নির্জন বনের অপর পার থেকে কতকগুলো লোকের গলার আওয়াজ। চারিদিকে বন। পথের চিহ্ন নেই।

দেখলেন একখানা পাল্কী আসছে। বনের মধ্য থেকে বেড়িয়ে এল। তারই গোলমাল।

কমরেডটি পাল্কির বেয়ারাদের চীনে ভাষায় কি বললেন। পাল্কি রায়ের জন্য,—আপনি পাল্কি করে যাবেন।

রায় ভিতরে চড়ে বসলেন। বেয়ারাগুলো পাল্কি নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। যাবে গন্তব্য স্থানে। যাবে হংকৌ। পাল্কি কাঁধে, বেয়ারারা ছুটলো; গান করতে করতে।

পাল্কি চলে পাল্কি চলে, নৃত্য তালে নৃত্য তালে।

রায়ের তখন কবিতা ভাল লাগছেনা।

বন পার হয়ে, পাল্কি গ্রামে প্রবেশ করলো। গ্রামের পর গ্রাম। রায় পাল্কি করে চলেছেন। পথের আর শেষ হয় না। গ্রাম আর মাঠ।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। ওকি? চোখে পড়লো। রাস্তায় ধারে। গাছের ডালে। মানুষ ঝুলছে!

তারপর যত এগুচ্ছেন। রাস্তার দুধারে। ততই চোখে পড়ছে। গাছের ডালে ডালে। অসংখ্য সংগ্রামী ও বিপ্লবী চীনা চাষীকে মেরে; টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা নয়; দুটো নয়। অসংখ্য মৃতদেহ। কি বীভৎস সে দৃশ্য। কি ভয়াবহ সে স্থান!! কি হৃদয় বিদারক সে নিষ্ঠুরতা।

এই পরিবেশের মধ্যে রায় তাঁবুতে পৌছুলেন।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

১৯২৭ সাল ১লা মে :

চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস। হংকৌ শহরে, অধিবেশন বসেছে।

কুয়ো-মিং-টাং দল আছেন।

উহান গভর্ণমেণ্টের অর্থমন্ত্রী; টি, ভি, সুং উপস্থিত। সাই-ইউয়ান-পাই, ইউ-সে-হিউ, লি-শেন-সেন। আরও অনেকে আছেন।

চীনা কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্ট পার্টির; অন্যতম প্রধান নেতা; চিউ-চিউ-পি আর চেন-টু-সিউ খুব ব্যস্ত হয়ে; ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এম, এন, রায় ও বরোডিন নিমন্ত্রিত।

চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন খুবই জটিল।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি চীনে বুর্জোয়া বিপ্লব চলছিল।

জাতীয় সরকারের নেতা। লিও-চুন-হাই। বিপ্লবী কৃষকরা তাঁকে হত্যা করে। সেটা ১৯২৫ সালে ঘটনা।

তারপর থেকে সমগ্র চীনে জেহাদ চলেছে। চীনের বিপ্লবী কৃষকদের বিরুদ্ধে।

সামন্ততান্ত্রিক জমিদার। সমর নায়ক। বড় ব্যবসাদার। কিয়ো-মিং-টাং সরকারের দুর্নীতি পরায়ণ অফিসার। গ্রামের গুণ্ডা—বদমায়েস—বোম্বেটে। সব এক জোট। যত পার কৃষক হত্যা কর।

গ্রামের কৃষক ইউনিয়ন। তারা সেগুলো আক্রমণ করলো। হুনান, কোয়াংটাং, কোয়াংসি, হুপে। সর্বত্র হাজার হাজার কৃষক। তাদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হোল।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির স্রষ্টা।

প্রোফেসার লি-তা-চাও। তাঁকে নির্মম ভাবে মারলো। তারিখটা ছিল ১৯২৭ সাল ৬ই এপ্রিল। তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়।

এই পরিবেশের মধ্যে; চীনে পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে।

কমিউনিষ্ট সভ্যেরা কোন বিপ্লবী প্রোগ্রাম নিতে ভয় পেলেন। ভয় সমর নায়কদের।

তাঁরা খোলাখুলি ভাবে বললেন।

আমাদের পক্ষে কোন বিপ্লবী আন্দোলন চালু করা বর্তমানে সম্ভব নয়।

চিউ-চিউ-পি বললেন—আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির থিসিস। আমরা মেনে নিতে পারলাম না। আমরা উহা বাতিল করলাম।

তখন এম, এন, রায় উঠে দাঁড়ালেন। নির্ভীক কণ্ঠে বললেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কাজ হবে, সর্বহারা কৃষকদের সাহায্য করা। ধনীর স্বার্থ। আর সর্বহারা দরিদ্র কৃষকের স্বার্থ। এক হতে পারে না।

বরোডিন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন।

কমরেড চিউ-চিউ-পিকে আমি সমর্থন করি। রায়ের মত অবাস্তব;

কমরেড চেন-টু-সিউ খুবই বিরোধীতা করেন।

—আমরা কিছুতেই মানতে পারি না।

তখন চীনা কমিউনিষ্টদল। রায়ের মত; সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। রায় অত্যন্ত ব্যথা পেলেন।

রায় চীনে গেছলেন; ১৯২৬ সালের শেষের দিকে। ১৯২৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত; সে দেশে ছিলেন।

তিনি চুপ করে বসে ছিলেন না।

তিনি তরুণ চীনা কমিউনিষ্টদের গোপনে ডাকলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। তাদের বুঝিয়ে বললেন।

কৃষি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত কর। গ্রাম থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গুলোকে খতম কর। গ্রামের জমিদার। মহাজন। আর বড়লোকের দল। তোমাদের শত্রু।

কিয়ো-মিং-টাং দল সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক। তাদের বিরুদ্ধে যাও।

রায় একাই কাজ করে গেলেন। কিন্তু ফল ভাল হোল না।

কিয়ো-মিং-টাং দল। রায়কে ভাল চোখে দেখলো না।

চিয়াং-কাই-সেক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোলেন। তাঁরা ক্ষেপে গেলেন।

তখন কমিউনিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা; কিয়ো-মিং-টাং এর হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করছিলেন।

অত্যাচারের কিছু কিছু সংবাদ। গোপনতার প্রাচীর ভেদ করে, ভারতে প্রবেশ করলো।

সেই সময়কার মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করেন।

'কমিউনিষ্ট' মাত্র এইটুকু অপরাধ। সেই অপরাধে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ; কম্যুনিষ্ট ছাত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করা হোত।

আর সেই মৃত ছাত্রের দেহে ; একটা লাল পতাকা গুজে ; লিখে দেওয়া হোত,—'কমিউনিষ্ট'।

রায় আগেই অনুমান করেছিলেন। এমন সব দুর্ঘটনা। ঘটতে পারে।

চীনের সমর নায়কগণ। সংবাদ পেলেন। কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ক্ষেপাচ্ছে। আর চারিদিকে তারই ষড়যন্ত্র।

তখন চীনে রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে।

চারিদিকে শুধু হত্যা, হত্যা, আর হত্যা।

আন্তর্জাতির ডেলিগেশনের নেতা। কমরেড এম, এন, রায়। পেটি বুর্জোয়া, কৃষক ও পলিটেরিয়েট। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়াচ্ছেন। কৃষি আন্দোলন চলেছে।

চ্যাং-সো-লিন হুমকি দিলেন।

কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না। কৃষি আন্দোলন অবিলম্বে বন্ধ কর। নতুবা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।

বামপন্থী চীনা কমিউনিষ্ট দল। অত্যন্ত ভয় পেলেন। ভাবলেন রুশ ডেলিগেশন। যত সর্বনাশের মূল। অতএব তাদের তাড়াও। নতুবা সবাইকে মরতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যা।

এম, এন, রায়, বরোডিন এবং ডেলিগেশনের দল বল। হোটেলে ফিরেছেন। আলাপ-আলোচনা হচ্ছে।

হঠাৎ একদল চীনা কমিউনিষ্ট নেতা; ঝড়ের মত হোটেলে প্রবেশ করলেন। তাদের চোখ-মুখ; ভয়ে ভাবনায়; এতটুকু হয়ে গেছে। সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত।

তাদের মধ্যে একজন রূঢ় ভাবে বললেন।

আজ রাত্রেই আপনারা চীন ছেড়ে চলে যান। আমরা আপনাদের চাইনা। আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন।

ডেলিগেশন অবাক। কি ব্যাপার?

আপনাদের জন্ত আমরা মরতে বসেছি।

সমর নায়কেরা ক্ষেপে গেছে।

হাজার হাজার কমিউনিষ্ট কৃষক। তাদের হত্যা আরম্ভ হয়ে গেছে। বাঁচবার পথ নেই।

কৃষকের রক্তে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

রায়ের মুখে একটা কথা নেই।

অপমানের গ্লানি, মাথায় নিয়ে; সেই রাত্রেই রুশ ডেলিগেশন মিশনকে চীন ছেড়ে, রাতের অন্ধকারে, পালাতে হোল।

উপায় ছিল না।

গভীর রাত্রি।

হোটেলের সামনে; তিন খানা মোটর এসে দাঁড়াল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে; চোরের মত; আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন, মোটরে চেপে বসলেন। অত্যন্ত গোপনে, তাদের পালাতে হোল।

মোটর দ্রুতবেগে ছুটলো। মঙ্গোলিয়ার মরুভূমির দুর্গম পথ ধরে। তারপর উরগা হয়ে মোটর এসে পৌছুল; রাশিয়ার সীমান্তে।

পরাজয়ের শোচনীয় গ্লানি।

রায়ের চীনা-নীতির বিপর্যয় ঘটলো।

সবাই রাশিয়ায় ফিরে এলেন। মাথা হেঁট করে।

ষ্টালিন থেকে আরম্ভ করে; রাশিয়ার সমগ্র কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ দারুণ অপমানিত বোধ করলেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট ডেলিগেশন। ব্যর্থ হয়ে চীন থেকে ফিরে এল। রায়ের জনপ্রিয়তা। রাশিয়ার অনেক ক্ষুন্ন হয়েছে। সবাই রায়কে দোষ দিচ্ছে। রায় ভাবছেন।

সবাই আমাকে ভুল বুঝলো।

কেন তাঁর পরাজয় হোল। তা সবাইকে জানাতে হবে। তাই একখানা বই লিখতে বসলেন।

বইখানার নাম My experience in china.

সেই সময় আমেরিকা থেকে তিনি একখানা চিঠি পেলেন।

চিঠিখানা লিখেছেন। ষ্টান্-ফোর্ড বিশ্ববিত্থালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। রবার্ট সি নর্থ।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন মিশন। কেন চীনে ব্যর্থ হোল? আপনার কি মত। জানালে বাধিত হব।

রায় তাঁকে সব কথা খুলে লিখলেন।

তারপর রায় সংবাদ পেলেন। ষ্টান্-ফোর্ড বিশ্ববিত্থালয়। নর্থকে চীনে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রায়ের হাতে একটা প্রবন্ধ এল।

অধ্যাপক রবার্ট, সি, নর্থ সেটি লিখেছেন।

সৈন্তদলের মধ্যে ভুমিহীন কৃষক ছিলেন। রায় তাদের বিপ্লবের সামিল করতে চেয়েছিলেন। আর বরোডিন চাইছিলেন। চীনের সমর নায়কদের সঙ্গে একটা আপোষ আর আঁতাত। রায় তা মেনে নেননি। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে, ফিরে যেতে হোল।

রায় অধ্যাপক নর্থকে একটা মূল্যবান বই পাঠালেন। বইখানি মস্কো থেকে প্রকাশিত। সেটি একখানি সরকারী দলিল।

বইখানি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। রায় তখন কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের সদস্য ছিলেন না। লেখকের নাম কমরেড মিফ্।

Mif লিখেছেন,—

It was Roy who gave the Young Chinese party for the first time a real Leninist prognosis of the events taking place. From Roy the party heard for the first time a throughly thought out perspective of the movement. Roy gave the Young Chinese party the experience of world Bolshevism.

রায় সর্বপ্রথম তরুণ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। চীনে যেসব ঘটনা ঘটছে তা লেনিনের কাজের পূর্বাভাষ। রায়ের নিকট থেকে, পার্টি প্রথম দেখতে পেলেন। আন্দোলনের সঠিক ও সুচিন্তিত ছবি। বিশ্ব বলশেভিক সম্বন্ধে রায়ের অভিজ্ঞতা; চীনের তরুণ কমিউনিষ্ট পার্টিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়।

চীনের পঞ্চম কংগ্রেস পার্টির সদস্য। চিউ-চিউ-পি 'চাইনিজ রেভোলিউসন' নামে একখানা বই লেখেন। নর্থকে সে বইখানা ও রায় পাঠিয়ে দিলেন। তাতে চিউ-চিউ-পি বরোডিনের দোষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক নর্থের প্রবন্ধে ছিল।

ষ্টালিন চীনা বিপর্যয়ের জন্য একটা 'স্কেপ গোট' খুঁজছিলেন। হঠাৎ কার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন? তাই ভাবছিলেন। রায় হোলেন সেই Scape goat.

১৯২৭ সালে চীনে রায়ের পরাভব হোল। রায় দারুণ গ্লানি ও মনোবেদনা নিয়ে মস্কোতে ফিরে এলেন।

মস্কো ফিরে এসে রায় দেখলেন। ষ্টালিন পন্থী ও ট্রট্স্কিপন্থীদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সে সংগ্রাম। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। ক্ষমতা সংরক্ষণের সংগ্রাম।

রায় দেখলেন।

লাল সাম্প্রদায়িকতা শুরু হয়ে গেছে। লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী। তাদের বিপ্লবের শত্রু আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তারপর নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। অবশ্য বিচারের প্রহসন করে।

রায় ষ্টালিনকে একখানা চিঠি লিখলেন। নীতি ও আদর্শের জন্য সংগ্রাম হবে। শক্তি সংগ্রহের জন্য নয়। ইহা অযৌক্তিক, ক্ষতিকর ও বিপ্লব-বিরোধী।

ষ্টালিন সেটা ভাল চোখে দেখলেন না। তারপর চীনে ডেলিগেশান মিশনের অপমান। ষ্টালিন ভুলতে পারছিলেন না। ষ্টালিন রায়ের বিরুদ্ধে গেলেন। রায় অবাঞ্ছিত। তাড়াতে চাইলেন।

জহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এইভাবে কয়েকটা মাস কেটে গেল।

১৯২৭ সাল, নভেম্বর মাস।

এক শীতের সকাল। ডাক পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। বহু চিঠি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে।

চিঠি খুলতে খুলতে ; একখানা চিঠি ; রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

চিঠি লিখেছেন। ভারতের কংগ্রেসী নেতা। জহরলাল নেহেরু।

কয়েক দিনের জন্য রাশিয়ায় যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করি।

রায় খুসী হয়ে উত্তর দিলেন।

আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমিও আনন্দিত হব।

দুই বিপ্লবীতে মিলন হোল।

ভারতীয় প্রথায় রায় অভ্যর্থনা করলেন,—নমস্কার।

পণ্ডিত জী হাসতে লাগলেন।

তারপর ছুঘণ্টা ধরে উভয়ে আলাপ হোল। ভারতের স্বাধীনতা ও সমাজবাদ নিয়ে।

যাবার সময় নেহেরু বললেন।

অনেক আশা আর কৌতুহল নিয়ে; আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমি নিরাশ হই নি। আমি আনন্দিত।

অনেক দিন পর।

আনন্দ বাজার পত্রিকায় একটা চিঠি বার হয়। সেটা এম, এন, রায় সম্বন্ধে জহরলালের লেখা। তারিখটা ছিল ১৯৩৩ সালের ২০শে অক্টোবর।

নেহেরু লিখেছেন।

১৯২৭ সালে, নভেম্বর মাসে মস্কৌতে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই শুনে ছিলাম।

ভারতের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সুলিখিত বইখানিও পড়ে ছিলাম। সুতরাং অনেক আশা ও কৌতুহল নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি নিরাশ হই নি।

দৈর্ঘে পূর্ণ চার হাত। সুগঠিত দেহ। মানবেন্দ্র নাথ যেন ভারতীয় মনুষ্যত্বের এক সুন্দর বিকাশ মূর্তি।

তাঁর বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সজাগ। মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপে আমি অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হলাম।

জীবনের পরিস্থিতি, অর্থনীতি, এবং রাষ্ট্র-নীতিতে তিনি মার্কসবাদে পূর্ণ বিশ্বাসী। একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে, সেই বিশ্বাসকে নিজে আঁকড়ে ধরে আছেন।

নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁর আস্থা আছে। নির্বিচারে অন্ধের মত তিনি কাহারও মতানুকরণ করেননা।

ষ্টালিনের দলের ইউনিয়নের কার্যপন্থা ও নীতি নিয়ে মতভেদ হয়। তাই মানবেন্দ্র নাথকে রাশিয়া পরিত্যাগ করতে হয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে
এম, এন, রায় বিতাড়িত।

১৯২৮ সাল।

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনাল।

কার্যকরী সমিতির নবম পার্টি মিটিং মস্কৌতে বসেছে। সভা জমজম করছে।

রায়ের বিচার হবে।

চীন-ডেলিগেশনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে?

সেই সময় রায় গুরুতর পীড়িত। প্রায় মাসাবধি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। উত্থান-শক্তি রোহিত। প্রায় সংজ্ঞাশূন্য অবস্থা।

রায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নেওয়া হোল। রায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারলেন না।

সেই সভায় ইউজেন ভর্গা। একজন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য। রায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর জিভের বিষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

রায় ভয়ঙ্কর উগ্রপন্থী। কৌশল বর্জিত। তাঁর আপোষ-হীন মনোবৃত্তির জন্য; রাশিয়ার মাথা হেঁট হয়েছে। বিশ্বের দরবারে রাশিয়া ছোট হয়েছে।

এবার উঠে দাড়ালেন। আর একজন পার্টি সদস্য। তারনাম কমরেড কুসিনেন। কুসিনেন বললেন,—

১৯২০ সালে; কলোনি বিলোপ সাধনের জন্য রায় বলেছিলেন এককথা। আর সেই একই মানুষ। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে; ভারতে সাম্রাজ্য বিলোপ সাধন ব্যাপারে বললেন, সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। উহা নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন।

রায়ের ভারত সম্বন্ধে নীতি হোল।

De colonisation of India will be allowed to evolve

out of the state of 'dependency' to 'Dominion status'.

তাতে আরও লেখা ছিল।

The Indian bourgeosie, instead of being kept down as a potential rival, will be granted partnership in the economic development of the Country under the hegemony of Imperial finance. From a backward agricultural colonial possession, India will become a modern Industrial Country, a member of the British common wealth of free nations.

ভারতে উপনিবেশ উৎখাতের জন্য পরাধানতার অবস্থা থেকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসে পৌছুবার পথকে মেনে নিতে হবে। ভারতীয় বুর্জোয়াদের শক্তিশালী প্রতিযোগী করে নীচে ফেলে রাখার পরিবর্তে, তাদের দেশের আর্থিক অগ্রগতির অংশীদার করে নিতে হবে। তাদের পেছনে সাম্রাজবাদীর আর্থিক সাহায্য থাকতে পারে।

একটা অনঅগ্রসর কৃষি প্রধান উপনিবেশ থেকে ভারতকে আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ দেশ করতে হবে,—সে স্বাধীন জাতি সমূহের মধ্যে বৃটিশ কমনওয়েলথের সভ্য হবে।

কমরেড কুসিনেন টেবিল চাপড়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন।

রায়ের চীনা-নীতি আর ভারত-নীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত। উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সামঞ্জস্য হীন। কোন মতে সমর্থন করা যায় না।

অতএব কমরেড এম, এন, রায়। চীনা বিপর্যয়ের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী। রায়ের কোন কু-মতলব ছিল।

পার্টির সব প্রবীণ নেতাদের; ষ্টালিন কৌশলে হাত করেছেন।

শক্তি সংগ্রহের খেলা চলছে। অপ্রয়োজনীয় কমরেডদের বিদায় দেওয়া হচ্ছে। কোন নীতি বা যুক্তির বালাই নেই। মারি অরি পারি যে কৌশলে।

দলের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। প্রত্যেককে ছলে-বলে ও কৌশলে বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। কারও সম্মান হানি করা হচ্ছে। কাকে হত্যা করা হচ্ছে। সেই নীতি অনুসারে, ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে, ট্রটস্কি ও জিনোভিফ্‌কে পার্টি থেকে বিদায় দেওয়া হোল।

ষ্টালিন সর্বশক্তিমান।

রায়ের পক্ষে কথা বলবেন কে? কেউ সাহস পেলেন না। রায়কে পার্টি থেকে বিনা প্রতিবাদে বহিষ্কৃত করা হোল। তাঁকে চোরের মত রাশিয়া থেকে পালাতে হোল।

সম্মানের শীর্ষ থেকে; একেবারে রাস্তার নর্দামায়। গৃহকোণ থেকে আবর্জনা স্তূপে। প্রাসাদ থেকে অন্ধ কূপে।

ক্রেমলিন প্রাসাদ। বড় বড় নেতাদের ছবি টাঙ্গান। বিরাট বিরাট ছবি।

লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্টালিন, এম, এন, রায়। কোন নেতাই বাদ নেই। ক্রেমলিন প্রাসাদের করিডোরে। ঢুকলেই চোখে পড়বে; থরে থরে ছবি সাজান।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার মাত্র ক'ঘণ্টা পর। রায়ের ছবি নামিয়ে নেওয়া হোল।

তারপর আরম্ভ হোল। রায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার।

রায় রোগ শয্যায় শুয়ে আছেন।

নার্স বললেন,—ডাক্তারকে ফোন করলাম। তিনি আসতে চাইছেন না।

রায় তখনই বুঝলেন। রাশিয়ার চেকা পুলিশের ভয়। কোন ডাক্তার আসতে সাহস পাচ্ছে না। তিনি এখন অবাঞ্ছিত।

প্রকাশ্যে সবাই রায়কে ত্যাগ করেছে।

রায়ের কয়েকজন বিশ্বস্ত রুশ বন্ধু ছিলেন।

তারা প্রভাবশালী ও বন্ধু বৎসল।

তাঁরা অত্যন্ত গোপনে রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন।

কমরেড রায়, আপনাকে রাশিয়া ছাড়তে হবে। অবিলম্বে পালাতে হবে। নতুবা আপনার জীবন বিপন্ন।

কোথায় যাব ?

আমরা বার্লিনের বন্ধুদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি। সেখানে গোপন নামে আপনি যাবেন। সব ঠিক আছে। যাতে সন্দেহ না করে; চেকা পুলিশ। তার ব্যবস্থা করেছি।

তার পরদিন বিকেল।

একখানা আম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল। পীড়িত, দুর্বল ও অশক্ত রায়। একখানা ষ্ট্রেচারে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হোল। রুগী যাচ্ছে।

চেকা পুলিশ কোন সন্দেহ বা আপত্তি করলো না।

কৌশলে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রায়কে রুশ সীমান্ত পার করে দেওয়া হোল।

রায় অতি কষ্টে জার্মানীতে পৌছুলেন।

জার্মানীর কমিউনিষ্ট বন্ধুরা। রায়কে বার্লিন নিয়ে গেলেন। সেখানে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত হোল। ধীরে ধীরে রায় সম্পূর্ণ নিরাময় হোলেন। আবার সবল ও সুস্থ মানুষ।

কোমিনটার্ণের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস :

১৯২৮ সালের মাঝা মাঝি।

রায় জার্মানীতে চলে এসেছেন।

শুনলেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কোমিনটার্ণের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন। মস্কোতে বসবে।

তখন ষ্টালিন রাশিয়ার সর্বময় কর্তা। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার, কারও সাহস নেই।

সবাই ভীত। প্রাণ ভয়ে অস্থির।

রায়ের এক পুরাতন বন্ধু। গোপনে খবর দিলেন।

৬ষ্ঠ কংগ্রেস। খোলাখুলি ভাবে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সে প্রস্তাব বুর্জোয়াদের অনুকূলে। আপনার চীনা-নীতি পরিত্যক্ত।

কংগ্রেস আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোন বিরোধী মত সহ্য করা হবে না। নির্মম ভাবে দমন করা হবে।

কমিউনিষ্ট বন্ধুটি আরও খবর দিলেন।

১৯২৬ সালে যে নীতির জন্য আপনি প্রশংসা পেয়েছিলেন; ১৯২৮ সালে সেই একই নীতির জন্য আপনি প্রকাশ্যে ধিক্কৃত হয়েছেন।

ইহা অদৃষ্টের পরিহাস বইত নয়।

রায় ভাবতে বসলেন।

আজ বিশ্বের দুর্দিন। কার্লমার্কসের স্বপ্নের বুঝি মৃত্যু ঘটবে? Death of a dream! না, তা হতে দেব না।

রায় কলম ধরলেন।

লিখলেন ক্ষুরধার প্রবন্ধ। ১৯২৯ সালে তা প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন। Crisis in Comintern.

ধারাবাহিক ভাবে লিখছেন। প্রকাশ হচ্ছে পার্টির কাগজে। হঠাৎ ষ্টালিনের দৃষ্টিতে পড়লো। তিনি জোর করে রায়ের সব লেখা বন্ধ করে দিলেন। পার্টির কোন কাগজে রায়ের লেখা আর ছাপা হবে না।

রায় অসহায়।

কিন্তু তাঁর জীবনে নৈরাশ্য আর পরাভব বলে কিছু নেই।

একাই কলম চালিয়ে গেলেন। অসহায় অবস্থা। একাকী স্বীয় মত। জোরের সঙ্গে প্রচার করে যেতে লাগলেন।

রায় জার্মানীতে বসে কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক লিখলেন। তার মধ্যে,—

Revolution and counter Revolution in Russia,

অতি মূল্যবান রচনা। পাণ্ডিত্য পূর্ণ পুস্তক। বইখানি সে যুগে শিহরণ সৃষ্টি করেছিল। রুশ সরকার তার প্রচার বন্ধ করেন।

চীনের ব্যাপারে অনেকে রায়কে ভুল বুঝেছেন।

ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর। রায় মাঝে মাঝে প্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকতেন। বহু সাংবাদিক জানতে চাইতেন। কেন আপনি কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়লেন ?

একদিন উত্তর পাড়ায়; অমর চ্যাটার্জীর বাড়ীতে এই কথাই উঠলো।

কথা প্রসঙ্গে রায় বললেন।

অমরদা, চীনের ব্যাপারে; সবাই আমাকে ভুল বুঝলো।

অমর চ্যাটার্জী হাসতে হাসতে বললেন।

আচ্ছা, ভেতরের ব্যাপারটা কি ?

রায় গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন।

আমি চীনে কি করতে চেয়েছিলাম। তার ইতিহাস শুনুন। সব বুঝতে পারবেন।

১৯২২ সাল থেকে; চীনের রাজ-নৈতিক অবস্থা; চীনের বিপ্লবী আন্দোলন; এ সবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

চীনের কিয়ো-মিং-টাং দল। সান-ইয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন রাজ-নৈতিক দল। চীনের অধিক সংখ্যক ধনী-ভূ-স্বামী। সমরনায়ক আর বুর্জোয়া। এই দলে এসে যোগ দেন।

১৯২০ সালে চীনে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। অত্যন্ত গোপনে তারা কাজ আরম্ভ করেন। তাদের সদস্য সংখ্যা তখন মাত্র ৯৫৩ জন।

কিয়ো-মিং-টাং দল প্রথম থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টিকে পছন্দ করতেন না।

১৯২৪ সালে; সান-ইয়াৎ-সেন কাণ্টনে কতকগুলো বক্তৃতা দেন। তাতে চীনা বিপ্লবের তিনটি নীতি ঘোষণা করেন।

মিন্-স্থ, মিন্-চুয়ান, মিন্-সেং।

তার মানে হোল।

জনগণের জাতীয়তা, জন-গণের সার্বভৌমত্ব, জন-গণের জীবন-যাত্রা।

সান-ইয়াৎ-সেনের এই বৈপ্লবিক ডাকে; বহু কৃষক আকৃষ্ট হলেও; তারা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টির সভ্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। এটাই চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়ার কথা।

কিন্তু দুঃখের কথা।

১৯২৫ সালে প্রতিক্রিয়াশীল কিয়ো-মিং-টাং দল। চীনা কমিউনিষ্ট; বিশেষ কৃষকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়।

হাজার হাজার কৃষককে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। গ্রামে গ্রামে হত্যার তাণ্ডব লীলা চলতে থাকে। রক্তের নদী নালা বয়ে যায়। তার ইঙ্গিত আগেই করেছি।

বিপ্লবের চাকা পেছিয়ে গেল। সব অন্ধকার!

১৯২৬ সালের শেষের দিকে। আমাকে রুশ ডেলিগেশনের প্রধান করে; চীনে পাঠান হোল।

আমি কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের কাছে; আমার বক্তব্য রাখলাম। পার্টি তা সমর্থন করলেন।

তখন চীনা বিপ্লবের খুব দুর্দ্দিন।

আমার সে সময়কার অভিজ্ঞতা,—My experience in China নামক পুস্তকে লিখেছি।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা, কৃষি-বিপ্লবকে রূপায়িত করতে ভয় পেলেন।

এই সব বুঝে ; আমি চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটা পরিকল্পনা দিলাম।

উহান সরকারের মধ্যে ; কিছু সংখ্যক কমিউনিষ্ট সদস্য ছিলেন। আমি তাদের বল্লাম,—আপনারা কৃষি বিপ্লব আরম্ভ করুন।

কিন্তু আমার কমিউনিষ্ট বন্ধুরা। তাও গ্রহণ করলেন না। বাধা দিলেন। সবাই অন্ধ। কেউ দেখতে পেলেন না।

আমি তখন উহান সরকারের কৃষি মন্ত্রী ; টাং-পিং-সানকে বোঝালাম। বললাম,—গ্রাম্য কৃষক-ইউনিয়ন গুলোকে ক্ষমতা দিন। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠুক। গ্রাম্য সোভিয়েট। তারাই হবে লাল-ফৌজ।

কিছুই করতে পারলাম না। সবাই বাধা দিলেন।

আমার মনে হোল।

চীনের কিয়ো-মিং-টাং আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এক খাঁচার পাখী।

আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু মাও-সে-তুং দেখতে পেলেন। তিনি পথ ভুল করলেন না। তিনি এগিয়ে এলেন।

১৯২৭ সাল। তখন তিনি ফেডারেশন অব কৃষক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।

তিনি দেখলেন।

কৃষক ও শ্রমিককে রক্ষা করতে হলে ; লাল-ফৌজ গড়তে হবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই। ভয় পেলে চলবে না।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাস।

মাও-সে-তুং লাল-ফৌজ গড়লেন। অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বন্ধু চু-তে। তাকে বললেন,—তুমি হবে, লাল-ফৌজের জেনারেল।

মাও-সে-তুং নিজে হলেন। রাজনৈতিক নেতা। চিং-কিন-সানে হলো তাঁদের প্রধান কার্যালয়।

বিপ্লবী কৃষক চু-তের দলে যোগ দিলেন। সংখ্যায় দু'হাজার। লাল-ফৌজ গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। বহু ধনী জমিদারের জমি দখল করলেন। ভূমিহীন চাষী। তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন, সেই সব জমি।

তবু চীনের জনগণ, লাল-ফৌজকে ভুল বুঝলো। গ্রামের মানুষ তাদের সমর্থন করলো না। তারা বললেন,—লাল-ফৌজ হোল। একদল বোম্বেটে। লুট পাট করাই তাদের পেশা। মাও দমলেন না।

লাল-ফৌজের না আছে অস্ত্র। না আছে অর্থ। তারপর চীনের প্রচণ্ড শীত। লাল-ফৌজ বরফে জমে যাচ্ছে। সে এক দুর্দিন।

দুর্ধর্ষ জাতীয়তাবাদী সমর নায়ক। চ্যাং-সো-লিন। অমিত বিক্রমে আক্রমণ করলো। লাল-ফৌজ দাঁড়াতে পারলো না। পিপড়ের মত মরতে লাগলো। তবু তাদের মনোবল অটুট।

বিপ্লবকে ধ্বংস করা গেল না।

এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল।

কিয়াং-সি প্রদেশ। রাতের অন্ধকার। দুর্যোগ রাত্রি। লাল-ফৌজ অতর্কিতে আক্রমণ করলো; কিয়ো-মিং-টাং সৈন্যদলকে।

রাত্রে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। জাতীয় সরকারের সৈন্যদল। শিবিরে আরাম করছিল।

অতর্কিতে আক্রমণ।

লাল ফৌজের না আছে অস্ত্র। না আছে রণ-সম্ভার। সম্বল গাছের ডাল। আর পাথর। আর সম্বল অটুট মনোবল— ইনক্লাব জীন্দাবাদ।

Long live Revolution.

জাতীয় সৈন্যদল। হত-চকিত। আশ্চর্য। তাদের পরাজয় ঘটলো। সবাই পালাল রাতের অন্ধকারে!!

লাল-ফৌজ দুর্দাম জল-স্রোতের মত এগিয়ে গেল। সে প্রলয় জল-তরঙ্গ রোধ করা গেল না। সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

হোনান, হিউনান প্রদেশ। লাল-ফৌজ অধিকার করলো। শক্ত ঘাটি বাধলো। বিপ্লবের চাকা ঘুরে গেল।

মাও-সে-তুং ক্ষমতায় বসলেন।

এদিকে কি মজা হোল শুনুন।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির ৬ষ্ট কংগ্রেস বসেছে। মস্কো শহরে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা, সেই সভায় লাল-ফৌজের; প্রকাশ্যে তীব্র নিন্দা করলেন।

মাও-সে-তুং তা গ্রাহ্য করলেন না।

তাঁকে চীনা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রধান বলে ঘোষণা করা হোল।

১৯৩৭ সালের মে মাসে; মাও-সে-তুং চীনা-সোভিয়েট সরকারের নীতি ঘোষণা করলেন,—সর্বনিম্ন সময়োপযোগী দাবী।

We are for passing through all necessary stages of democratic republic to reach Socialism.

আমরা গণ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সমাজ-তন্ত্রে পৌছুবার পক্ষপাতী।

এইবার রায় বললেন।

আমি চীনে এই পথে যেতে চেয়েছিলাম। আমি রাতারাতি আকাশে ঘর বাঁধতে চাইনি। বিপ্লবকে ভুল পথ থেকে; ঠিক পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। এখন বলুন। কি আমার অপরাধ?

অমরদা ম্লান মুখে বললেন।

যে সবার আগে দেখতে পায়; তাকেই লোকে ভুল বোঝে।

ভুলে গেলে,—কমলে কামিনী গল্পটা। শ্রীমন্তকে মশানে যেতে হয়নি!

এলেন গটস্ চক্ :

১৯২৫ সাল ; বার্লিন।

জার্মান পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ; গোপন পথে রায় যাওয়া আসা করেন। জার্মানী তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র।

জার্মানীতে কমিউনিষ্ট পার্টির এক সভা হবে। রায় গোপনে যোগ দিয়েছেন। বহু বিপ্লবীর সমাবেশ।

রায় সেই সভায় মার্কসবাদের ওপর বক্তৃতা দেবেন।

পার্টি সদস্যরা অনেকেই উপস্থিত। যথারীতি বক্তৃতা চলছে।

রায় বক্তৃতা দেবার সময়, রোজই লক্ষ্য করেন। একটি মেয়েকে।

মেয়েটি প্রত্যহ ঠিক সময়ে সভায় উপস্থিত থাকেন।

আর অত্যন্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ; রায়ের বক্তৃতার প্রতিটি কথা ; সর্টহ্যাণ্ডে নোট নেন।

তারপর রায়ের বক্তৃতার পুরো রিপোর্ট ; সুন্দর করে টাইপ করেন। পরে সেই টাইপ-কপি পার্টির নেতা ব্রাণ্ডালারের হাতে পৌছে দেন।

এমনি একটা টাইপ রিপোর্ট। রায়ের হাতে এল। রায় পড়ে দেখলেন। তাঁর বক্তৃতার নির্ভুল রিপোর্ট। সুন্দর সাদা কাগজে, চমৎকার করে টাইপ করা হয়েছে।

রায় মুগ্ধ হোলেন। বক্তৃতার রিপোর্টগুলি পেয়ে। মেয়েটি রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

সুন্দর চেহারা। স্বাস্থ্যবতী ; বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জল।

একদিন বক্তৃতার পর। মেয়েটির সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট ও নির্ভুল টাইপের রায় প্রশংসা করলেন।

মেয়েটি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

পরে কমরেড নিউম্যানের কাছ থেকে, মেয়েটির সব খবর নিলেন।

কমরেড নিউ-ম্যান বললেন।

মেয়েটির নাম, এলেন গটস্‌চক্‌। এর বাবা আমেরিকান। মা জার্মান। এর জন্ম হয় ফরাসী দেশে। বাল্যকাল ফরাসী দেশেই কেটেছে।

নিউম্যান আরও বললেন।

এলেন জার্মানীতে পড়াশুনা করেন। বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক। আমাদের পার্টির, একজন উৎসাহী কর্মী।

রায় সব শুনলেন।

আস্তে আস্তে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হোল। মার্কসীয় দর্শনের প্রতি মেয়েটির অবিচলিত নিষ্ঠা।

উভয় উভয়কে বুঝতে চেষ্টা করলেন।

রায় তাঁর লেখা; কতকগুলি বই আর প্রবন্ধ; এলেনকে পড়তে দিলেন।

বইগুলি পেয়ে, এলেনের খুব আনন্দ। মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন। রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাড়ী ফিরেই; চায়ের টেবিলে বসে; এলেন পড়তে আরম্ভ করলেন। সামনে ধূমায়িত চা।

কিছুক্ষণ পরে এলেনের মা উপস্থিত। দেখলেন চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে। মেয়ের সেদিকে দৃষ্টি নেই। কি একখানা বই পড়ছে। চোখে জ্বলন্ত মনোযোগ।

মা এসে অনুযোগের সুরে বললেন।

কিরে? চা যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল। এই প্রচণ্ড শীত। আর তুই পড়ছিস্‌। কি বই ওটা?

মা, এই প্রবন্ধগুলি। কমরেড এম, এন, রায়ের লেখা। মার্কসীয় দর্শন। সহজ ও সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। একটা পাঁচ বছরের মেয়ে পর্যন্ত বুঝতে পারবে।

কমরেড এম, এন, রায় আবার কে?

তিনি একজন ভারতীয় বিপ্লবী। ইনি মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কাজে দেখে। লেনিন পর্যন্ত মুগ্ধ হন। লেনিন তাঁকে রাশিয়ায় নিয়ে এসেছেন। এখন তিনি একজন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা।

তাই নাকি রে?

হ্যাঁ মা, মহা-পণ্ডিত লোক। সর্বহারা বঞ্চিত মানুষের দরদি বন্ধু! একটা বিরাট মানুষ। বহু ভাষা জানেন। জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত।

মা আশ্চর্য হোলেন।

একদিন সকালে রায়ের হোটেলে, এলেন এসে হাজির। রায় তখন জার্মানীতে অজ্ঞাত বাস করছেন।

এলেনকে দেখে খুশী হোলেন। হেসে রায় বললেন,—আমি এখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। জার্মান সরকার সংবাদ পেলে, আমাকে বন্দী করবে।

তাই বলে কোন বাধা; আমাদের মানলে চলবে না। আমাদের ব্রত বিশ্বে কমিউনিজম প্রচার।

বিশ্বের সর্বহারা বঞ্চিতের মুখে, হাসি ফোটাতে হবে। তাদের আর্থিক মুক্তি এনে দিতে হবে। সর্ব বন্ধন ভয় ছিন্ন করতে হবে। মানুষই আমাদের ভগবান।

এলেন রায়ের কথা শুনে মুগ্ধ।

তিনি রায়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন। সেই আদর্শ মানুষটিকে। যাকে তাঁর তৃষিত অন্তর নিরন্তর চাইছিলো।

এলেন ভাবলেন।

কথায় কি আত্মীয়তার সুর। ব্যবহার কি মিষ্ট। পাণ্ডিত্যে অপরাজেয়। অথচ কি নিরভিমানী। লেনিনের স্নেহের পাত্র। আশ্চর্য লাগে।

তার কয়েক দিন পরের কথা।

হঠাৎ এলেন এসে উপস্থিত।

চোখ মুখ শুকনো। কি যেন সমস্ত রাত ভেবেছেন। রাতে ঘুম হয়নি। রায়ের সামনের চেয়ারটায় বসেই বললেন,—

আমাকে আপনার কর্মের সাথী করে নিন। কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

রায় আশ্চর্য।

পারবে তুমি? পারবে আমার সঙ্গে ভারতে কাজ করতে। ভারত হবে। আমার ভবিষ্যৎ কর্ম-ক্ষেত্র। সব ত্যাগ করতে হবে। দুঃখ, দারিদ্র হবে তোমার নিত্য সাথী। পারবে?

এলেন সংকল্পে অবিচলিত।

পারবো।

রায় এলেনের মুখের দিকে তাকালেন। ভাল করে দেখলেন। সে মুখ। যেন দেখতে পেলেন। তার অন্তরের ছবি। বুঝলেন অন্য ধাতুতে এলেন তৈরী।

হেসে বললেন।

তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

১৯২৭—১৯২৮ সাল।

চীনে বিপর্যয় ঘটে গেল। শেষ পর্যন্ত রায় কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে, বিতাড়িত হোলেন।

সম্মানের শীর্ষ থেকে ধূলায় লুণ্ঠিত। প্রচারের বিভ্রান্তির ফলে; সবাই রায়কে ভুল বুঝলো।

সেই সময় সময় রায় গুরুতর পীড়িত।

বন্ধুদের সাহায্যে, কোন মতে লুকিয়ে জার্মানীতে পালিয়ে এসেছেন।

এখানেও বিপদ। পাছে জার্মান কর্তৃপক্ষ খবর পায়। তাহলে রক্ষা নেই।

তাই রায়কে গোপনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। কিন্তু সেবা করবে কে? রোগ-শয্যার পাশে থাকবে কে? রোগী উত্থান-শক্তি রোহিত। বিশ্বস্ত নার্স চাই।

খবর গেল। এলেনের কাছে।

ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। একেবারে রোগ-শয্যার পাশে।

আহার-নিদ্রা ভুলে গেলেন। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। এই ভাবে চললো। রুগীর ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, রায়কে রোগ-মুক্ত করলেন এলেন।

স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। সে এক অদ্ভুত সাধনা। রায়ের রোগ-শয্যার পাশে। সর্বদা এলেন উপস্থিত। রায় মুগ্ধ হোলেন। এলেনের সেবা করার শক্তি দেখে। কে বলবে বিদেশী মেয়ে। বাঙ্গালী ঘরের পতিব্রতা স্ত্রী। হার মানবে।

এলেনের অন্তরের সৌন্দর্যে রায় অভিভূত।

সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন। তবু এলেন চোখে চোখে রেখেছেন।

হাসতে হাসতে রায় একদিন বললেন,—এ যাত্রা তোমার নার্সিংএ বেঁচে উঠলাম। যেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। সেবায় কোন ফাঁক নেই।

তাহলে বল—The lady with the lamp.

সত্যিই তাই।

রায় একজন সঙ্গিনী খুঁজছিলেন। সব সময় তাঁর পাশে থাকবে। সুখে-দুঃখে। বিপদে-সম্পদে। এলেনের মধ্যে তার সন্ধান পেলেন।

বিয়ের কথা হোল।

রায় বললেন,—এখনও সময় হয় নি। আমাকে ভারতে ফিরতে হবে। দেশের সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে। ততদিন কি তুমি অপেক্ষা করতে পারবে?

দেশের ফেরবার আগের দিন।

বার্লিনের একটা হোটেলে তাঁরা দুজন বসে। এই সব কথা হচ্ছিল।

এলেন বললেন,—বেশ, তাই হোক। আমি তোমার জন্ম দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করবো।

শেষ পর্যন্ত। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাঁদের ভারতে বিয়ে হয়।

দেরাদুনে ১৩ নং মোহিনী রোডের বাড়ী। সেখানে তাঁরা থাকতেন।

রায়ের মৃত্যুর পর। দীর্ঘ ছ'বছর। এলেন একাই সেই বাড়ীতে থাকতেন।

১৯৬০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর।

গভীর রাত্রে। নির্মম আততায়ীর হস্তে; এলেনের জীবনাবসান হোল। অত্যন্ত নিষ্ঠুর সে হত্যা।

অনেকে সন্দেহ করেন। এলেনের মৃত্যুর সঙ্গে; কোন রাজনৈতিক দলের বা বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্র ছিল।

এ সম্পর্কে কলিকাতার লোকসেবক নামক দৈনিক পত্রিকা; ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা বলেন।

তাঁরা বলেন,—দেরাদুন সার্ভে অফিসে সন্দেহজনক অবস্থায় আগুন লেগে যায়। এলেনের কাছে খবর আসে। এই আগুন লাগার পেছনে। কোন গভীর ষড়যন্ত্র লুকোন আছে। তিনি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরকে সতর্ক করে দেন। হয়ত এই কারণে এলেনকে হত্যা করা হয়।

পুলিশ আততায়ী সন্দেহে দু'জন যুবককে গ্রেপ্তার করে।

জেলা জজের বিচারে তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপিলে তারা খালাস পায়।

রায়ের মৃত্যুর পর।

এলেনের ভাই চিঠি লেখেন।

আমেরিকায় চলে এস। কষ্ট করে ভারতে থাকবার প্রয়োজন কি।

এলেন সে কথা গ্রাহ্য করেন নি।

হিন্দু বিধবার মত। তিনি স্বামীগৃহকেই আপন গৃহ করে গেছেন। দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতেন।

অগ্নিযুগের প্রবীন জননায়ক। উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় আদর করে; এলেনকে বলতেন,—আমাদের অরুণধ্‌তি।

রায়ের প্রতি এলেনের ভালবাসা। কত সুগভীর; কত অতল-স্পর্শী। তা তাঁর দু'টি কথা থেকে বোঝা যাবে।

রায়ের মৃত্যু বার্ষিকি।

এলেনের অতি পরিচিত কাগজের এক সম্পাদক চিঠি লিখলেন।

রায়ের মৃত্যু বার্ষিকিতে একটা বাণী পাঠাতে হবে।

এলেন উত্তর লিখলেন।

আমার কাছ থেকে একটা বাণী চেয়েছ। আজ কেন? প্রত্যেক দিন আমার শোকের দিন। তাঁর কথা হোল।

Not to-day, but everyday is my day of mourning.

আমাকে ভারতে ফিরতে হবে :

১৯২৮-১৯২৯ সাল। এম, এন, রায় মস্কো থেকে; জার্মানীতে পালিয়ে এসেছেন। জার্মানী এখন তাঁর কাছে নিরাপদ।

কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে; তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। তিনি সম্পূর্ণ একা ও অসহায়।

সেই সময় ইউরোপের একদল লোক। তাদের মধ্যে টিটো প্রধান। ষ্টালিনের বর্তমান নীতির সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাঁরা ৬ষ্ট কংগ্রেসে গৃহীত নীতির, বিরোধীতা করলেন।

তাঁদের মধ্যে একদল। রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা

বললেন,—ইউরোপে একটা আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করা দরকার। আপনার নেতৃত্ব চাই।

রায় উত্তর দিলেন।

আমি ভারতে ফিরে যাচ্ছি। দেশে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনারা কাজ চালিয়ে যান। আমার সমর্থন আছে।

ভারতে ফিরবার কয়েক মাস পূর্বে। বার্লিনের এক হোটেল। একটা ঘরোয়া বৈঠক বসেছে। সবাই বলছেন,—দেশে এখন ফিরলে; ভুল করবেন। আপনি ফেরারী আসামী। আজও রাজ-রোষ উদ্যত। ভারতের মাটিতে পা দেবেন; অমনি পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। তখন কারাগারের অন্ধকার সেলে; চির জীবন বাস। আর না হয় ফাঁসী কাঠ।

রায় হেসে উত্তর দিলেন।

ঠিকই, পুলিশ আমাকে ধরতে পারলে; সহজে রেহাই দেবে না। কিন্তু সেই ভয়ে, কি করে চুপ করে বসে থাকবো? ইউরোপে বসে; কিভাবে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন চালাব?

গোপন পথে; ষড়যন্ত্র চক্রান্ত বা খানিকটা প্রচার কাজ চলতে পারে। কিন্তু মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৈপ্লবিক ভাবধারাকে; নতুন পথে সঞ্চারিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সেজন্য চাই গণ-সংযোগ।

গণ-সংযোগ। গোপনে ও নিষিদ্ধ পথে হয় না। আমাকে দাঁড়াতে হবে। সবার সাথে—রাজপথে। প্রকাশ্যে, মুখোমুখি হয়ে। হবে আলাপ-আলোচনা। হবে তর্ক-বিতর্ক। দেশের সমস্যা আর তার প্রতিকারের পথ। খুঁজে বার করতে হবে।

সুতরাং আমাকে জেলে যেতেই হবে। অবশ্য চেষ্টা করবো। যেন ভারতে পৌছেই ধরা না পড়ি।

আর যে কটা দিন; বাইরে থাকবার সুযোগ পাব। দেশের যুবক ও কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ। আর সুচিন্তিত ভাবধারা। ছড়িয়ে দিয়ে যাব। এটা হবে আমার প্রাথমিক কাজ।

একটা বিপদের ঝুকি। আমাকে ঘাড়ে নিতেই হবে। অন্য রাস্তা নেই। বিপ্লবীকে ভয় পেলে চলবে না।

বন্ধুরা একটু ভেবে বললেন,—তবে তাই হোক।

তার কয়েকদিন পর। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে একখানা চিঠি পেলেন। তাঁর বইয়ের প্রকাশক লিখেছেন।

শুনে আনন্দিত হবেন।

আপনার বই। Revolution and Counter Revolution in China. ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়; মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচনা করেছেন। এর সঙ্গে একখানা চেক পাঠালাম। সাতশো পাউণ্ড। আপনার রয়ালটি। ধন্যবাদ।

বইখানি ১৯৩০ সালে ছাপা হয়। এই মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইখানি। মূল জার্মান ভাষায় লেখা। বইখানি সমগ্র জার্মানীতে; একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, রায়কে ডক্টরেট গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রায় তখন ভারতের বুকে।

বই লিখে। যে সামান্য ক'টি টাকা রয়ালটি পেলেন। তাই হোল,—রায়ের পাথেয়। এই সম্বল করে; রায় ভারতের পথে পা বাড়ালেন।

এবার ছদ্মনাম। ডক্টর মামুদ। পকেটে এক জাল পাশ পোর্ট। সম্বল বইয়ের রয়ালটির বাবদ ক'টি টাকা।

১৯৩০ সাল, ৩০সে ডিসেম্বর।

ডক্টর মামুদ এক উজ্জ্বল প্রভাতে; করাচী বন্দরে অবতীর্ণ হোলেন।

পুলিশ ও কাষ্টমস্। তাদের বেড়াজাল। সহজেই ডিঙিয়ে এলেন। হাজার যাত্রী। সবার সঙ্গে মিশে; কথা বলতে বলতে জাহাজ থেকে নামলেন। হাসি হাসি মুখ। সে মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর। স্বর্গাদপি গরিয়সী। প্রিয় জন্ম-ভূমির কোলে। ফিরে এলেন।

কেউ সন্দেহ করলো না। কেউ চিনলোনা, ডক্টর মামুদকে।

এবার সোজা রেলপথ ধরলেন। করাচী থেকে বরাবর বোম্বাই। নতুন পরিবেশ। নতুন মানুষ।

ডক্টর মামুদ চিন্তায় বিভোর। একমাত্র চিন্তা। জনগণের মুক্তি। তার উপায় নির্ধারণ।

ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা। এস, মুকুন্দলাল। তখন বোম্বাই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ডক্টর মামুদের ; একদিন পথে আলাপ হোল।

ডক্টর মামুদ তাঁর মুখে শুনলেন।

নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন। এবার হবে কলকাতায়। সুভাষচন্দ্র বসু হবেন সভাপতি।

মুকুন্দলাল আরও বললেন।

শ্রমিক ফ্রণ্টে ; জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টরা। আজও এক সঙ্গে কাজ করছেন।

কোন অসুবিধা হচ্ছেনা ? প্রশ্ন করলেন ডক্টর মামুদ।

মাঝে মাঝে নীতিগত বিরোধ হচ্ছে বই কি।

ডঃ মামুদ তখন জেনে নিলেন। ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকের ওপর ; ট্রেড-ইউনিয়নের প্রভাব।

ক্রমশঃ আলাপ হোল।

বোম্বায়ের অনুসূয়া প্যাটেল, এন, এম, যোশী, গুলজারি লাল নন্দা, ইন্দুলাল ; আরও অনেকের সঙ্গে।

ডঃ মামুদ তাদের বললেন।

শ্রমিক আন্দোলনকে ; সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালিত করুন। তবেই ত জনগণের কল্যাণ হবে।

ডঃ মামুদ তখন একটা স্কিম দিলেন।

শ্রমিক আন্দোলনের মূল-নীতি। এই নামে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। বোম্বায়ের বহু ট্রেড-ইউনিয়ন। এই ইস্তাহার সমর্থন করলেন।

বহু উৎসাহী কর্মী। আর রাজনৈতিক নেতা; পাশে এসে দাঁড়ালেন।

সকলেই কথা বলে বুঝ্‌লেন।

ডক্টর মামুদ একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। ট্রেড-ইউনিয়ন সম্বন্ধে; তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সুগভীর। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ।

সবাই একটু অবাক হোলেন।

এইরকম প্রতিভাবান মানুষ। সচরাচর ত চোখে পড়েনা। হঠাৎ কোথা থেকে এলেন? ভাববার কথা!

সুভাষ-সকাশে ঃ

বোম্বাই শহরে; আর তার আশে পাশে; ডঃ মামুদ কয়েক সপ্তাহ কাটালেন।

এবার যাত্রা করলেন। কলকাতা অভিমুখে। কলকাতা মেল। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে গেলেন। সেই চির পরিচিত হাওড়া ষ্টেশন। মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল,—নমঃ নমঃ নমঃ, সুন্দরী মম, জননী বঙ্গভূমি।

এই সেই মহানগরী কলকাতা। গঙ্গার অপূর্ব শোভা-সৌন্দর্য! চোখ জুড়িয়ে গেল। ট্যাক্‌সি ষ্টাণ্ড। সারি সারি ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে আছে। একটায় চড়ে বসলেন। ট্যাক্‌সি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো। দক্ষিণ মুখে। ভবানীপুরের দিকে। গন্তব্যস্থল ৩৮।১ এলগিন রোড।

কতদিন পরে তিনি কলকাতা এলেন। তাঁর স্বপ্নের কলকাতা। আদরের কলকাতা। বিপ্লবী জীবনের কর্মক্ষেত্র কলকাতা। এক পুলক শিহরণ। মনকে আচ্ছন্ন করলো। এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। কলকাতা যেন দুবাহু মেলে; আদর করে; হারান সন্তানকে বুকে

টেনে নিল। কলকাতার জনগণকে দু'হাত তুলে মনে মনে নমস্কার করলেন। হেথায় দাঁড়ায়ে, দু বাহু বাড়ায়ে, নমি নর-দেবতায়।*

ডঃ মামুদের বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস। কেমনে তাঁর অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল।

সুভাষ চন্দ্র বাড়ীতেই ছিলেন।

সাহেবী পোষাক পরা; ছ' ফুটের ওপর লম্বা, এক বিরাট পুরুষ। লম্বা পা ফেলে। ঘরে প্রবেশ করলেন।

সুভাষ চন্দ্র বিস্মিত।

আগন্তুকের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। সম্পূর্ণ অপরিচিত। এক মানুষ। অথচ চোখ ফেরান যায়না।

আপনি? আগন্তুক খুব আস্তে; চাপা গলায় বললেন। আমি এম, এন, রায়।

এম, এন, রায়? সুভাষ চন্দ্র লাফিয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশর্যে জড়িয়ে ধরলেন।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। তাহলে, এতদিন পরে। পরাধীন ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে, সেই রোমাঞ্চকর যোদ্ধার সন্ধান পাওয়া গেল!

পাশেই একটা ঘর। রায়কে সুভাষ সাদরে আহ্বান করলেন,— চলুন পাশের ঘরে গিয়ে বসি।

তখন নিরিবিলিতে; দুই বিপ্লবী; আলাপ শুরু করলেন। দু'জনের জীবন-নাট্য রোমাঞ্চকর। অলৌকিক ঘটনাবলির সমষ্টি।

আপনি আপাততঃ কলকাতায় থাকুন। ভারতীয় রাজ-নীতির সঙ্গে পরিচিত হোন।

রায় বললেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির একটা খসড়া আমাকে দেবেন। আমি পরিচিত হতে চাই। আন্দোলনের গতির সঙ্গে।

এম, এন, রায় কয়েকদিন কলকাতায় থাকলেন। উভয়ে গোপনে অনেক পরামর্শ হোল। রায় একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন।

দুজনার ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা এক।

একদিন সুভাষ বললেন,—এবার সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করুন। প্রথমে যান জহর লালের কাছে। মহাত্মাজী, রাজাজী, সর্দ্দারজী। সবার সঙ্গে দেখা করবেন। এরা আপনাকে জানুন। আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। কোন ধাতুতে আপনি তৈরী।

বেশ, আমি কালই যাব এলাহাবাদ।

জহরলাল খুব গোপনে সংবাদ পেয়েছেন। এম, এন, রায় ভারতে এসেছেন। এলাহাবাদে রায়কে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ১৯২৭ সালে রাশিয়ায় আলাপ হয়েছিল। জহরলালের আত্ম-জীবনীতে; সে কথার উল্লেখ আছে।

জহরলাল খুব সমাদরে; রায়কে বসিয়ে বললেন,—আজ থেকে আপনি আমার অতিথি। এলাহাবাদে কাজ আরম্ভ করুন। আমরা আপনাকে চাই।

এম, এন, রায় মুগ্ধ হোলেন; জহরলাল ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের আত্মীয়তায়।

গেলেন সবরমতি। দেখা হোল। মহাত্মাজীর সঙ্গে।

মহাত্মা বললেন। আপনার লেখা আমি কিছু কিছু পড়েছি। ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি হবে। ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ওপর। আমাদের আদর্শ। ভারতে রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

রায় তর্ক করলেন না। চুপ করে শুনলেন।

সারা ভারত ঘুরলেন।

রাজাজী, সর্দ্দারজী; সবার সঙ্গে দেখা করলেন। বাংলার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও বাদ গেলেন না। অমর চ্যাটার্জী জড়িয়ে ধরলেন।

সবার সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে উঠলো।

সারা ভারতের মধ্যে একটা মিলন সূত্র; নতুন করে খুঁজে পেলেন।

তাঁর মনে হোল।

নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধান;

বিভেদের মাঝে হের মিলন মহান।

পুলিশ ও করাচী কংগ্রেস :

এদিকে পুলিশ সংবাদ পেয়েছে। কমরেড এম, এন, রায় গোপনে ও অজ্ঞাত পথে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন।

সর্বনাশ। পুলিশের মধ্যে অভাবনীয় সাড়া আর চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

দিল্লীর মসনদ টলে উঠলো। বৃটিশ সিংহ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তাদের ঘর বুঝি ভেঙ্গে পড়ে। গেল, গেল, হোল সর্বনাশ। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট। কমরেড এম, এন, রায়। ভারতে ঢুকে পড়েছে ? তাহলে।

ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন। অস্থির হয়ে উঠেছেন। লণ্ডন থেকে ঘন ঘন 'কেবল' আসছে। বড়লাটের রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে এল।

এ যেন দিল্লী প্রাসাদপুটে, হেতা বার বার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে। দিল্লী প্রাসাদপুটে।

ভারতের পুলিশকে হুশিয়ার করে দেওয়া হোল। ঘন ঘন পুলিশি বৈঠক বসতে লাগলো। সাবধান। হুঁসিয়ার।। হও তৈয়ার।।।

কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ। কোথাও বাদ নেই। গোয়েন্দা বিভাগ। আদাজল খেয়ে লেগেছেন। থানায় থানায় হুশিয়া করে দেওয়া হোল।

মানুষটির বর্ণনা পুলিশ মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। ছ' ফুটের ওপর লম্বা। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। দৈহিক গঠন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ। অদ্ভুৎ চেহারা। একবার দেখলে ; আর ভুল হবে না। হাজার লোকের মধ্যে ; খুঁজে নেওয়া যাবে।

কলিকাতা পুলিশের হেড-কোয়াটার্স। ইলিসিয়াম রো। ভারতের স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড। তাঁরাও বিব্রত।

বিশেষ অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। সবাই সচকিত হয়ে উঠেছেন। সবাই হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছেন। দুর্দান্ত রাজদ্রোহী। ধরতে পারা যাচ্ছে না। কোন কিনারা হচ্ছে না।

পুলিশ খবর পেলেন।

কমিউনিষ্ট রায় কলকাতায় এসেছেন।

পুলিশ কলকাতার সর্বত্র জাল ফেললেন। কত রুই কাতলা ধরা পড়লো। কিন্তু আসল মানুষটির কিনারা হোল না। কি মুস্কিল।

পুলিশ নাজেহাল।

ট্রেনে, ট্রামে; গাড়ীতে, নৌকায়; পথে ঘাটে; অলিতে গলিতে। সর্বত্র কড়া নজর। প্রতিটি শহর আর গ্রাম। টিক্‌টিকিতে ছেয়ে গেল। কিন্তু আসল ব্যক্তির হদিস নেই।

এমন সময় পুলিশের কাছে খবর এল।

করাচী কংগ্রেসে রায় উপস্থিত থাকবেন।

পুলিশের কাছে আরও খবর। জহরলাল নেহেরুর বিশেষ আমন্ত্রণে; এম, এন, রায় কবাচী কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

আরও প্রকাশ তিনি নাকি করাচী কংগ্রেসে মৌলিক অধিকারের খসড়া প্রস্তুত করবেন।

তাহলে বাছাধন? এবার যাবে কোথার?

বেঙ্গল পুলিশের সি, আই, ডির বড় কর্তা। প্রখ্যাত নলিনী মজুমদার। ছুটলেন করাচী। সঙ্গে ছোট বড় অসংখ্য পুলিশ অফিসার।

তাছাড়া সারা ভারতের বাছা বাছা পুলিশ। ইয়া-গোঁপ, ইয়া-দাড়ী। পুলিশ অফিসারের দল। সরজমিনে করাচী পৌছে গেলেন।

এই সব নাম করা অভিজ্ঞ পুলিশ বাহিনী। কংগ্রেস-নগর ছেয়ে ফেলেছেন। নানা বেশে, নানা ছলে, ঘুরছেন দিন রাত। তল্লাস-সন্ধান নেওয়া চলছে।

ডেলিগেট শিবির; দর্শক শিবির; ভি, আই, পি শিবির; খাবার ঘর; প্রদর্শনীর অসংখ্য দোকান; সর্বত্র পুলিশের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। যেন মাছিটি পিছলে পালাতে না পারে।

উর্দ্দীপরা পুলিশ, সাদা পোষাকের পুলিশ, বহুরূপী পুলিশ। কেউ বাদ নেই।

কিন্তু হায় !

কিছুই কাজে এল না। তিন দিনের কংগ্রেস। তিন দিন পর ভেঙে গেল। লক্ষ লক্ষ লোকের কংগ্রেস। লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

পুলিশ খবর পেল।

এম, এন, রায় ঠিকই এসেছিলেন।

সকলের সঙ্গে ডায়াসেই বসছিলেন। কংগ্রেসের মৌলিক অধিকারের খসড়া ; তিনিই প্রণয়ন করে গেছেন।

তিন দিনই কংগ্রের প্রকাশ্য অধিবেশনে ; রায় উপস্থিত ছিলেন।

আবার কংগ্রেসের শেষে ; নিঃশব্দে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

দোর্দণ্ড প্রতাপ কলিকাতার পুলিশ। মুখে চুণ-কালি পড়লো।

সার চার্লস টেগার্ট।

কলকাতার বিখ্যাত পুলিশ কমিশনার। তাঁর প্রচণ্ড দম্ভে ; গুরুতর আঘাত লাগলো। তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন !

Oh my goodness !

কংগ্রেস অধিবেশনের পর।

অমর চ্যাটার্জি একদিন রায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

আমার ভারি আশ্চর্য লাগলো। তুমি তিন দিন পুলিশের মধ্যেই অবাধে ঘুরে বেড়ালে। আর পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করলো না। বেশ মজা লাগছিল।

রায় হাসতে হাসতে বললেন।

পুলিশের মধ্যে যে খুব সহজ হোয়ে ঘোরা ফেরা করতে পারে। পুলিশ তাকে সন্দেহ করে না। এটা আমার অভিজ্ঞতা।

বোম্বায়ে এম, এন, রায় গ্রেপ্তার ঃ

ডক্টর মামুদ ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এলেন আমেদাবাদে। শিল্প-কেন্দ্রে নতুন নতুন ইউনিয়ন; গড়ে তুললেন। শ্রমিকদের উৎসাহিত করলেন।

এন, এম, যোশী। ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন আইনের জনক। তাঁর সঙ্গে দেখা হোল। ডক্টর মামুদের। হৃদ্যতার সহিত আলাপ হোল।

ডক্টর মামুদ বললেন

ট্রেড-ইউনিয়ন আইন; সংশোধন করা দরকার। এই দুর্বল আইনে; শ্রমিকের কোন কল্যাণ হবেনা।

এন, এম, যোশী গম্ভীর হয়ে বললেন,—

বিদেশী সরকার। অনেক কষ্টে ১৯২৬ সালে। এইটুকু কৌশলে আদায় করেছি। এবার পথ খুলে গেল। আর ভয় নেই।

এম, এন, যোশীর কথায় যুক্তি ছিল।

স্বামী সহজানন্দ কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ভূমিহীন চাষীকে; ভূমির দখল দিতে হবে। তার কোন আন্দোলন নেই।

ডক্টর মামুদ সেই পুরোন কথা তুললেন,—লাঙ্গল যার, জমি তার।

তারপর সহজানন্দকে কাছে ডেকে বললেন,—জমি দখলের জন্য; বিপ্লবী কৃষি আন্দোলন শুরু করুন। জমি ছিনিয়ে নিতে হবে। রক্তাক্ত বিপ্লব চাই। এইসব মূঢ়, ম্লান, মুক মুখে দিতে হবে ভাষা।

ডক্টর মামুদের কথায় আছে আগুনের ফুল্‌কি; আছে আকর্ষণ; আছে মাধুর্য। যে শোনে, সেই ছুটে আসে। আশ্চর্য।

তবু সবাই বলে।

ডক্টর মামুদ একটা প্রহেলিকা। ঠিক বোঝা যায় না। মানুষটিকে ঘিরে; কেমন যেন একটা লৌহ যবনিকা ফেলা আছে।

কর্মীদের জানতে কৌতূহল হয়।

কে এই ডক্টর মামুদ?

ডক্টর মামুদ এদেশে সাত মাস আছেন। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা। ছড়িয়ে দিলেন। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। সর্বত্র সন্তোষজনকভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলন দানা বেধেছে।

ডক্টর মামুদ ভাবছেন। কপালের শিরাগুলো লাল হয়ে উঠলো।

বৈপ্লবিক আন্দোলন। ঠিক পথে শুরু হয়ে গেছে। এখন যদি ধরা পড়ি; ক্ষতি নেই। কারাগারের লৌহশৃঙ্খল তুচ্ছ।

বৈপ্লবিক আন্দোলন। আর কার্যক্রম। বন্ধ হবে না।

কোন মতে জেলের পাচিলটা একবার ছুঁয়ে আসতে পারলে হয়। তখন আমি স্বাধীন নাগরিক তখন শুরু হবে প্রকাশ্যে বলিষ্ঠ রাজনীতি। ছড়িয়ে দেব বৈপ্লবিক আন্দোলন দিকে দিকে।

ডঃ মামুদ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

গোপনে সুভাষের কাছে খবর গেল। তিনি বলে পাঠালেন,—হ্যাঁ সময় হয়েছে; এইবার আপনি ধরা দিতে পারেন।

বোম্বায়ের সেই হোটেল।

এখানে এম, এন, রায় আত্মগোপন করে আছেন।

পুলিশ কতবার এই হোটেল ঘুরে গেল। ডক্টর মামুদের সঙ্গে কথা বলেও গেল। কিন্তু কে এই ডঃ মামুদ? তা নিয়ে যে মাথা ঘামানর দরকার; তা মনেও করলো না। কেন করলো না? তারাই জানে।

ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা যোগলেকার। দু'দিন আগে জানতে পারলেন। ডক্টর মামুদ আসলে কে? আর ভয় নেই।

এবার কমরেড এম, এন, রায় স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চান।

বোম্বাই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার। মিঃ পেটিগারা। কি জানি, কেমন করে খবর পেলেন।

মেরিণ ড্রাইভের পেছনের রাস্তাটা পার হয়ে; আর একটু

এগুলেই ; একটা হোটেল সেখানে আত্মগোপন করে আছেন। বিশ্ব বিশ্রুত বিপ্লবী ; কমরেড এম, এন. রায়।

রাতের অন্ধকার।

বিরাট বন্দী গাড়ী। হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। আর সঙ্গে কয়েক ডজন সশস্ত্র পুলিশ।

খট্, খট্, খট্; কড়া নেড়ে উঠলো।

এম, এন, রায় জেগেই ছিলেন। প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

আপনি, এম, এন, রায় ? মাথা নেড়ে বল্লেন, হ্যাঁ।

সহজেই ধরা দিলেন। হাসিমুখ, সপ্রতিভ ভাব।

সে তারিখটা ছিল ১৯৩১ সালের ২০শে জুলাই।

সারা ভারত সচকিত হোয়ে উঠলো। সবাই স্তম্ভিত হোয়ে শুনলো। ডক্টর মামুদই বিশ্ব বিশ্রুত কমিউনিষ্ট নেতা, কমরেড এম, এন, রায়। সবাই জানলো। রোমাঞ্চকর, প্রহেলিকাময়, অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন, ঐতিহাসিক মানুষ, এম, এন, রায় বোম্বায়ে ধরা পড়েছেন।

সংবাদ পত্রে বড় বড় হেড-লাইন।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরে ; ভারতের বুকে উল্কাপাত। ধুমকেতুর মত আবির্ভাব।

হু হু করে কাগজ বিক্রি। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা সংস্করণ।

সব কাগজে একই কথা। বিভিন্ন যাদুকরী ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশিত। সবার তাক লেগে গেল।

দেশের মানুষ দিশে হারা।

সবার চিন্তিত ও ম্লান মুখে একই প্রশ্ন,—তাহলে এম, এন, রায় ধরা পড়লেন ?

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা :

১৯২৪ সাল।

ভারতে বৃটিশ সরকার। এক সর্বভারতীয় মামলা চালু করেছেন। নাম দিয়েছেন কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা। এম, এন, রায় ছিলেন। সেই মামলায় প্রধান আসামী। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেড়িয়েছিল।

তখন তিনি পলাতক।

তাই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা যায় নি। সুদীর্ঘ দিন পর। সেই পরোয়ানা বলে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোল। বোম্বাই হোটেলে।

কানপুরে তাঁর বিচার হবে।

একটা সর্ব-ভারতীয় ডিফেন্স কমিটি গঠিত হোয়েছে। সকল প্রদেশের লোক আছেন। প্রচুর সাহায্য আসছে। চারিদিক থেকে।

বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ভুলাভাই দেশাই। এলাহাবাদের পণ্ডিত জহয়লাল নেহেরু। কৈলাস নাথ কাটজু। আর, এস, পণ্ডিত। কলকাতার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, কেউ বাদ নেই।

সবাই রায়ের সমর্থনে ; ছুটোছুটি করছেন।

কানপুর জেলা জজের আদালত।

তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই দেখতে চান। এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষটিকে। বিরাট বিপ্লবী। শুনতে চান। তাঁর মুখ থেকে। রোমাঞ্চকর ও লোম-হর্ষণ বিপ্লবের ইতিহাস।

কমরেড এম, এন, রায়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কারাগারের নির্জন সেলে। প্রকাশ্য আদালতে ; আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোর্টের অনুমতি চাইলেন,—আমি কিছু বলতে চাই।

আদালত গৃহ। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল। এই বীর বিপ্লবীর মুখের দিকে। যেমন গলার স্বর, তেমনি ভাষা।

এম, এন, রায় নির্ভয়ে আরম্ভ করলেন।

আমি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছি; সর্বহারা শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য; আমি ভারতে কমিউনিজম প্রচার করতে চেয়েছিলাম।

তারপর রায় বলতে গেলেন,—আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বৈপ্লবিক রূপ কি হবে। অমনি সরকার পক্ষের কৌসুলি লাফিয়ে উঠলেন। তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করলেন। এ রাজদ্রোহ! এ বলতে দেওয়া হতে পারে না। এ আদালত গৃহ। প্রচারের প্লাট-ফর্ম নয়! আসামী কৌশলে; আদালত গৃহকে প্লাট-ফর্ম করে; সারা ভারতে কমিউনিজম প্রচার করতে চান।

আদালত আসামীর মুখ বন্ধ করে দিলেন।

তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হোল না।

পরে রায় তাঁর বক্তব্য—My defence নামে একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। বইখানির দেশে খুব চাহিদা হয়েছিল। ভারত সরকার বইখানি বাজেয়াপ্ত করেন।

কানপুর জেলা জজের এজলাসে; সাক্ষী প্রমাণ নেওয়া আরম্ভ হোল।

পুলিশ অপরাধের এক বিরাট ফিরিস্তি বার করলেন। সরজমিনে বিচার চলেছে।

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স বুরো। তার প্রাপ্ত অফিসার সাক্ষীতে বললেন,—

ভারতে কমিউনিজম প্রচারের সকল ভার; ভারতের প্রথম কমিউনিষ্ট নেতা; এম, এন, রায়ের ওপর মস্কো সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। আমার হাতে। তার প্রমাণ আছে।

দলিল দস্তাবেজের পাহাড়।

এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল খাদিম মীয়া। হলফ নিয়ে বললে,—

আমি ছিলাম জাহাজে ভারতীয় লস্করদের সর্দ্দার। এই সাহেব; আমার হাত দিয়ে; ভারতে বহু কাগজ, বই পাঠাতেন। জার্মানী থেকে। আর ইউরোপের অন্ত দেশ থেকে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়। অনেক নথি পত্তর। আদালতে জমা হোল। সুদীর্ঘ পাঁচ মাস বিচার চলেছিল।

সব দিক বিচার করে; বিচারক দণ্ডবিধির বিশেষ ধারায়। কমরেড এম, এন, রায়কে দোষী সাব্যস্ত করলেন।

১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারী।

বিচারক এম, এন, রায়কে দীর্ঘ বারো বছর। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

হাইকোর্টে আপিল হোল।

আপিলে বিচারপতি দণ্ডাদেশ কমিয়ে দিলেন। হলো ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড। যাক্ মন্দের ভাল।

পরদিনই বেরেলি সেণ্ট্রাল জেলে; রায়কে স্থানান্তরিত করা হয়।

বেরেলি সেণ্ট্রাল জেল। রায় ছ'বছর ধরে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

বেরেলি জেলে থাকার সময়। তাঁর সাংঘাতিক রকমের পীড়া হয়। বিনা চিকিৎসায় তাঁকে ফেলে রাখা হয়।

জেলখানার গোপনতা ভেদ করে। এলাহাবাদে খবর এল। পণ্ডিত জহর লাল নেহেরুর কাছে।

এম, এন, রায় বেরেলি জেলে। সাংঘাতিক রকম পীড়িত। তাঁর কোন চিকিৎসা হচ্ছেনা। সাধারণ সুখ-সুবিধা থেকে। তাঁকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

জহরলাল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখনই সন্ধান নিলেন।

গোপনতার প্রাচীর ভেদ করে; যে সংবাদ টুকু পেলেন। তাতে সন্দেহের অবকাশ রইলো না। তাইতো?

জহরলাল সংবাদটি কাগজে ছাপিয়ে দিলেন। যাতে সরকারের নজরে পড়ে।

তিনি লিখলেন।

বন্দী অবস্থায় আমাদিগকে যে সব সাধারণ সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। সে সব হ'তে কমরেড় রায়কে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

তাঁর ন্যায় লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যন্ত্রনা দায়ক আর কি হতে পারে? (আনন্দ বাজার পত্রিকা ২০।১০।৩৩)

কারাগারের অন্ধকার অন্তরালে :

কয়েকটি জেল ঘুরিয়ে; রায়কে দেরাহুন জেলে রাখা হয়েছে।

নির্জন সেল। রায়কে একা থাকতে হয়। কিন্তু জেলে তাঁর অবকাশ নেই। দিনরাত চিন্তা। এই ত প্রস্তুতির সময়।

জেলে বসে খবর পেলেন।

ভারতীয় রাজনীতি। নতুন স্রোতে বইতে সুরু করেছে। নতুন করে। তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। নতুন করে পরিচিত হতে হবে। এই ত সময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সদ্য প্রকাশিত বহু গ্রন্থরাজি। সেগুলো চাই। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

জেলারকে চিঠি লিখলেন।

আমার এই বইগুলো দরকার। আপনি ব্যবস্থা করুন। তালিকা পাঠালাম।

ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে পাবেন। তাছাড়া পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরী। নিউ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটেরিয়েট লাইব্রেরী। সব জায়গায় চিঠিগুলো লিখলাম। বিদেশের বন্ধুদের লিখেছি।

চারিদিক থেকে বই আসতে লাগলো।

কারাগারের নির্জন অভ্যন্তর। বইয়ের পাহাড়।' রায়ের সাধনা শুরু। দিনে-রাতে। বার ঘণ্টা থেকে, আঠার ঘণ্টা পড়া চললো। মহা-সাধক রায়। জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিলেন। এ যেন, আমি রূপ সায়রে ডুব দিয়েছি। অরূপ রতন আশা করে।

শুধু কি পড়াশুনা? জেলে বসে বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হোল। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ। যেন আন্দোলনের স্রোতে, ভাটা না পড়ে।

কয়েকজন পুরাতন কয়েদী। রায়ের খুব অনুগত। সুকৌশলে তাদের হাত করলেন।

ওরই মধ্যে একজন অল্প বয়স্ক কয়েদী; তাকে ডাকলেন। ছেলেটি বেশ চালাক চতুর। আর সপ্রতিভ।

রামসহায়, এই চিঠিগুলো তুই বাইরে পৌছে দিতে পারবি? কিন্তু খুব সাবধান। ধরা পড়লে বিপদ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব পারবো।

রায় জেলের ভেতরে বসে বসে; অনুগামীদের নিয়মিত চিঠি পাঠাচ্ছেন। গোপন পথে চিঠির আদান প্রদান চলেছে। আদেশ ও উপদেশ। অথচ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ; তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারছে না। রায়ের ব্যক্তিগত ব্যবহার এত মিষ্টি, জেলার থেকে জেল-বার্ড সবাই মুগ্ধ। কে কার ওপর নজর রাখে। একদিন জেল-সুপার রায়ের সেলে এসে হাজির। চারিদিকে বই আর কাগজের পাহাড়। রায় আপন মনে লিখে যাচ্ছেন। গণেশের কলম। থামবার নাম নেই। কোন দিকে চাইবার অবকাশ নেই। জেল-সুপার হাসতে হাসতে বললেন।

করেছেন কি? এ যে কাগজের হিমালয়।

রায় ম্লান মুখে উত্তর দিলেন।

অনেক লিখলাম। সাড়ে তিন হাজার পাতার মত পাণ্ডুলিপি। ছাপলে ন'খানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই হবে। ছাপাতে প্রায় দু' লাখ টাকা লাগবে। ভাবছি এত টাকা পাব কোথায়।

শুধু কি পড়া আর লেখা?

রায়ের চিন্তাধারায় অভিনব পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জেলের নির্জন সেলে নতুন ভাবনা। ভেবে কূল কিনারা করতে পারছেন না।

কমিউনিজমের পর কি ? Beyond Communism !

মনে কত বিভিন্ন প্রশ্ন আসছে। গভীর চিন্তা। সমাধান কোথায় ? ভাববার কথা বটে। দেহ, মন ও বুদ্ধির অনুশীলন চলছে। কঠোর সাধনা। কিন্তু আলো দেখতে পাচ্ছেন না। হাঁতড়ে বেড়াচ্ছেন।

কোথায় আলো ? কোথায় আলো ?

অথচ—জেলের নির্জন সেলে। শুধু পড়ে, লিখে আর চিন্তা করে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। কাটেনা। মন আরও কিছু খোরাক চায়।

হঠাৎ লক্ষ্য করলেন। জেলের সেলে, একটা বিড়াল। কোথা থেকে এসে জুটেছে। তাকে একটু করে দুধ দেন। বিড়াল দুধ খায়। চলে যায়। আবার আসে। আবার দুধ দেন। বিড়ালের যাওয়া আসা ; চলতে থাকে।

রায় বিড়ালের মনোস্তত্ব নিয়ে ; গবেষণা চালাতে আরম্ভ করলেন। দেখলেন। বুদ্ধি-বৃত্তি সর্ব-নিম্ন জীব থেকে ক্রমবিকাশের পথে ; ধীরে ধীরে বেড়ে, মানুষে এসে পরিণতি লাভ করেছে।

একদিন এই গল্প।

আন্দামান ফেরত ; উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কে বলছিলাম।

উপেনদা বললেন।

তবে শোন। শ্রীঅরবিন্দের কথা।

১৯০৮ সাল। আলিপুর বোমার মামলা তখন চলেছে। শ্রীঅরবিন্দকে নির্জন সেলে রেখেছে। আমিও প্রেসিডেন্সী জেলে।

প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে ; তাঁরও একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়।

একদিন শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন।

তাঁর খাওয়ার পর। দু'চারটি ভাত। মাটিতে পড়ে আছে। সেই ভাত খেতে আসে। দু' দল পিপড়ে। শ্রীঅরবিন্দ পিপড়ের

গতিবিধি। আচার-আচরণ। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করলেন। দিনের পর দিন। এইভাবে যায়।

লক্ষ্য করলেন।

পিপড়েরা অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ। তারা কঠোর নিয়ম মেনে চলে। শেষে এমন হোল। শ্রীঅরবিন্দ পিপড়েদের নীরব ভাষা; বুঝতে পারতেন। জীব-জগতের তুচ্ছতম প্রাণী। এই পিপিলিকার দল। তারা আর তুচ্ছ রইলো না। এক বিরাট প্রাণী-জগতের সন্ধান দিল।

রায় জেলের সেলের মধ্যে বসে, সেদিন কি যেন করছিলেন। সকাল বেলা। জেল সুপার ঢুকলেন। হাতে ছড়ি। সঙ্গে একজন কয়েদী। তার হাতে একটা মস্ত পার্শেল। হাসি হাসি মুখ।

রায় দেখেই বুঝলেন। বিদেশী পার্শেল।

এই নিন, মিঃ রায় আপনার পার্শেল।

আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন?

সুপার হাসলেন। কষ্ট আর কি?

পার্শেলটি পাঠিয়েছেন এলেন। জার্মানী থেকে। কাষ্টমস ও পুলিশ। সেটি আগেই খুলেছেন। পুলিন্দাটি ভেঙ্গে তছনছ।

রায় দেখলেন।

তাঁরই প্রিয় সঙ্গীতের দু'চার খানি ভাল রেকর্ড। এলেন যত্ন করে পাঠিয়েছেন। আর কয়েক খানা বই।

এলেন একখানা চিঠি ও লিখেছেন।

প্যারিস আর্ট গ্যালারিতে খোঁজ নিলাম। তোমার পছন্দ মত ছবিগুলো শীঘ্রই পাঠাব। সন্ধান পেয়েছি, এলেন।

পরদিন আর একখানা চিঠি এল। বিদেশ থেকে।

লিখেছেন, আমেরিকার প্রখ্যাত শ্রমিক-নেতা জে, লাভষ্টোন।

আমষ্টারডামের সোস্যালিষ্ট নেতা। স্নীভ লীট। তার ও চিঠি এসেছে। সবাই জানতে চান রায়ের খবর।

জেলের বিদেশী ডাক। রায়ের চিঠিতেই ভর্তি। সেন্সারের ছাপে ছাপে। চিঠি পড়া যায়না।

তবু খুব আনন্দ। কেউ তাঁকে ভোলেনি। সবাই তাঁর খবর চান। তাঁর কাছে। জেল আর জেল রইলো না। আনন্দের হাট-বাজার। তাই বলে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়নি।

রায় ভাবছেন। এলেন ভোলেনি। আমার প্রিয় রেকর্ডগুলি পাঠিয়েছে।

ইউরোপে সঙ্গীত চর্চা করতাম। এটি ছিল আমার হবি। জেলে বসে ও তার খোরাক পেলাম। এটাই আনন্দ।

দেরাদুন জেল। রায়ের দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে। আনন্দে ও আরামে। এখানে সকলেই তাঁকে ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। কাছে আসে। কথা বলে। ছাড়তে চায়না। নিতান্ত আমার জন।

রায়ের সেলের সামনে; এক টুকরো ফালি জমি। সেখানে ফুলের বাগান। বিচিত্র বর্ণের। বিভিন্ন জাতের ফুল। রায় সখ করে লাগিয়েছেন।

কয়েদী বিষণ। সকাল থেকে ফুলের বাগান নিয়ে ব্যস্ত। নানারকম কলম। কত রকমের কাজ। তাকে একা হাতে করতে হয়।

আজ নতুন ফুল ফুটেছে। কসমস্ ফুলের নতুন জাত। অপূর্ব বর্ণ সুষমা। নতুন সৃষ্টি। অপূর্ব শোভা।

বাগানের সামনে ছোট্ট একটু ভীড়।

জেলার অবাক হয়ে; নতুন জাতের ফুল দেখছেন। ফুলের শোভা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ। চোখ ফেরান যায় না।

রায় হাসতে হাসতে বলছেন।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র নেই। উপযুক্ত ছুরি কাঁচি নেই। নেই কোন যন্ত্রপাতি। কি করে কি হবে? শুধু ব্লেড আর পেন নাইফ সম্বল।

এমনি করে কাটলো। দীর্ঘ ছ'বছর। বিভিন্ন জেলে। এবার রায়ের মুক্তির দিন। এগিয়ে আসছে। তারপর মুক্ত, স্বাধীন নাগরিক।

রায় ভাবছেন।

কিন্তু, অত সহজে পুলিশ কি আমাকে মুক্তি দেবে ? হয়ত জেল—গেটেই ধরবে। ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেসানে আমাকে বন্দী করতে পারে। কিছুই বিচিত্র নয়।

রায় মনে মনে হাসলেন।

সব রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আজ কারামুক্তির দিন :

১৯৩৬ সাল ; ২০ সে নভেম্বর।

সকাল বেলা। জেলার রায়ের সেলে এসে হাজির। হাতে একখানা ফাইল।

হাসিমুখে বললেন।

মিঃ রায় আপনি মুক্ত।

সমগ্র জেলে ; কমরেড রায়ের মুক্তি সংবাদ ; বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো। জেল ভেঙ্গে পড়লো। সবাই বিদায় অভিনন্দন দিতে ছুটে এল। দাঁড়াল রায়ের পেছনে। সারিবেধে চললো। জেল গেট পর্যন্ত। রায় হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

বহু কংগ্রেস কর্মী ও নেতা।

জেল গেটে উপস্থিত। সংযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ; রায়কে মাল্যদান করা হোল। তারপর মহাসমারোহে ; স্থানীয় কংগ্রেস নেতার ভবনে রায়কে নিয়ে আসা হোল। একটা সাদর অভিনন্দনের ব্যবস্থা ছিল।

স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অনুরোধ করলেন, আপনাকে কংগ্রেসের সদস্য হতে হবে।

বেশ, আমার আপত্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একজন কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেসের 'মেম্বারশীপ' ফর্ম খানা রায়ের সামনে রাখলেন।

রায় নিঃসংকোচে তার ওপর স্বাক্ষর দিলেন। এম, এন, রায়।

সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

কয়েক দিন পর। একটা ঘরোয়া বৈঠক বসেছে। মহাত্মাজী আছেন। আছেন জহরলাল নেহেরু। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। সুভাষ চন্দ্র বসু। আরও অনেকে।

গোবিন্দ বল্লব পন্থ বললেন। আপনাকে এ, আই, সি, সির মেম্বার হতে হবে।

তাই হোলেন। সবাই এক বাক্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদে ; রায়কে সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নিলেন।

কংগ্রেসের সবাই চান।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধায় এম, এন, রায়কে ;

বোম্বায়ের ভি, বি, কার্ণিক, নিম্বকর, যোগলেকর। সবার ইচ্ছা। রায়ের প্রধান কার্যালয়। বোম্বাই শহরে থাকুক।

রায়েরও তাই ইচ্ছা।

আপাততঃ বোম্বাই থেকে কাজ আরম্ভ হবে।

বোম্বায়ের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি। রায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বোম্বাই বসে রায় কাজ শুরু করলেন।

রায়ের সব ভার নিয়েছেন। বোম্বায়ের বন্ধুরা। রায় ত নিঃসম্বল। ফকির বলা চলে।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাস, সকাল বেলা।

বন্ধুদের সঙ্গে রায় গল্প করছেন।

ডাক-পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল।

বিদেশী ডাক। জার্মানী থেকে এসেছে। লিখেছেন এলেন।

তোমার জন্য ছ' বছর সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছি। আর কতদিন থাকবো?

চিঠিখানা পড়ে, রায়ের চোখের কোণ দুটো, যেন ভিজে ভিজে মনে হোল।

কার্ণিকের দৃষ্টি এড়াল না। কার চিঠি?

এলেনের চিঠিখানা রায় কার্ণিকের হাতে দিলেন।

চিঠি পড়ে কার্ণিক মহাখুসী। লাফিয়ে উঠলেন। আর দেরী কেন? এলেনকে ভারতে আনাবার ব্যবস্থা করুন।

তাতো করবো। কিন্তু টাকা কই?

সে ভাবনা আমাদের।

তখনই টেলিগ্রাম গেল। টাকা পাঠাচ্ছি।

Catch the first boat.

তাই হোল।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

ভারতের মাটিতে; এলেনের সঙ্গে রায়ের বিবাহ অনুষ্ঠান; বিনা আড়ম্বরে পালিত হোল।

ভারতে কাজ আরম্ভ:

জহরলালের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল। কত আন্তরিকতা সে আহ্বানে।

আনন্দ ভবনে আসুন। অনেক কাজ করবার আছে।

রায় এলাহাবাদে এসেছেন। আনন্দ ভবনে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ইন্দিরা গান্ধী, কৈলাস নাথ কাটজু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিরাট ফ্যামিলি লাইব্রেরী।

এখানে বসে বসে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, কর্ম পন্থা, নীতি, প্রয়োগ ব্যবস্থা ; সব ভাল ভাবে জেনে নিলেন। একটা ধারণা হোল।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা বললেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে ; দুটো দল আছে দেখছি। দুটি বিভিন্ন মতবাদ।

পণ্ডিতজী বললেন।

তা ঠিক! দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী। আমাকে বলা হয় বামপন্থী। কিন্তু এক জায়গায় আমাদের মিল আছে। আমরা সবাই চাই। প্রথমে end of British Imperialism. ইংরাজ রাজত্বের অবসান। তারপর হবে দেশ গড়ার কাজ। সোসালিজমের আদর্শে। আমরা নতুন ভারত গড়বো।

রায় হাসতে হাসতে বললেন।

বুর্জোয়া কায়েমী স্বার্থ। কংগ্রেসের দরজা আকড়ে বসে আছে। টাটা, বিড়লা আর গোয়েঙ্কার দল। এদের কংগ্রেস থেকে হটাতে হবে। তবেই ত সোসালিজম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

জহরলাল এ আলোচনা আর বেশীদূর বাড়তে দিলেন না। বললেন,—এ বিষয় আমরা পরে চিন্তা করবো।

রায়ের মনে একটু খোঁকা লাগলো। মনে হোল ; কেমন যেন এড়িয়ে গেলেন। ভাল লাগলো না।

রায় বোম্বায়ে ফিরে এলেন।

রায়ের চিন্তাধারা। বিভিন্ন পথে ছুটতে লাগলো। ভাবতে বসলেন।

আমাকে যদি কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করতে হয়, তাহলে সম্পূর্ণ নতুন পথে আমাকে এগুতে হবে। বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই শোষিত জনগণের মুক্তি আসবে।

সর্বস্তরের মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। আমরা কি তাদের দিতে চাই। কেন জীবনে নৈরাশ্য ?

কিন্তু দেশের সংবাদ পত্র। তারা ত আমার কথা ছাপবে না। সবই বুর্জোয়াদের কাগজ। আমাদের একখানা নিজস্ব কাগজ থাকা চাই।

অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

ঠিক আছে। আপনি কাগজ বার করুন।

নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হোল,—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৭ সাল।

ইণ্ডেপেনডেন্ট ইণ্ডিয়া,—ছাপা হোল। বোম্বাই থেকে। সম্পাদক—এম, এন, রায়।

নতুন চিন্তাধারা।

বিপ্লবের নতুন টেক্‌নিক্। নির্ভুল চিন্তা পদ্ধতি। রাজ-নীতির বিজ্ঞান। সবাই চমকে গেল।

পত্রিকাখানি সারা ভারতে জন-প্রিয়তা অর্জন করলো।

বিক্রয় সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেল।

এই কাগজখানি ছিল রায় ও এলেনের প্রাণ।

তাঁরা আদর করে বলতেন,—our only child.

রায়ের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজের নামও বদলে গেল।

আজ নতুন নাম,—র‍্যাডিক্যাল হিউমানিজম।

এম, এন, রায়, সারা ভারত ঘুরছেন। কই, তিনি 'ত বাঙ্গলায় আসছেন না ? সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ। তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ! বাঙ্গালী তাঁকে ফিরে পেতে চায়। চিঠির পর চিঠি যাচ্ছে। কবে বাঙ্গলায় আসছেন ?

১৯৩৮ সাল ; ২০সে জানুয়ারী। হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাটফর্ম।

তিল ধারণের স্থান নেই। সকলে চোখে মুখে। আকুল আগ্রহ ও উত্তেজনা। সবাই তাকিয়ে আছেন। দূরের ঐ সিগনালের দিকে।

ট্রেনের আর কত দেরী ?

দীর্ঘ বাইশ বছর পর। মানব প্রেমিক। বিশ্ব বিপ্লবী। কমরেড এম, এন, রায়। বাংলার প'লিমাটিতে, পা দেবেন। আজ কত বছর পর। বাংলা মায়ের বীরছেলে। মায়ের কোলে ফিরে আসছে। পৃথিবীর সব দেশের পূজা পেয়ে ফিরে আসছে।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, কামাল কিয়া ভাই।

দেশের ও জাতির এই দুর্দিনে। বাংলার নরম মাটিতে পা বাড়ালেন। কমরেড এম, এন, রায়। তাই সবার মুখে,—

ওরে দুয়ার খুলে দেরে, বাজা শঙ্খ বাজা ; গভীর রাতে এসেছে আজ, দুঃখ রাতের রাজা।

ষ্টেশনের মাইক ঘোষণা করলো।

ট্রেন ঠিক সময়েই আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ; কানাডা নির্মিত বিরাট লৌহ শকট। ধূম উদগীরণ করতে করতে। হাওড়া ষ্টেসনে প্রবেশ করলো।

সবাই ছুটলেন। প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, আর সম্পাদক। কত নেতৃবৃন্দ। গুণগ্রাহীর দল ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ছুটলেন।

মালা হাতে করে ; প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। সবাই এগিয়ে গেলেন। ছুড়োছুড়ি পড়ে গেল।

প্রথম শ্রেণীর কামরা। খালি করে সবাই নেমে এলেন। কামরা ফাঁকা। রায়কে খুজে পাওয়া গেল না।

কই, কমরেড এম, এন, রায় কই ?

বিরাট জন-সমুদ্রের মধ্যে। তিনি হারিয়ে গেলেন নাকি। খোঁজ খোঁজ, খোঁজ।

এমন সময় হরিকুমার চক্রবর্তী।

এম, এন, রায় আর তাঁর সহ-ধর্মিণী এলেন রায়কে আবিষ্কার করলেন ; একটা ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরার অন্ধকার কোণ থেকে। লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

রায় হাসতে হাসতে বেড়িয়ে এলেন।

বিরাট শোভা যাত্রা। কমরেড এম, এন, রায়কে একখানা খোলা মোটরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিয়ে আসা হোল। কলকাতার কেন্দ্রস্থল।

চারিদিকে আনন্দ ও উৎসব।

সকলের মুখে।

জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। এম, এন, রায় জিন্দাবাদ।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ; রায়কে অপূর্ব অভিনন্দন দেওয়া হোল। সে অভিনন্দন পত্রের প্রতি ছত্র। আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। বুকের রক্তে সমুজ্জ্বল।

দেশ আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে। জাতিকে নির্দেশ দিন। দেশকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করুন। বন্দে মাতরম্।

এম, এন, রায় অভিভূত। দীর্ঘ দিন পর। বাংলায় ভাষণ দিলেন,—কংগ্রেসের সেবাই দেশের সেবা।

তারপর ক্রমাগত। রায়ের ডাক আসছে চারিদিকথেকে। কৃষাণ, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত যুবক। সবাই দলে দলে আসতে লাগলো। দেখতে চায় তাকে। শুনতে চায় তাঁর কথা। কেউ বাদ নেই।

অতুল ঘোষের বাড়ীতে রায় আছেন। ১৭ নং বিবেকানন্দ রোড।

সেখানে মেলা বসে গেছে। যেন হরিহর ছত্রের মেলা। লোকের আনাগোনার শেষ নেই। উৎসাহ আর আগ্রহ।

গভর্ণমেণ্ট চিন্তিত। গোয়েন্দা বিভাগ সচকিত।

অথচ রায়। একটিও বেফাঁস কথা বলছেন না।

শুধু—জনগণের মুক্তি চাই। বিপ্লবের নতুন টেক্‌নিক। শোষণ-হীন সভ্য সমাজ। ভারতে গড়ে তুলতে হবে।

পুলিশ বড় বে-কায়দায় পড়ে গেল।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ম্মচারী সমিতি ঃ

পুরোন দিনের কাগজ গুলো। উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। হাতে এল। বত্রিশ বছর আগের। একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। কর্পোরেশনের কথা। ছেড়া এক খণ্ড কাগজ। তারিখ,—১১ই এপ্রিল ১৯৩৮ সাল। তাতে দেখলাম।

৮ই এপ্রিল ১৯৩৮ সালে; কর্পোরেশনের দশ হাজার শ্রমিক, কর্মচারী ও অফিসারগণ। এক চমৎকার অভিনন্দন দিয়েছিলেন; কমরেড এম, এন, রায়কে।

তারই সুন্দর ও মনোজ্ঞ বর্ণনা।

কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন সুবিস্তৃর্ণ লনটি। সুন্দর করে সাজান হয়েছে। সভাপতির আসনে বসেছেন। তরুণ কাউন্সিলার সুধীর রায় চৌধুরী (প্রাক্তন মেয়র)।

ডায়াসের উপর সারি সারি বসেছেন।

জে, সি, মুখার্জী (C.E.O) ডক্টর বি, এন, দে, বিনয় জীবন ঘোষ, সুখেন চাটার্জী, অনাথ বন্ধু দত্ত, রাধারমন রায় চৌধুরী আরও অনেকে।

অতুল ঘোষের বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীতে রায় আছেন।

কর্পোরেশনের মোটর ছুটলো। তাঁকে তুলে আনতে। সস্ত্রীক রায় কর্পোরেশনে উপস্থিত হোলেন।

প্রথমেই হাসিমুখে অভিনন্দন জানালেন। কর্পোরেশনের জনপ্রিয় প্রধান কর্মসচিব। জে, সি, মুখার্জী। সহজ ও সরল ভাষায় বললেন,—সমস্যা জর্জরিত বাংলা দেশকে আপনার কর্মক্ষেত্র করুন।

তরুণ সভাপতি সুধীর রায় চৌধুরী একটু জোর গলায় শুরু করলেন। তিনি ত সুবক্তা।

আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি। সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। একদিন আপনার হাতে আসবেই।

তুমুল হর্ষধ্বনীর মধ্যে রায় উঠলেন।

আমি বাংলায় বহুদিন পরে এলাম। বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায়; আমার দ্বারা কি, আর কতটুকু হতে পারে; তা না বুঝে বাংলার রাজনীতিতে অংশ নিতে পারছি না।

তারপর একটু হেসে বললেন।

বাংলার রাজনীতি অত্যন্ত জটিল। অতি সাবধানে এখানে প্রবেশ করতে হবে। আমি মাত্র কয়েকদিন, বাংলায় আছি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। বাংলার রাজনৈতিক জীবনে। সত্যকার রাজনীতিজ্ঞ। অল্পই আছেন।

এ কয় দিনে দেখলাম। বাংলা দেশে, কর্পোরেশন-পলিটিক্স ছাড়া আর কোন রাজনীতি নেই।

তারপর শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন,—

যারা সর্ব-হারা, তারাই সর্বশক্তির উৎস।

কৃষক ও শ্রমিক। দেশের প্রকৃত শক্তি সম্পদ। এদের মধ্যে জাগরণ আনতে হবে।

কংগ্রেসের কাজ শহরে আর কলকাতায় বসে হবেনা। গ্রামে ফিরে যান। গ্রামের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করুন।

ইংরেজ আমলে। একমাত্র কলিকাতা কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে; বাংলা দেশের সব কিছু রাজ-নীতি চলতো। কলকাতা এসেই; রায়ের অভিজ্ঞ চোখে; সেটা ধরা পড়লো। আর তিনি কর্পোরেশনের ভেতরে দাঁড়িয়ে; হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন। এটাই রায়ের বলিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্রের আর একটা দিক।

ফৈজপুর কংগ্রেস

১৯৩৭ সাল।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি।

এম, এন, রায়। ডেলিগেট নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তাছাড়া তাঁকে সাদরে আমন্ত্রিত অতিথির সম্মান দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্ব ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের সমপর্যায়। তাঁর জন্য সংরক্ষিত আলাদা কুটির।

দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকরা। তাঁর কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কংগ্রেস নগরে; সব সময়। একত্রে জহরলাল আর এম, এন, রায়। পাশাপাশি ঘুরছেন। হাসি আর আলাপ। বিষয় কমিটির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলেছে। নিভৃতে ও একান্তে।

কংগ্রেস অধিবেশনে বিষয় কমিটির প্রস্তাবের কথা উঠলো।

রায় বললেন।

কংগ্রেসের ভিতর কৃষকদের অবশ্যই চাই। তারাই হবে,—grass root of the organisation। তারা কংগ্রেসে সদস্য হবার চাঁদা দেবে। পয়সার পরিবর্তে ফসলে। আমি প্রস্তাব দেব।

তাই হোল।

রায় কংগ্রেসে প্রস্তাব দিলেন। নতুন চিন্তা। ডেলিগেটরা একটু থমকে গেলেন।

ফসল দিয়ে চাঁদা শোধ। এ আবার কি? কেউ কেউ অসুবিধার কথা তুললেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর এতে পুরো সমর্থন। তাই আপত্তি টিকলো না।

ডেলিগেটরা লক্ষ্য করলেন।

ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব গুলোর মধ্যে; যেন একটু অন্যরকম মুন্সিয়ানা। একটু নতুনত্ব। কেমন যেন একটু রুশ রুশ গন্ধ। সর্বহারার জন্য বেশী দরদ। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত। তারাই যেন দেশ। বড়লোক ডেলিগেটরা। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁদের দেহ একটু শির শির করে উঠলো।

রায়ের সঙ্গে জহরলালের প্রীতি, ঘনিষ্ঠতা আর অন্তরঙ্গতা। মনে হোল। যেন একটু বাড়া বাড়ি। সব ব্যাপারেই রায়ের সঙ্গে পরামর্শ।

সবাই ভাবলেন। তাহলে ?

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের; পরবর্তী সভাপতি নিঃসন্দেহে এম. এন. রায়।

শুধু নিয়তি। অদৃশ্যে বোধকরি একটু হাসলেন।

শুধু কি সাধারণ মানুষ ?

একথা ভেবেছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক। ইউনাইটেড প্রেসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বিধু ভূষণ সেনগুপ্ত।

তাঁর স্মৃতি কথা। পড়লে বেশ বোঝা যাবে।

এই অধিবেশনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন। এম, এন, রায়। ফৈজপুরে তিনি একজন কংগ্রেসের সেবকরূপে যোগদান করেছিলেন। মনে হয়েছিল। তিনি পৃথিবীর বিপ্লবী জয়-যাত্রা ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাতৃ-ভূমির সেবায় তা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমর্পণ করবেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে; কৃষক ও শ্রমিক সম্পর্কে একটি খসড়া রচনার জন্য জহরলাল তাঁকে অনুরোধ করেন।

পরবর্তী কংগ্রেসে রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

হরিপুরা কংগ্রেস ঃ

১৯৩৮ সাল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এবার নব-নির্বাচিত সভাপতি। সুভাষচন্দ্র বসু। এ বছর সুভাষ ছিলেন। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মনোনীত প্রার্থী। তাই তাঁর নির্বাচনে অন্তদ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি।

হরিপুরা কংগ্রেসের উল্লেখ যোগ্য কাজ, জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিটি গঠন।

১৯২৯ সালে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম,—পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তখন রায় ইউরোপে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল সূত্র। রায় ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করে ছিলেন।

রায়, সুভাষকে বললেন।

অনগ্রসর দেশকে; দ্রুত আর্থিক অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে একমাত্র রাস্তা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। রাশিয়া সেই পথে চলেছে।

সুভাষ চন্দ্র সেই পথে যেতে চান।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হোল।

রায় কংগ্রেসে আর একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন,—গণ-পরিষদ গঠন করা হোক। এ প্রস্তাবও কংগ্রেসে গৃহীত হোল। গণপরিষদ গঠন সম্পর্কে, একটা কনভেনসন হয়। এই প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে রায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন।

রায় বললেন।

দেশের রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে; এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বৈপ্লবিক পদ্ধতি; কর্মসূচি ও কৌশল অবলম্বনে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। কংগ্রেসের বিপ্লব-বিরোধী নেতারা; রায়ের কথা শুনলেন বটে, কিন্তু তাঁরা রায়কে ঠিক বুঝলেন কি না; তা বোঝা গেল না।

রায় দেখলেন।

বুর্জোয়া দল। কংগ্রেসের দরজা আঁকড়ে পড়ে আছেন। তাঁরা চান কায়েমী স্বার্থ; যেন বজায় থাকে। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের শক্তি বৃদ্ধির কথা। শুনে তারা প্রমাদ গুনলেন। বেশ ভয় পেলেন।

এমনি করে একটা বছর কেটে গেল।

ত্রিপুরী কংগ্রেস ঃ

১৯৩৯ সাল।

এবার ত্রিপুরীতে কংগ্রেস। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। এ বছর সভাপতির পদে মনোনয়ন দিয়েছেন ; পট্টভাই সীতারামিয়াকে।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ। সুভাষ চন্দ্রকে আরও এক বছর পেতে চান ; সভাপতির পদে। চারিদিক থেকে আবেদন আসছে।

সুভাষ পরামর্শ করলেন রায়ের সঙ্গে। কি করা যাবে ? বাপু ত আমাকে চাইছেন না।

রায় বললেন।

কংগ্রেস গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। মনোনয়ন চলতে পারে না। আপনি ঠিক থাকুন। Nominatiou is a negation of democracy।

আমারও তাই মত। সুতরাং আমি দ্বিতীয় বারের জন্য ; নির্বাচন প্রার্থী হব। হাই কমাণ্ডের অন্যায় আবদার মানবো না।

সুভাষের কণ্ঠে দৃঢ় সংকল্পের প্রত্যয়। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের প্রচণ্ড বিরোধীতা আরম্ভ হোল। কত কুৎসা প্রচার হোল। বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর প্রশ্ন উঠলো। কত রকম ষড়যন্ত্র চললো। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী উঠে পড়ে লাগলেন ; সুভাষকে হারাতে হবে। তবু সুভাষকে হারাতে পারা গেল না। বিপুল ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করলেন। বিপ্লবী তরুণের জয় হোল। বিহারের জয় প্রকাশ নারায়ণ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। জয় তরুণের জয়।

সীতারামিয়ার শোচনীয় পরাজয়।

গান্ধীজী মর্মাহত হোলেন। বললেন,—পট্টভাই সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়। My 'defeat'

আরও দুঃখের কথা। গণ-তন্ত্রের ধ্বজাধারীগণ। জহরলাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে রাজেন্দ্র প্রসাদ, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, সরোজিনী নাইডু পর্যন্ত। কেউ এই ষড়যন্ত্র থেকে বাদ গেলেন না।

কেউ কংগ্রেসের আইনসঙ্গত নির্বাচিত সভাপতির সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন।

গান্ধীজী বললেন।

তুমিই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন কর। আমরা আর ওর মধ্যে কেন?

কেউ সহযোগিতা করতে রাজী নয়। কেউ সুভাষকে চায় না। সুভাষ এক ঘরে। সুভাষ বাঙ্গালী।

আরও আশ্চর্য। জাতিরজনক মহাত্মাগান্ধী। তিনিও এই ষড়যন্ত্রের বাইরে ছিলেন না।

তখন এম, এন, রায়, সুভাষের নিত্য সঙ্গী।

রায় বললেন,—এ ঘটনায়; এটাই প্রমাণ হোল। কংগ্রেস গণতন্ত্র আর সোসালিজমের কথা মুখে বলেন বটে, কিন্তু আসলে কংগ্রেস গণতন্ত্র চান না। সোসালিজম ও চান না। চান রামরাজ্য।

সুভাষ চিন্তিত। সুভাষ উদ্বিগ্ন। সুভাষ দিশেহারা।

কিন্তু আমি যে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই। আমি যে— সুভাষ কেঁদে ফেললেন। আমি যে সবাইকে ভালবাসি।

রায় বোঝালেন।

এতে হতাশ হবার কিছু নেই। দুঃখ করার কিছু নেই। এই ত সুযোগ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু তরুণ বিপ্লবী, নেতা ও কর্মী আছেন। তাদের সুযোগ দিন। তাদের নিয়ে বিপ্লবী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে। এই সব ফ্যাসিষ্ট মনোভাব সম্পন্ন; বুড়ো' শালিকদের সরিয়ে দিন। সর্বত্যাগী তরুণ বিপ্লবী যোদ্ধা চাই। যারা বুকের রক্ত দেবে। সব আগে প্রাণ যে করিবে দান।

সুভাষ ইতঃস্তত করতে লাগলেন।

কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ার—রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী কোন দিনই তা ভুলবে না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জরুরী সভা; এই পার্কে ডাকা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন। এই দুঃসংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। কি সর্বনাশ। সুভাষ পদত্যাগ করবেন? বাংলার নয়নমণি সুভাষ।

বাংলার পথে ঘাটে; হাটে বাজারে; অফিসে আদালতে; এক কথা। এক আলোচনা। দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্র। কংগ্রেস সভাপতির পদ, স্বেচ্ছায় ছাড়ছেন। সবাই মৃয়মাণ। সবাই দুঃখিত। সারা বাংলায় শোকের কালো ছায়া; নেমে এসেছে। চারিদিক অন্ধকার। কোথাও আলো নেই।

সুভাষ চন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়ী। এম, এন, রায় খুব ভোরের এসে হাজির। পরদিন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে; জাতির ভাগ্য পরীক্ষা হবে। কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন বসবে।

অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝালেন সুভাষকে।

আপনি পদত্যাগ করবেন না। বিপ্লবী তরুণ আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আপনি তারুণ্যের প্রতীক। এ ভুল করবেন না।

অভিমানে ও মনোবেদনায়; সুভাষের চোখে জল এসে গেছে। ভাবপ্রবণ সুভাষ। একটিও কথা বলতে পারলেন না। নীরব রইলেন। শুধু চোখের দুকোণ বেয়ে টস্ টস্ করে অশ্রুধারা। দুই গণ্ডে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগলো। সে এক পবিত্র দৃশ্য।

আজ সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন।

সস্ত্রীক এম, এন, রায় সভায় এসেছেন। সোজা সুভাষের কাম্পে হাজির। আবার অনুরোধ।

আপনি ত্যাগী। আপনি কর্মী। আপনি বিপ্লবী। আপনি তরুণ ভারতের প্রতীক। ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন। বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র ধ্বংস করুন। আপনি সভাপতি থাকুন।

এম, এন, রায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ কোন কাজে এলোনা। লক্ষ মানুষের উৎকণ্ঠা ও আবেগের মধ্যে ; সুভাষ ঘোষণা করলেন। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে। বেদনামথিত হৃদয়ে।

আমি কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়লাম।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অস্থায়ী সভাপতির পদে নির্বাচিত হোলেন।

সুভাষ চন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন।

সেইদিন হতে। কংগ্রেসের কবর সৃষ্টি হোল। অন্ধ দেশ নেতারা দেখতে পেলেন না। জাতির দুর্ভাগ্য। কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরলো। সেই ক্ষুদ্র ফাটল। বৃহৎ জাহাজকে ডুবিয়ে দিল। কংগ্রেসের দম্ভ চূর্ণ হোল। আজ কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত।

ভারতের সর্বহারা শোষিত জনগণ চোখের জলে, সেই বিদায় দৃশ্য দেখলেন। সবাই দিশেহারা।

তাদের প্রিয় সুভাষ। তাদের একমাত্র আপন-জন সুভাষ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। সর্বহারা বঞ্চিতের আশা-ভরসা সুভাষ। চোখের জলে বিদায় নিলেন। সে দৃশ্য ভোলা যায়না। সে ছবি মুছবে না।

ভারতমাতা অদৃশ্যে চোখ মুছলেন।

রামগড়-কংগ্রেস—১৯৪০ সাল।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর। সুভাষ কংগ্রেস ছাড়লেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, খুবই ঘোলাটে হয়ে এল। চারিদিকে অনিশ্চয়তা। দেশে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড। রায়ের ওপর খুবই বিরক্ত। তাঁদের বিশ্বাস, রায়ের পরামর্শেই ; সুভাষ হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে গেছলেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ; রায়কে পছন্দ করলেন না। আস্তে আস্তে দূরে সরে দাঁড়াতে লাগলেন। রায় একঘরে।

আবার কংগ্রেসে নির্বাচন। এবার কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। মৌলনা আবুল কালাম আজাদ।

সুভাষের অবস্থা দেখে; কেউ আর আজাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পেলেন না। সবাই ভয় পেলেন।

এম, এন, রায় সাহস করে এগিয়ে এলেন।

কংগ্রেসে গণতন্ত্রের মৃত্যু হতে দেবনা। গণতন্ত্রের মর্যাদা; রক্ষা করবো। আমিই দাঁড়াব। আমি জানি। কায়েমী স্বার্থ। আমাকে ভোট দেবেন না। তবুও দাঁড়াব। এ নীতির প্রশ্ন।

রায়ের পেছনে; আদর্শবাদী মুষ্টিমেয়; তরুণ কংগ্রেস সেবী। তাঁরা বললেন,—আপনি দাঁড়ান। গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে খাড়া হোন।

শেষ পর্যন্ত ভোটাধিক্যে; এম, এম, রায় পরাজিত হোলেন। আজাদ জিতলেন। ফলাফল জানাই ছিল; সবাই বললেন। এ ত জানা কথা। হাইকমাণ্ডের ষড়যন্ত্র। কংগ্রেসে সাধারণ মানুষের স্থান নেই।

কিন্তু আশ্চর্য। ভোট গণনায় দেখা গেল। বাক্সে যত ভোট পড়েছে, তার এক দশমাংশ এম, এন, রায়ের পক্ষে। সবাই ভেবে ছিল। রায় একটাও ভোট পাবেন না।

কারা ভোট দিল? তাঁরা বিপ্লবী বামপন্থী। তাঁরা কংগ্রেসে রায়ের নেতৃত্ব চেয়েছিলেন।

কলকাতার প্রখ্যাত লিবার্টি কাগজ লিখলেন।

জাতির দুর্ভাগ্য। নির্বাচনে এম, এন, রায় হেরে গেলেন।

অগ্নিযুগের নির্যাতীত বিপ্লবী। দিল্লী এসেমব্লির সদস্য। বাংলার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। অমর চ্যাটার্জী বললেন—

কায়েমী স্বার্থ বিপ্লবীকে ভোট দিতে পারেনা।

কংগ্রেসের সহিত রায়ের মত বিরোধ :

সেদিন সকাল ; টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া কাগজে ; বড় বড় হরফে বেরিয়েছে। নেহেরুর প্রেস ইণ্টারভিউ।

১৯৪২ সালে ; 'ইংরাজ ভারত ছাড়' আন্দোলনে জহরলাল নেহেরুর দীর্ঘদিন কারাবাস হয়। জেল থেকে মুক্তির পর। এটাই তার প্রথম প্রেস ইণ্টারভিউ।

কার্ণিক সে দিনের একখানা কাগজ হাতে করে ; রায়ের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে আরও অনেকে ছিলেন।

এই দেখুন নেহেরুজী প্রেস ইণ্টারভিউতে কি বলেছেন। তাঁর কথা হোল। I do not like M. N. Roy's politics আমি এম, এন, রায়ের রাজ-নীতি পছন্দ করিনা।

রায় একটু হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন।

তিনি আমার রাজ-নীতিকে অপছন্দ করেন না। তিনি আমাকে অপছন্দ করেন। He dislikes me, not my politics.

আমি নেহেরুর রাজ-নীতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয় তাঁর কবি বা অভিনেতা হওয়া উচিৎ ছিল। He is a misfit in politics. আমি নেহেরুর রাজ-নীতিতে অসঙ্গতি লক্ষ্য করে আসছি।

তখন উপস্থিত সবাই উৎসুক হয়ে উঠলেন। সব কথা শোনবার জন্য।

রায় বললেন,—আপনাদের মনে আছে ১৯২৬ সালে ব্রুসেলসে ; সাম্রাজ্যবাদ বিরুদ্ধ লীগের পক্ষ থেকে ; একটা বিশ্ব-কংগ্রেস হয়েছিল ? নেহেরু হয়েছিলেন তার প্রেসিডেণ্ট। এই বিশ্ব-কংগ্রেস। আসলে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার একটা অংশ। সুতরাং মস্কোর চোখে। নেহেরু তখন কমিউনিষ্ট।

সে সময় মস্কো হোল বিপ্লবীদের মক্কা। ১৯২৭ সালে নেহেরু রাশিয়ায় গেলেন। বিপ্লবের দশম বার্ষিকীতে; তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি। তখন তার সঙ্গে আমার রাশিয়ায় আলাপ হয়।

১৯৩৬ সালে জেল থেকে আমি বেরুলাম। সেই দিন থেকে রাজ-নীতি ক্ষেত্রে; আমি কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করে আসছি।

আমি নেহেরুকে সব সময় বলতাম। রাজনৈতিক মুক্তি বড় কথা নয়। গণ-তান্ত্রিক রূপ বড় কথা। তারপর একদিন কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের কথা উঠলো। আমি নেহেরুকে বললাম; কংগ্রেসের প্রাইমারি কমিটিগুলিকে; জোরদার করতে হবে। প্রাইমারি কমিটিগুলিকে; পিপলস্ কমিটিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আর এই পিপলস্ কমিটির আদর্শ হবে গণতান্ত্রিক রাজ্য গঠন করা। পিপলস্ কমিটির নির্বাচিত প্রতিনিধি। ন্যাশনাল-কনভেনসন গঠন করবেন। ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের উহাই সংবিধান পরিষদ (constituent Assembly).

জহরলাল বললেন, একটা পরিকল্পনা দিন।

আমি একটা পরিকল্পনা দিলাম। বললাম, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এগুতে হবে, রাজনৈতিক প্রোগ্রাম। কি হবে, তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। দুঃখের কথা, জাতীয় স্বাধীনতার কি আদর্শ হবে। কি হবে তার সংজ্ঞা। জহরলাল সে বিষয়ে কোন দিনই কিছু বলেন নি।

তিনি মুখে বলতেন—তিনি সোসালিষ্ট। একবার একজন আমেরিকান ইউনাইটেড প্রেসের সাংবাদিককে বললেন—ভারতের আদর্শ হোল। Progressive Socialism উন্নতিশীল সমাজবাদ।

এমনি করে বেশ কিছু দিন কেটে গেল।

এবার দেশের সামনে প্রশ্ন উঠলো। জাতীয় স্বাধীনতার রূপ কি হবে। সেই সময় ক্রিপস প্রস্তাব এল। আমি বললাম—ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করুন।

নেহেরু বললেন—না, ক্রিপস প্রস্তাবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অথচ ওয়াভেল প্ল্যান—যেটা ক্রিপস মিশন ফিরে যাবার তিন বছর পর এল। যেটা বর্ণহিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়। দু'দলের মধ্যে, আসন বন্টনের ভিত্তিতে রচিত। কংগ্রেস তাই গ্রহণ করলেন।

পারেখ বললেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বললেন না কেন ?

এম, এন, রায় সহজভাবেই বললেন।

আমি গান্ধীবাদকে মধ্যযুগের নীতি বলে মনে করি। গান্ধীবাদ হোল। Revivalist nationalism এটা রাজনীতি নয়। ধর্ম প্রচারকের প্লাটফর্ম। গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা ; গান্ধীজীর রাজনীতি। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস।

গান্ধীজীর স্বাধীন ভারতের আদর্শ। রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সে আদর্শ মধ্যযুগীয় নয়। একেবারে পৌরাণিক। কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মঠ বা মিশন নয়। তা সকলকে বোঝাতে হবে।

সাধারণ মানুষকে, ধর্মের ভাওতা দিয়ে কিভাবে কংগ্রেস, ভুলিয়ে রেখেছে ; তার একটা উদাহরণ দিই। ১৯৫২ সালের নির্বাচন। আমি একটা পোলিং বুথে ; উপস্থিত ছিলাম। নিজের চোখে দেখলাম।

একজন ভোটার। ব্যালট বাক্সে ভোট দেবার আগে। ধান-দুর্বা দিয়ে ব্যালট বাক্সটিকে পূজা করলেন। তারপর করজোড়ে ভক্তিভরে নমস্কার করে, ব্যালট পেপারটি বাক্সের ভেতর অতি সন্তর্পণে ফেললেন। পরে ভক্তি গদগদ চিত্তে বেরিয়ে এলেন।

যে দেশে এই অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস। সে দেশের রাজনীতি কোন পথ চলবে। তা বুঝতে বেশী বিলম্ব হয় না।

নতুন দল গঠন :
র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি

রায় দেখলেন।

গান্ধীজী, জহরলাল, কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি, কৃষাণ সভা, কমিউনিষ্ট পার্টি ; আরও অনেকে, তাঁর বিরোধীতা করছেন।

রায় একাকী পথে এসে দাঁড়ালেন। কোথাও স্থান পাচ্ছেন না। কংগ্রেস নেতারা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। রায় ভেসে বেড়াচ্ছেন।

A planet without a visa. কোথাও স্থান নেই।

রায় স্থির করলেন। তাঁকে দমলে ; পিছিয়ে গেলে চলবে না। সকলের বিরোধীতা সত্বেও, তিনি সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী দল গড়বেন। মানবতার কল্যাণে। শোষিত জনগণের কল্যাণে।

প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। বুঝিয়ে দিলেন। কেন কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হলাম। কেন বিপ্লবী দল চাই।

সারা ভারতে এই সংবাদ ; দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়লো। রায় ও কংগ্রেস ছাড়লেন। বৃটিশ সরকার বোধকরি একটু মুচকে হাসলেন। মনে মনে খুসী হোলেন। বুকটা একটু হাল্কা হোল।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তখন কংগ্রেসী এম, এল, এ। দিল্লীর লেজিস্লেটিভ এসেমব্লির সদস্য। তিনিও কংগ্রেস ছেড়ে বেড়িয়ে এলেন। হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন।

আমরা বিপ্লবী। আমাদের অভিধানে পরাজয় নেই। আমরা বিপ্লবী দল গড়বো। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্।

মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, সব জায়গা থেকে টেলিগ্রাম আসছে। একখানা নয়, দুখানা নয় ; শত শত টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন। তারকুণ্ডে, কার্ণিক, মনিবেন্ কারা। টেলিগ্রাম আসছে, নিম্বকর, নিগম, বাজাজ, রাম সিংহ। সবার কাছ থেকে। স্রোত বয়ে যাচ্ছে। শুধু চিঠি আর টেলিগ্রাম।

এলেন হিম্ সিম্ খেয়ে যাচ্ছেন। টেলিগ্রামের হিসেব রাখতে আর উত্তর দিতে। উৎসাহের অন্ত নেই। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বাংলায় রায়ের অনুগামীর দল। একে একে, দুয়ে দুয়ে, শতে শতে। রায়ের সঙ্গে, দেখা করতে এলেন।

তার মধ্যে আছেন। চেনা অচেনা অনেকে। আছেন,—যতীন মিত্র, রজনী মুখার্জী, নৃপেন চৌধুরী, অনিল ব্যানার্জী, বরেন চ্যাটার্জী, স্বদেশ রঞ্জন দাস, হরিকুমার চক্রবর্তী, চৈতন চট্টোপাধ্যায়, শিব নারায়ণ রায়, কে. কে. সিংহ আরও কত।

সবার মুখে এক কথা।

বিপ্লবী দল গড়ুন। আমরা আপনার নেতৃত্ব চাই। এই উপযুক্ত সময়। সময় হোয়েছে নিকট এবার, বাঁধন ছিড়িতে হবে।

উত্তর কলকাতার একদল ছেলে, শোভাযাত্রা করে এল। তাদের সবার বুকে ; নতুন ধরণের ব্যাজ। তাতে লেখা Royist' তাদের নেতা ভূতনাথ মুখার্জী। তিনি বললেন—আমরা রায়পন্থী। আমরা বিপ্লবী। আমরা নতুন সমাজ গড়বো। আমরা পুরোন সমাজ ভাঙ্গবো।

রায়পন্থী। শুধু বাংলা আর কলকাতায় নয়। সারা ভারতে। দিকে দিকে রায় পন্থী দেখা দিলেন। সবার মুখে এক কথা।

রায়ের কর্মে ও জীবনে ; সে এক অবিস্মরণীয় দিন। সর্বত্র উৎসাহ। আর উত্তেজনা। সবাই নতুনের জয়গানে মুখরিত।

রায় বললেন,—বিপ্লবীদলের বৈপ্লবিক নীতি ও কর্মপন্থা থাকা চাই। বৈপ্লবিক প্রয়োগ কৌশল জানা চাই। সেই এক কথা।

রায় দেরাদুনে সবাইকে ডাকলেন।

উদাও কণ্ঠে বললেন,—বৈপ্লবিক পার্টির প্রয়োজন। নতুন করে, বৈপ্লবিক দর্শন, নীতি ও কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করে ; বিপ্লবী দল গড়তে হবে। আর একটা কথা। বৈপ্লবিক-নীতির ভুল প্রয়োগ হলে।

দেশে প্রতিবিপ্লব দেখা দিতে বাধ্য। যেমন ঘটেছিল। ১৯২৭ সালে চীন দেশে। নতুন পার্টির নামকরণ হোল : র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি।

পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস :

১৯৪০ সালের ২০ সে মে।

একটা জ্বলন্ত টর্চ হোল। পার্টির প্রতীক। তার মানে হোল। মানব-সভ্যতা। অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এই আলোক বর্তিকা তাকে পথ দেখাবে। World needs a new light.

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ :

অমর চ্যাটার্জীর সঙ্গে রায়ের কথা হচ্ছিল।

অমরদা, নেহেরু বুঝতে চাইলেন না। হিটলার ফ্যাসিষ্ট শক্তি। হিটলারের জয়লাভে, সভ্যতার আলো নিভে যাবে। ভারতের স্বাধীনতা পিছিয়ে যাবে। দেশের সর্বনাশ হবে।

হিটলারের মেন-ক্যাম্প Mein Kempf নিশ্চয়ই পড়েছেন। ল্যানডবার্গ জেলে বসে; এই বই লেখা। নাজী পার্টির বাইবেল। নির্লজ্জ জাতীয়তাবাদ। আর বিশ্বজয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সসাগরা ধরনীর অধীশ্বর হবে; নাজী জার্মান। আমি সব ইতিহাস বলি। শুনলে আশ্চর্য হবেন। তার বিশ্বজয়ের অভিযান।

১৯৩৩ সালের ২১ সে মার্চ : হিটলার সদম্ভে চ্যান্সেলারের গদিতে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির কর্মকর্তা; হিমলারকে আদেশ দিলেন,—ঝটিকা বাহিনী গঠন কর। আমরা আর্য। আমরা পৃথিবী জয় করবো। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।

১৯৩৪ সাল। মাত্র এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এক বছরে

ত্রিশলাখ জার্মান তরুণ, তাঁর দলে যোগ দিল। মিলিটারী ইউনিফরম পরিহিত। লক্ষ লক্ষ সুন্দর সুশ্রী তরুণ ছেলের দল। জার্মানীর শহরে শহরে, আর গ্রামে গ্রামে; কুচ কাওয়াজ করে বেড়াতে লাগলো। ড্রিল আর প্যারেড। যে দিকে চোখ ফেরাবেন, চোখে পড়বে শুধু স্বস্তিকা পতাকা। আর্য সভ্যতার প্রতীক। জার্মানীর জাতীয় পতাকা।

১৯৩৪ সালে; পার্টির স্বার্থে হিংস্র ও দুর্দান্ত গেষ্টাপো দল সৃষ্টি হোল। জার্মানীর গুপ্ত পুলিশ। হিটলারের বিরুদ্ধে কেউ কথাটি বলতে সাহস পাচ্ছেনা। যে কোন ষড়যন্ত্র অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হচ্ছে। দেশের মাটি রক্তে লাল হয়েছে।

এবার সৈন্য দলের সর্বময় কর্তৃত্ব। হাতে নিলেন স্বয়ং হিটলার। প্রতিটি সৈন্য আর সেনাপতি। হলফ্ নিলেন। হিটলারের সামনে, নতজানু হয়ে,—

ঈশ্বরের নামে শপথ করছি। আমি কায়-মনো-বাক্যে হিটলারের অনুগত থাকবো। ন্যায়-অন্যায় বিচার করবো না।

এবার দাম্ভিক হিটলার। গর্জে উঠলেন। ভার্সেলিস সন্ধি মানিনা। মানবো না। শত্রুর রক্তে মুক্তিস্নান করবো।

এমনি করে ১৯৩৮ সাল। পেরিয়ে গেল। সমগ্র জার্মানীতে সাজ সাজ রব। এই বুঝি যুদ্ধ বাধে। সবাই সচকিত। ইংলণ্ড ঘর-পোড়া গরু। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পেলেন।

তখন ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী—নেভিল চেম্বারলিন। বেচারী ছাতা মাথায় দিয়ে; ভিজতে ভিজতে মিউনিকে ছুটলেন।

ফুয়েহারের দপ্তর।

চেম্বারলিন বললেন,—ইংলণ্ড শান্তি চায়।

ফুয়েহার মুচকি হেসে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন।

জার্মানী যুদ্ধ চায়না।

কিন্তু হিটলার মনে মনে ভাল ভাবেই জানতেন। এ লেখার দাম কি। A scrap of paper. এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ।

চেম্বারলিন খুসী হয়ে; ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। তিনি নিশ্চিন্ত। হিটলার যুদ্ধ চান না। যাক, ইংলণ্ড রক্ষা পেলো।

১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট। সেদিন হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছেন। সবাই জানতে চান। কি হয়, কি হয়। সবাই উদ্বিগ্ন। জানালার সামনে; দাঁড়ালেন প্রধান মন্ত্রী। নেভিল চেম্বারলিন। হাসি হাসি মুখ। হাত তুলে অভয় দিলেন,—ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। এই দেখ হিটলারের স্বাক্ষর যুক্ত চুক্তি পত্র।

সবার বুক থেকে; ভারী পাথর নেমে গেল। ইংলণ্ডের লোক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। জনতা নিমেষে; মিলিয়ে গেল।

ইংলণ্ডকে হিটলার মিথ্যা-স্তোক্ দিয়েছিলেন। তা বলাই বাহুল্য। তখন পোলাণ্ড আক্রমণের সব ঠিক। হিটলারের হাতে, মোটা লাল পেনসিল। প্রথম দিনের এক নম্বর আদেশ। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯; ০৪৪৫ ঘণ্টায় পোলাণ্ড আক্রমণ করা হবে।

পোলাণ্ড বিন্দু মাত্র জানেনা। সে আক্রান্ত হবে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

তখনও রাতের অন্ধকার। জার্মান দস্যু ঝাঁপিয়ে পড়লো, পোলাণ্ডের বুকের উপর। মায়ের কোলে—শত শত নিরীহ শিশু। নিরাপরাধ মানুষ। অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে।

বুম্ বুম্ বুম্

রাতের অন্ধকার ভেদ করে, বিকট শব্দ। সর্ব ধ্বংসী কামানের আওয়াজ। সবাই সচকিত।

ওয়ারস নিমেষে ধ্বংস হোল। এক লাখ পোলিশ সৈনিক প্রাণ দিল।

বেতারে বি, বি, সি, ঘোষণা করলেন। পোলাণ্ড আক্রান্ত। ওয়ারশ বিধ্বস্ত।

মজার কথা। ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায়। ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত গণৎকার। ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। এ বছর যুদ্ধ হবে না।

বি, বি, সির বেতার ঘোষণা। পরদিন সকাল।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। আজ সকাল ১১. ১৫ মিনিটে। বেতারে জরুরী ঘোষণা করবেন। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

অত্যন্ত দুঃসংবাদ। চেম্বারলিন ভেঙ্গে পড়েছেন।

ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল।

যুদ্ধ ঘোষণার ছ'মাস পরের কথা।

৯ই এপ্রিল; ১৯৪০ সাল। দেনমার্ক ও নরওয়ে। দুটি শান্তিপ্রিয় জাতি। হিটলারের কামানের পালার মধ্যে এসে গেছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হোল না। তাদের দেখান হোল। পোলাণ্ডের রক্ত-ক্ষয়ী-ছবি। যুদ্ধের সিনেমা ফিলিম্। তাই দেখে। দেনমার্ক ও নরওয়ে ভয়ে আত্ম-সমর্পণ করলো।

১০ই মে ১৯৪০ সাল। জার্মানীর নতুন ব্লীজ ক্রগ শুরু। হলাণ্ড, বেলজিয়ম আর লুকসেমবার্গ আক্রান্ত। বেলজিয়াম বাধা দিতে গেল। অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভন-বকের আটাশ ডিভিসন সৈন্য, ক্ষুদ্র বেলজিয়াম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র হতে মুছে গেল।

এবার ফ্রান্সের পালা। ফ্রান্স বুকে বল নিয়ে বসে আছে। ভয় কি? তার আছে; দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন। ম্যাজিনো লাইন। ভেদ করে কার সাধ্য। শত হিটলারের সাধ্য নেই। জার্মান সেনাপতিরাও ভাবিত। কিন্তু ফুহরারের কড়া আদেশ। ফরাসীর অবিলম্বে পতন চাই। কোন বাধা মানা হবে না।

এদিকে মিত্র শক্তির আর এক বিপদ।

বেলজিয়াম উপকূলে; ডানকার্কে বৃটিশ সৈন্য সম্পূর্ণ ঘেরাও।

তাদের বাঁচাতে হবে। তিন লাখ বৃটিশ সৈন্য। অদ্ভুৎ কৌশলে তাদের ইংলণ্ডে ফিরিয়ে আনা হোল। ডানকার্কে এই অসাধ্য সাধন করা হয়। মিলিটারি ইতিহাসে। এই ঘটনা। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফরাসীর আছে বিশ লাখ শিক্ষিত সৈন্য। তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। জার্মান দস্যুদের বাধা দেবে। কিন্তু জার্মান সৈন্যরা। ম্যাজিনো লাইনের ধার দিয়েও গেল না। তারা অন্য দিক থেকে ফ্রান্সকে আক্রমণ করলো। জার্মানীর প্যানজার ডিভিসন। পিল পিল করে ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সে দিকটার কথা ফ্রান্স ভাবে নি।

১৫ই মে, ১৯৪০ সাল:

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী—উইনসটন্ চার্চিল। তখনও ঘুমুচ্ছেন। কানের কাছে টেলিফোন। সশব্দে বেজে উঠলো। তখন শেষ রাত্রি।

আমি পল্ রেনড্ বলছি।

গলার স্বরে মনে হোল, তিনি দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা।

We have been defeated. We are beaten. We have lost the battle. আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। আমরা হেরে গেছি।

চার্চিলের বিশ্বাস হচ্ছে না। এ অসম্ভব! ফরাসী এভাবে হারতে পারে না। সত্যিই ফরাসীর পরাজয় হয়েছে। ফরাসী আত্ম-সমর্পণ করতে চলেছে। চার্চিল ছুটে ফ্রান্সে এলেন। ফরাসীর আত্মসমর্পণ? অসম্ভব! মার্শাল পেঁতা নিরুপায়। চার্চিল রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

১৪ই জুন, ১৯৪০ সাল।

জার্মান সৈন্য সগর্বে প্যারিসে প্রবেশ করলো। বিজয়ী হিটলার। মদগর্বে স্ফীত। তিনি সদল বলে প্যারিসে এলেন।

জার্মানীর সর্বত্র জয়ের উল্লাস। ঘরে ঘরে আলোক সজ্জা। হাসি আনন্দ আর উৎসব। ফরাসী পদানত।

ম্রিয়মাণ ফ্রান্সের জনগণ। আত্মসমর্পণের জন্য ফ্রান্স প্রস্তুত।

দেখাগেল প্যারিসের রাজপথে দশখানা মোটর ছুটেছে। সব গাড়ীতে সাদা নিশান উড়ছে। ফরাসী মাথা নীচু করে আত্ম-সমর্পণ করতে চলেছে। জার্মান সময়, কাঁটায় কাঁটায়, পাঁচটায় সন্ধি পত্রে স্বাক্ষরিত হবে। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

ফরাসীর সঙ্গে অবমাননাকর সন্ধির কথা। হিটলার ভাবছিলেন। প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ!

বাইশ বছর আগের কথা। হিটলারের মনে পড়লো। সেদিন জার্মানী পরাজিত হয়েছিলেন ফ্রান্সের হাতে। যে গাড়ীতে বসে সেই সন্ধিপত্রে বাইশ বছর আগে; স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক গাড়ীখানা। তখনও ফ্রান্সের এক বৃহৎ শহরে রক্ষিত ছিল। হিটলার গম্ভীর ভাবে আদেশ দিলেন,—সেই গাড়ী নিয়ে এস। সেই গাড়ীতে বসে। সন্ধি পত্রে স্বাক্ষরিত হবে।

হিটলারের চোখের সামনে ভেসে উঠলো কাইজারের মুখ। ১৯১৮ সাল। পরাজয়ের গ্লানি সর্বাঙ্গে মেখে; মাথা নীচু করে; জার্মানী দাঁড়িয়ে ছিল; সন্ধি টেবিলের সামনে।

ফরাসীর মার্শাল ফস্। বিজিত জার্মানীকে অবমাননাকর শর্তে; সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন।

আজ বাইশ বছর পরে। সেই একই স্থানে; সেই একই গাড়ীতে; সেই একই আসনে বসে; হিটলার তার প্রতিশোধ নিলেন।

ভার্দুনের বিজয়ী মার্শাল পেঁতা। মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন। হিটলারের সামনে। পদানত ফরাসী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন। অবমাননাকর শর্ত। অদৃষ্টের পরিহাস। হিটলার মুচকে একটু হাসলেন।

২২শে জুন, ১৯৪১ সাল। বিশ্ব যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংবাদ। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করেছে। সংবাদ শুনে, বারনার্ড শ, বললেন,—এবার আমরা হাসতে পারি।

১৯৩৯ সালে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হোয়েছিল। হিটলার দেখলেন অতিকায় রাশিয়া সেই চুক্তিপত্রের সুযোগ নিয়েছে। তার লক্ষ্য জার্মানীর পথের দিকে। অতএব তাকে খতম কর।

সেদিন রবিবার; রাত্রি বারোটা বেজে এক মিনিট। জার্মানী অতর্কিতে তিন দিক থেকে; রাশিয়াকে আক্রমণ করলো। তিন দলে; জার্মান সৈন্য বিভক্ত হয়েছে। পঙ্গপালের মত লক্ষ লক্ষ জামন সৈন্য ছুটেছে। রাশিয়ার ভেতরে।

একজন জার্মান যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ বললেন,—Panzar will go through Russia as knife goes through butter.

রাশিয়া হতবুদ্ধি। এমন কথা ত ছিল না। ষ্টালিন বিব্রত। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তাই ষ্টালিন গর্জে উঠলেন,— Nepoleau was a tiger, Hitler is a cat. নেপোলিয়ান ছিলেন বাঘ। হিটলার একটা বেড়াল। বাঘকে তাড়িয়েছিলাম। বেড়ালকে ভয় করিনা।

মাত্র এক রাত্রির মধ্যে হিটলারের সৈন্য বাল্টিক রাজ্য দখল করলো। রাশিয়ার ভেতর অর্ধেক ঢুকে গেল। তবু হিটলারের ভয়। রাশিয়ার ভালুককে বিশ্বাস নেই। ১৮১২ সালের কথা মনে পড়লো। নেপোলিয়ানকে পালাতে হোয়েছিল। এই ভালুকের দেশ থেকে। তাঁর লক্ষ সৈন্যের এখানে কবর হয়। পৃথিবী আজও তা ভোলেনি।

কিন্তু তখন হিটলারের রক্তে সর্বনাশের নেশা লেগে 'গেছে।

উভয় পক্ষে সৈন্য সাজান হোয়েছে।

ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম ভন্‌লীবের অভিযান শুরু; লেনিনগ্রাদ

অভিমুখে। তাঁকে বাধা দিতে দাঁড়ালেন ভরোসিলভ। ভরোসিলভকে সাহায্য করতে এল দুর্ধর্ষ সৈন্য দল। সাইবেরিয়ার দুর্গম মরুপ্রান্তর থেকে। কয়েক ডিভিস্‌ন সৈন্য।

মাঝপথ আক্রমণ করলেন দুর্দান্ত জার্মান সেনাপতি, ফিল্ড মার্শাল ভন্‌বক্‌। তাঁর সঙ্গে ত্রিশটি পদাতিক বাহিনী। পনেরোটি প্যানজার ডিভিসন। এক ডিভিসন অশ্বারোহী সৈন্য। তাঁকে বাধা দিতে রুখে দাঁড়ালেন। রাশিয়ার দুর্ধর্ষ বীর-সেনাপতি, মার্শাল টৈমাশঙ্কো। যুদ্ধে অজেয় সেনাপতি।

হিটলারের লক্ষ্য ইউক্রেণ। ককেসাসের পথ চাই। তাহলেই বাকু তেলের খনি গ্রাস করা হবে। জুলাই মাসটা বেশ চললো। মাইলের পর মাইল; জয় হোল। অভূতপূর্ব জয়ের উল্লাসে জার্মান সৈন্য ছুটেছে, বাধা মানছে না।

এবার জার্মান সৈন্য, মস্কোর দরজায়। ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছে। প্রচণ্ড ভাবে বাধা দিল লাল ফৌজ। জীবনপণ করে দাঁড়িয়েছেন। মার্শাল জুকভ—ষ্টালিনের ডান হাত।

প্রচণ্ড শীত আর অবিশ্রান্ত বরফের বৃষ্টি, শুরু হয়ে গেল। হাজারে হাজারে জার্মান সৈন্য মরতে আরম্ভ করলো। যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেল। হিটলারের সেদিকে লক্ষ্য নেই। মস্কো দখল করতে হবে,—যে কোন মূল্যে। মানুষ পশুর অধম হয়েছে।

হিটলারের সৈন্যদল প্রায় লক্ষ্যে পৌছে গেছে। ঐ দূরে ক্রেমলিনের চূড়া দেখা যাচ্ছে না? চল, চল, মস্কো চল।

মস্কোর পতন হয় হয়। যে কোন মুহূর্তে পতন হতে পারে। আর রক্ষা নেই। চারিদিকে রব উঠেছে; মস্কো গেল, মস্কো গেল। বাঁচাও, বাঁচাও। শেষ সংবাদের জন্য পৃথিবী উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছে। সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। সেই চরম খবরটির জন্য। এই পর্যন্ত বলে রায় চুপ করলেন।

এই বিশ্বযুদ্ধে; পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত হোল। মিত্র শক্তি

আর অক্ষ শক্তি। ভারত তখন পরাধীন। ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ইংরেজ ঘোষণা করলেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ জানালেন। এবার আন্দোলন শুরু। দেশব্যাপী আন্দোলন।

৯ই আগষ্ট—১৯৪২ সাল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গর্জে উঠলেন,—'ইংরেজ, ভারত ছাড়'। এই সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী সেনাপতি। ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত। বৃটিশ বিদ্বেষে ফেটে পড়লো।

মেদিনীপুর জেলার, তমলুক মহাকুমা। বাহান্নটি থানায় কংগ্রেস রাজ কায়েম হোল। পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী আর তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু সতীশ সামন্ত। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেই অহিংস সংগ্রামে। এসেছে সে একদিন।

এক লাখ লোক কারাবরণ করেছে। জীবন তুচ্ছ।

তমলুকে মিলিটারী পুলিশ ছুটে এসেছে। তারা মাতঙ্গিনী হাজরাকে গুলি করলো। মাটিতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর হাতে, জাতীয় পতাকা। তমলুকের মাটি লাল হোল। মাতঙ্গিনীর রক্ত দিয়ে লেখা হোল; ভারতের নতুন ইতিহাস।

মানুষ ফেটে পড়েছে বিক্ষোভে। মাইলের পর মাইল; রেলওয়ে লাইন, উপড়ে ফেললো। কেটে দিল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার। সর্বত্র অরাজকতা; দেশের শাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়লো।

বৃটিশ সিংহাসন টলমল করছে। তাসের ঘর এই বুঝি ভেঙে পড়ে। জার্মান সৈন্য আরও উগ্র, আরও ভীষণ, আরও হিংস্র। বৃটিশ সিংহের টুটি কামড়ে ধরেছে। লণ্ডন মহানগরী চূর্ণ বিচূর্ণ। লুফৎওয়েফের আক্রমণে সব ধূলিসাৎ। ইউ-বোট্‌ জলপথে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। ইংরেজকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করবেন হিটলার।

কিন্তু ইংরেজের পরাজয়ে ভারতের মুক্তি আসবে কি?

এবার রায় বললেন,—দেশের লোক চাইছে, ইংরেজের পরাজয়। জার্মানীর জয়। আমি দেখলাম জার্মানীর জয়লাভে গণ-তন্ত্রের কণ্ঠ-রুদ্ধ হবে। ভারতের মুক্তি আসবে না। পৃথিবীর অগ্রগতি থেমে যাবে। বিশ্বে নেমে আসবে দাসত্বের যুগ। সভ্যতার চাকা পিছিয়ে যাবে। হিটলার সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবেন। কিন্তু দেশের লোক, আমাকে ভুল বুঝলো।

জহরলালের সঙ্গে আবার দেখা করলাম।

১৯৪১ সালের, ডিসেম্বর মাস। জাপান কলকাতায় প্রথম বোমা ফেললো। সুভাষ বসু তখন প্রত্যহ টোকিও রেডিও থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন,— আমি সুভাষ বলছি।

জহরলালকে বোঝালাম। জাপানকে বাধা দিন। কলকাতা থেকে সবাই পালাচ্ছে। শহর একেবারে ফাঁকা হয়ে এল। আমি কলকাতার পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিলাম। পলায়মান জনস্রোত রুদ্ধ হোল। রাজা গোপালাচারী কাগজে লিখলেন,—what does it matter who wins or fails ? গান্ধীজীরও বিশ্বাস জাপান ভারত জয় করবে। তবে তার সঙ্গে পরে একটা সন্ধি করলেই হবে।

তখন আমি বল্লাম,—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসন্ন। কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আপনারা ফ্যাসিষ্টদের রুখুন। ফ্রান্সের অবস্থা দেখেও, চৈতন্য হচ্ছে না।

কেউ আমার কথা শুনলেন না। আমি একাই আন্দোলন শুরু করলাম। নতুন কাগজ বার করলাম। দৈনিক কাগজ, ভ্যানগার্ড। দিনের পর দিন লিখতে লাগলাম।

১৯৪২ সালে লক্ষ্ণৌতে র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির প্রকাশ্য অধিবেশন হোল। আমি সেখানে খোলাখুলি ভাবে বললাম। এ যুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তির পরাজয় অনিবার্য।

সে সময়কার ইণ্ডিপেনডেণ্ট ইণ্ডিয়া কাগজে আমি লিখতাম ; মস্কোর পতন হবে না। হতে পারে না। মস্কো অজেয়। ষ্টালিনগ্রাদের

যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। তবু সবাই আমাকে তীব্র নিন্দা করলেন। আমি ইংরেজের দালাল। আমি দেশদ্রোহী আরও কত কি। শুধু কুৎসা আর নিন্দা।

তখন অমরদা বললেন,—বেশ তুমি না হয় দেশদ্রোহী ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে তুমি কি বলবে ? অগ্নি যুগের প্রাণ-পুরুষ। পণ্ডিচেরীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি যুদ্ধ ভাণ্ডারে স্বেচ্ছায় দান করলেন ; পাঁচ হাজার টাকা। সেটা ১৯৪৩ সাল। শুধু টাকা দিলেন না। তিনি লিখলেন।

Even if I knew that the allies would misuse their victory or bungle peace...I would still put my force behind them. At any rate things could not be hundredth part as bad as they would be under Hitler.

শ্রীঅরবিন্দ আরও কি বলেছিলেন জান ? এ যুদ্ধ। দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ। ভারত ও পৃথিবীকে দাসত্ব ও নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করতে হলে, হিটলারের পরাজয় নিতান্ত দরকার।

একটু চুপকরে অমরদা বললেন,—জাতীয় মনোভাব সম্পন্ন, বহু শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছি। শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে ; সবাই বিস্ময়ে হতবাক। শ্রীঅরবিন্দ বলেন কি ? কিন্তু তাঁকে ত দেশদ্রোহী বলা চলে না। তাঁকে ত বলা চলেনা ইংরেজের দালাল। তাই তো ? সবাই একটু ধোঁকায় পড়লেন।

এত বাধার মধ্যেও এম, এন, রায় চুপ করে বসে ছিলেন না।

তিনি ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে গেলেন। নির্ভীক, কঠোর ও ভাবাবেগশূণ্য ভাষায় ; কেন আমরা মিত্রশক্তিকে সমর্থন করবো।

কেউ হাসলো ; কেউ টিটকিরি দিল ; কেউ ব্যঙ্গ করলো।

আবার একদল সুস্থির, যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ বললেন, রায়ের কথাই ঠিক। হিটলার ফ্যাসিষ্ট শক্তি।

র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি'র কলিকাতা কন্‌ফারেন্স

১৯৪৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ;

ওয়েলিংটন স্কোয়ার। র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি'র অধিবেশন বসেছে। সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান। বিরাট প্যাণ্ডেল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ; বহু ডেলিগেট এসেছেন। দর্শক ও ডেলিগেটের সংখ্যা পাঁচ হাজার। অভূতপূর্ব ব্যবস্থা।

সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। পুণার লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী। অভ্যর্থনা কমিটির সব দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রবীণ জননায়ক অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় আর হরিকুমার চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে রায় মিত্রশক্তিকে সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন। তাই রায়ের জনপ্রিয়তা ; কংগ্রেস ও সাধারণ মানুষের কাছে বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। অথচ বিরাট ;সর্বভারতীয় কন্‌ফারেন্স। রায় কোলকাতার বুকের ওপর ডেকেছেন। শহরে সাড়া পড়ে গেছে।

সভার প্রারম্ভে রায় নির্ভীক, কঠোর, ও আবেগবিহীন কণ্ঠে ভাষণ দিলেন। একই কথা। গণ-তন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিষ্টবাদের নামান্তর। সবাই মনোযোগ দিয়ে রায়ের ভাষণ শুনছেন। কোন দিকে কোন গোলমাল নেই। শুধু রায়ের গলা গমগম করছে। জনতা মন্ত্রমুগ্ধ।

হঠাৎ প্যাণ্ডেলের উত্তর দিক থেকে ; অবিশ্রান্ত ইষ্টক বৃষ্টি শুরু। প্যাণ্ডেলের এক কোণে আগুন লেগে গেল। দর্শকরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মিটিং ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র। রায় নির্বিকার, অবিচলিত। শুধু মাইকে বললেন—আপনারা স্থির হয়ে বসে থাকুন। কেউ উঠবেন না। দর্শকরা বসে রইলেন। ভলানটিয়ার দল ছুটলেন। গোলমাল থেমে গেল। আবার সভার কাজ সুষ্ঠভাবে চলতে লাগলো। বক্তার পর বক্তা। ভাষণ দিতে লাগলেন। অপূর্ব সে ভাষণ।

বম্বে হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি। তারকুণ্ডে ভাষণের শেষে বললেন : Comrade M. N. Roy is our spiritual father : কমরেড এম, এন, রায় আমাদের আধ্যাত্মিক আদি পুরুষ।

রায়ের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি; তারকুণ্ডের কণ্ঠ আশ্রয় করে, কেমনে অজ্ঞাতে বেড়িয়ে এল। সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। লেখক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ। রায়ের দর্শন ও প্রয়োগ-কৌশল বুঝতে চান। রায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। আগ্রহের অন্ত নেই। বক্তৃতার ফুলঝুরি নয় কাজ দিয়ে রাজনীতির বিচার হবে। Scientific politics alone can lead India to freedom.

কোলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র; কনফারেন্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। একটু বিব্রত বোধ করলেন।

ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন-অব-লেবর

(১৯৪১—১৯৪৮)

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জোর চলেছে। নতুন ভাবে ট্রেড-ইউনিয়ন ফ্রণ্টে কাজ করার কথা; রায় চিন্তা করলেন। এই বিষয় আলোচনা করবার জন্য; রায় কোলকাতায় এসেছেন। একটা পার্টি মিটিংএ; সবাই একত্রিত হোলেন।

সেই পার্টি মিটিংএ, নিম্বকর, কার্নিক, যতীন মিত্র, রজনী মুখার্জী, অনিল ব্যানার্জী, নৃপেন চৌধুরী ও আরও অনেকে আছেন।

রজনী মুখার্জী বললেন,—শ্রমিক ফ্রণ্টে নতুন আদর্শে, কাজ করতে হলে; একটা সর্বভারতীয় শ্রমিক সংস্থা গড়া দরকার।

রায়েরও সেই মত। তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, ইউ, পি, বিহার

সর্বত্র ঘুরলেন। জনমত সংগ্রহ করলেন। নতুন আদর্শে একটা কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা গড়ে উঠুক। সবাই তাই চান।

১৯৪১ সালে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন-অব-লেবরের জন্ম হয়। সম্পূর্ণ গণ-তান্ত্রিক সংস্থা। সভ্য সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেল। দেশের শ্রমিক কেন্দ্রে ; এই প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। জেনেভায় শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠাবার যোগ্যতা অর্জন করে।

ভারত সরকার রায়কে লিখলেন।

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক উপদেষ্টা, ও তাঁর সহকারী নিযুক্ত করতে চান। আপনি এই পদে নাম সুপারিশ করতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবরের সুপারিশ ক্রমে নিম্বকর ও যতীন মিত্র, যথাক্রমে শ্রমিক উপদেষ্টা ও সহ-শ্রমিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হোলেন। নতুন আদর্শে কাজ আরম্ভ হোল।

শ্রমিক সমাবেশে রায় বলতেন,—যারা সর্বহারা, তারাই সর্বশক্তির উৎস। শুধু অধিকার নিয়ে চেঁচালে হবে না। দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাদের সচেতন থাকতে হবে।

এই ভাবে আট বছর চললো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে, এই প্রতিষ্ঠান চালান সম্ভব হয়নি। ১৯৪৮ সালে। হিন্দ-মজদুর সভার সঙ্গে; ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবর, মিলে গেছে। উভয়ে আজও একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে এম, এন, রায় ঃ

এক দিনের কথা ঃ

এলেন জার্মানী থেকে রায়ের অনেক ভাল ভাল গ্রুপ ফটো নিয়ে এসেছেন। সেগুলো রাশিয়ায় তোলা। ওরই মধ্যে, একখানি অতি চমৎকার গ্রুপ ফটো। তাতে আছেন। লেনিন, ষ্টালিন ও এম, এন, রায়। চোখে পড়বার মত! এলেন সেই সুন্দর ফটোখানি ;

দেরাদুনের বাটিতে টাঙ্গিয়েছেন। একদিন রায় ঘরে বসে সবার সঙ্গে গল্প করছেন। ঘরে অধ্যাপক নিগম, বরেন চ্যাটার্জী, কার্ণিক, আরও কে কে আছেন।

হঠাৎ নিগম বললেন,—মিঃ রায়, এই ফটোখানি ভারী সুন্দর। কবে তুলেছিলেন ?

এই ফটোর প্রতি; এর আগে রায়ের দৃষ্টি পড়েনি। ফটোর দিকে তাকিয়ে; রায় রেগে লাল। কে ঘরে এই ফটো টাঙ্গাল ? এলেন ভয়ে এতটুকু। রায় কোন কথা না বলে; ফটোখানা খুলে, ভেঙ্গে, ছিড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। বন্ধুরা অবাক হোলেন। কিন্তু রায় কোন দিনই; এইভাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইতেন না। রায়ের বলিষ্ঠ চরিত্রের এটা আর একটা দিক।

অভাব অনটন ছিল রায়ের নিত্য-সঙ্গী।

দৈনন্দিন জীবনে; অভাব, অনটন ও দারিদ্র রায়ের নিত্য সঙ্গী। পূর্বে খবর না দিয়ে; কোন অতিথি বাড়ীতে এলে; তাঁর অত্যন্ত অসুবিধা হোত। খেতে দেবার কিছু থাকতো না। উত্তর পাড়ার বরেন চ্যাটার্জী। কোন সংবাদ না দিয়ে, একবার দেরাদুনে, রায়ের অতিথি হোয়েছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বরেন বললেন,—১৯৫২ সালে; পার্টির এক বিশেষ কাজে আমাকে দেরাদুনে যেতে হয়। হঠাৎ গেছি। পাশের ঘরে বসে আছি। কানে এল। এলেন বলছেন,—ঘরে ত কিছু নেই। অতিথিকে খাওয়াবে কি ? রায়ের কথাও কানে এল। নির্বিকার চিত্তে রায় বললেন,—প্রফেসার নিগমকে খবর দাও। সেই রাতের ব্যবস্থাটা করে দেবে। তখনই নিগমকে খবর দেওয়া হোল। আমার আর কোন অসুবিধা হয় নি।

ঘটনাটি সামান্য! কিন্তু মর্মান্তিক!

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। বিশ্ব বরেণ্য বিপ্লবী মহা-নায়ক মানবেন্দ্রনাথ। কত অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন। এর থেকে বোঝা যাবে। রায়ের ছিল মহা-সাধকের জীবন। যেন সাংখ্যের

পুরুষ। কোন কিছুতেই বিচলিত হোতেন না। মানবেন্দ্র নাথের জীবনে গীতা যথার্থই মূর্ত হোয়ে উঠেছিল।

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা : সুখেষু বিগত স্পৃহ :
বীত রাগ ভয় ক্রোধ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে।

নরেন, তুমি ঈশ্বর মানো ?

দুই বিপ্লবীতে একদিন কথা হচ্ছে। কলেজ স্কোয়ারে; শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের, ছোট ঘরটিতে। আনন্দ বাজার পত্রিকার; সুরেশ মজুমদার আছেন। তা ছাড়া আছেন, অমর চ্যাটার্জী, এম, এন, রায়, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, আরও দু'চার জন। চায়ের মজলিস। বেশ জমে উঠেছে। হাল্কা হাসি আর গল্প চলছে। ঘরোয়া বৈঠক।

হঠাৎ অমর চ্যাটার্জী বলে বসলেন।

আচ্ছা নরেন, তুমি ঈশ্বর মানো ?

প্রশ্নটি নিছক পরিহাস, কল্পনা করে, এম, এন, রায় হাসতে লাগলেন।

আমি কিন্তু ঈশ্বর মানি। তোমাকে আমার; অ্যাবস্কণ্ডিং পিরিয়ডের; একটা অদ্ভুত গল্প বলবো। অনেকের বিশ্বাস হবে না। কিন্তু সত্যি। করুণাময়ের অসীম করুণা উপলব্ধি করলাম।

সেটা ১৯১৮ সাল। ফেরার অবস্থায়; পালাতে পালাতে; আসামের এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলে গিয়ে পড়েছি। সঙ্গে চার জন বিপ্লবী অনুগামী। জায়গাটার নাম জানিনা। হঠাৎ বুঝলাম। এই দুর্গম পথের সন্ধান ও পুলিশ পেয়েছে। আমরা ঘেরাও হয়েছি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। রাত্রি কাল। হঠাৎ পুলিশ গুলি ছুড়তে আরম্ভ করলো। আমরা শুয়ে পড়লাম।

বিপ্লবী বন্ধুরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে তার উত্তর দিলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড ভাবে গুলির বিনিময় হোল।

কিছুক্ষণ পরে মনে হোল। পুলিশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

তখন আমি উল্টো দিকে। ছুটতে আরম্ভ করলাম। মরিয়া হোয়ে রাতের অন্ধকার ছুটেছি। চারিদিকে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। কোথায় চলেছি জানি না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটেছি। আর পারি না। ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লাম। একটা গাছের তলায় পড়ে গেলাম। আর চলতে পারি না।

ঘন বন। দুর্ভেদ্য জঙ্গল। গাছের তলায় পড়ে আছি। কতক্ষণ পড়ে আছি, তাও জানিনা। জ্ঞান হোল। কিছুই মনে করতে পারছিনা। কোথায় আমি? শুধু ভাবছি। এ কোথায় এলাম। জায়গাটির কি নাম। তাও জানিনা। অজানা-অচেনা পথ। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। যতদূর দৃষ্টি যায়; ঘনকৃষ্ণ বন। আর গভীর জঙ্গল। পথ-ঘাটের চিহ্ন মাত্র নেই। সমূহ বিপদ। জীবনটা একটা সরু রেশমী সূতায় ঝুলছে॥ ধরলেই ফাঁসী। আমার মাথার ওপর কয়েক হাজার টাকা ধার্য আছে।

হঠাৎ একটা বাঘের ডাক্। চমকে উঠলাম। একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বল জ্বল করছে।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। বাঘ আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইছে। তারপর আস্তে আস্তে; চলতে আরম্ভ করলো। সেই বন-পথ ধরে। বাঘ চলছে। লেজ নাড়তে নাড়তে। যেন বলছে,—আমার সঙ্গে এস।

আমিও বাঘকে অনুসরণ করলাম। আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছি। বাঘ আমার কাছ থেকে; মাত্র বিশ কি পঁচিশ হাত দূরে। ইচ্ছে করলে; এক লাফে আমার ঘাড় মটকাতে পারে।

কিন্তু কই? বাঘের চোখে ত কুটিল হিংস্র দৃষ্টি নেই। বাঘ চলেছে। আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ফিরে দেখছে। আমি ঠিক বাঘকে অনুসরণ করতে পারছি কিনা। যেন বলছে,—ভয় কি? চলে

এস। বাঘের চোখের ভাষা। যেন বুঝতে পারলাম। আমার পরম বন্ধু। মনে হোল বাঘ রূপী নারায়ণ।

তারপর এ জঙ্গল, সে জঙ্গল। বাঘ পার হোল। আমিও চলেছি। বাঘের পিছু পিছু। এ পথ, সে পথ। কত পথ ঘুরলো। দীর্ঘ পথ। দুজনে চলেছি। কতক্ষণ চলেছি। মনে নেই।

হঠাৎ সামনে দেখলাম। একটা ছোট নদী। ভাবলাম কি করে নদী পার হব। বাঘ ও দাঁড়িয়ে গেল। একবার পেছনে ফিরে; আমার দিকে তাকাল। তারপর জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। আমিও বাঘের ঠিক পেছনে পেছনে; নদী পার হলাম। আশ্চর্য! যেন নেশার ঘোরে চলেছি।

অনেক ক্ষণ চলেছি। বাঘের নির্দিষ্ট পথে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়লো; দূরে উচু রেলওয়ে লাইন। বাঘ সেই রেলের লাইনে লাফিয়ে চড়লো। আমি রেলের লাইনে এসে দাঁড়ালাম। আরও আশ্চর্য। বাঘ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ডিস্‌টেণ্ট সিগলানের দিকে। দেখলাম সিগনাল ডাউন হয়েছে। সবুজ আলো। এখনই ট্রেন আসবে। বাঘ সবুজ আলোর দিকে দুবার তাকাল। তারপর তাকাল। আমার মুখের দিকে। শেষে মারলো একটা প্রকাণ্ড লাফ। সম্মুখে আর একটা ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে মুহূর্তে বাঘ অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন বলে গেল,—এই পথে পালাও। সামনেই রেলওয়ে ষ্টেসন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন এসে পড়লো। আমি ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমিও নিশ্চিন্ত। সে যাত্রা রক্ষা পেলাম।

এইবার অমরদা বলেন—এ কে তোমরা কি বলবে?

রায় চুপ করে গেলেন।

এই গল্পটি আমরা অমর চ্যাটার্জীর মুখে শুনেছি।

বিগত ২৪।১।৭১ তারিখে, রবিবারের যুগান্তরে; এই ঘটনা সম্পর্কে একটা লেখা বেড়িয়েছে দেখলাম।

র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির দেরাদুন রাজ-নৈতিক শিক্ষা শিবির ঃ

রায়ের সেই এক চিন্তা। বিপ্লবী মানুষ তৈরী করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটেরিয়েটে রায় কথাটা তুললেন। আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির খুলতে হবে। সকলকে জ্ঞানের বৈতরণী পার হতে হবে। তারপর সেই জ্ঞান ও বিপ্লবী শিক্ষা ধারা ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেব। হাজার হাজার বিপ্লবী মানুষ তৈরী হবে। তাছাড়া পথ নেই। নান্য পন্থা বিদ্যতে।

পার্টি সদস্যেরা। খুবই উৎসাহ বোধ করলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে; ১৯৪০ সালের ২০শে মে তারিখে, দেরাদুনে প্রথম রাজ-নৈতিক শিক্ষা শিবির উদ্বোধন করা হোল।

বহু শিক্ষার্থী এলেন। তাদের সংখ্যা প্রায় একশো। সবাই শিক্ষিত। সবাই চিন্তাশীল। সকলেরই জিজ্ঞাসু মন। সবাই পরিচিত হোতে চান। বিপ্লবী চিন্তাধারার সঙ্গে।

রায় বললেন।

শিক্ষা শিবিরে আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে। নির্ভুলভাবে চিন্তা করতে শিক্ষা করা। First we must learn to think. রাজনৈতিক চিন্তাধারা। তার প্রয়োগ কৌশল। ছাত্র হিসেবে; আমাদের আয়ত্ব করা দরকার। নতুবা মারাত্মক ভুল দেখা দিতে পারে। আমাদের শিখতে হবে। বৈজ্ঞানিক রাজনীতি। মনে রাখা দরকার। রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। সমাজ-বিজ্ঞানের অংশ। সর্বপ্রকার অন্ধ-বিশ্বাস থেকে, মুক্ত থাকতে হবে।

প্রথম শিক্ষা শিবিরের দৈনন্দিন কার্যাবলী; এলেন রায় সবিস্তারে লিখে নিয়েছেন। একখানা বই ছাপা হোল। রায় তার নাম দিলেন, Scientific politics বৈজ্ঞানিক রাজনীতি।

দশদিন ধরে এই শিক্ষা শিবির চললো। চললো রাজ-নীতির পাঠ গ্রহণ। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক গুরু-গৃহ।

রায় বললেন,—এটা হোল আমাদের স্নাতক শিক্ষা শিবির। ছ'বছর পরে আবার আরম্ভ হবে, স্নাকোত্তর শিক্ষা শিবির।

সারা ভারতে, নতুন বিপ্লবী মানুষ সৃষ্টি হবে। পরার্থপর, সৎ ও চিন্তাশীল বিপ্লবী মানুষ, দেশ ছেয়েফেলবে।

১৯৪৬ সালের ৮ই মে। দেরাতুনে দ্বিতীয় শিক্ষা শিবির আজ থেকে খোলা হোল। ৮ই মে থেকে ১৮ই মে। দশ দিন ব্যাপী চলবে। সারা ভারতের বহু উৎসাহী কর্মী এসেছেন।

দ্বিতীয় শিক্ষা শিবির। আরও মনোজ্ঞ; আরও জন-প্রিয় হোয়েছে। পার্টি কাউন্সিলের ৬৬ জন উৎসাহী সক্রিয় সদস্য যোগ দিয়েছেন।

আর এসেছেন। নেতৃস্থানীয় দেড়শো জন পার্টি সদস্য। সকলেই উৎসাহী কর্মী। সকলের সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। কিছু একটা করার জন্য; সকলের মন আকুলি বিকুলি করছে।

সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। লক্ষণ শাস্ত্রী যোশী, তারকুণ্ডে, জি, ডি, প্যারেখ, এ, কে, মুখার্জী, ধরিত্রী গাঙ্গুলি, ভি, বি কার্ণিক, শিব নারায়ণ রায়, কে, কে, সিংহ, বরেন চ্যাটার্জী, আর, এল নিগম, স্বদেশ রঞ্জন দাস, অনিল ব্যানার্জী আরও অনেকে। ঘরোয়া পরিবেশে; নিঃসংকোচে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল।

স্বদেশ রঞ্জন দাস কথাটা তুললেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ইউরোপের রাজনৈতিক ভাবধারা কোন পথে চলেছে?

রায় বললেন,—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর; ইউরোপ ছুটি বিভিন্ন শিবিরে; বিভক্ত হয়ে গেল। ছুটি আদর্শ গত বিভিন্ন মত। ইউরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তার একটার নাম ডিমোক্রাটিক সোসালিজম। বৃটিশ লেবর গভর্ণমেণ্ট; এই পথ অনুসরণ করছেন। অপরটি হোল ডিকটেটোরিয়াল কমিউনিজম। রাশিয়া এই পথে চলেছেন।

বরেন চ্যাটার্জী তখন প্রশ্ন তুললেন।

দুটি বিভিন্ন আদর্শ গত সংঘাতের ফলে; তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা আরও পরিস্ফুট হোল। তাই নয় কি?

রায় জবাব দিলেন।

সে ভয় ত আছেই। তবে ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর পতনের পর; ইউরোপে একটা নতুন যুগ দেখা দিয়েছে। এই নতুন যুগের ধর্ম; গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ভিত্তিতে; দেশকে নতুন করে গড়ে তোলা। দুটি বিপরীত ধর্মী আদর্শের সংঘাতের মধ্যে; একজায়গায় উভয়ের আশ্চর্য মিল আছে। সেটি হোল। দুদলই পুজিপতির বিরুদ্ধে।

আর গণতান্ত্রিক সমাজ বাদের ভিত্তিতে; যারা দেশকে গড়তে চান। তারা মারমুখী উগ্রপন্থী নন। পুজিপতিদের ওপর, আক্রমণের ভাষাটা। তাঁদের অপেক্ষাকৃত নরম।

তাদের কথা হোল। একটা শোষণ-হীন নতুন সভ্য-সমাজ সৃষ্টি হোক। তাঁরা চান ব্যক্তিগত মানুষের; স্বাধীন প্রচেষ্টার দ্বারা; সমাজে একটা আর্থিক সমতা গড়ে উঠুক।

তাঁরা এক নায়কত্ব চান না ঠিকই; আবার সংসদীয় গণ-তন্ত্রের, দোষ ক্রুটির অবসান চান।

কয়েকটি ছোট ছোট দেশ ছাড়া; এক নতুন ধরণের ষ্টেট; এই নতুন আদর্শে ইউরোপে গড়ে উঠেছে। তাঁরা বিভিন্ন নাম নিয়েছেন। যেমন,—পপুলার রিপাবলিকান পার্টি, প্রোগ্রেসিভ ক্রিশ্চান পার্টি; ক্রিশ্চান সোসালিষ্ট পার্টি, সোসালিষ্ট ডিমোক্রাটিক পার্টি ইত্যাদি। ভারতেও এইভাবে। নতুন পার্টি গড়ে উঠছে।

রায় আরও বললেন।

আমি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলাম। ইউরোপে এক শ্রেণীর মানুষের, এক নায়কত্বমূলক কমিউনিজমকে বড় ভয়। তাঁরা বলেন,—আধুনিক সভ্যতার ঐতিহ্য; ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

সমাজে কোন নৈতিক মূল্যবোধ থাকবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার মৃত্যু ঘটবে।

এবার গোপেন দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন,—

অনেকের ধারণা। মার্কসবাদ ও কমিউনিজম এক।

রায় হেসে জবাব দিলেন—এ ছুটো কথা নিয়ে আমরা প্রায়ই ভুল করি। কিন্তু আসলে তা নয়। মার্কসবাদ, কমিউনিজমের দর্শন। আর কমিউনিজম, মার্কসবাদের রাজনৈতিক প্রয়োগ। Marxism is a philosophy and communism is a political practice.

এবার পার্টি'র এক তরুণ সদস্য প্রশ্ন করলেন—তাহলে সাধারণ মানুষের মুক্তি কোন পথে ?

রায় উত্তর দিলেন।

মানুষের মুক্তি বলতে আমি বুঝি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়, মানুষ মানুষকে শোষণ করার ফলে, যে আর্থিক অক্ষমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হয় ; তা সমূলে উৎপাটিত হলে, সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে ; সেই অবস্থায় মানুষের মুক্তি আসবে। সেই হবে মুক্তির পথ।

তখন সেই তরুণ কমরেডটি উৎসাহিত হোয়ে বললেন।

তাহলে,, কমিউনিজম হোল। সেই মুক্তির পথ। কারণ কমিউনিজম বলে,—উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।

রায় উত্তর দিলেন।

এখানে একটু ভুল হোল। কমিউনিজমে ব্যক্তিগত মালিকানা (private ownership) থাকবে না। ঠিকই। কিন্তু সব মানুষের মালিকানা common ownership ও হবে না।

শিক্ষা শিবিরের আলোচনা। সে দিনের মত সেখানেই শেষ হোল। সবাই ছুটলেন। খাবার টেবিলের দিকে। রায় সকলের সঙ্গে একসাথে বসে পড়লেন। তখন খালি হাসি আর গল্প। যেন আনন্দের হাট-বাজার। দীয়তাং ভূজ্যতাং চলেছে।

পর দিন। শিক্ষা শিবিরের কাজ সকাল সকাল আরম্ভ হয়েছে। এমন সময় প্রফেসর নিগম কিছুদিন আগের সংবাদপত্রের একটা টুকরো, রায়ের সামনে উপস্থিত করলেন। তাতে লেখা আছে,—রায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে।

রায় হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন,—অনেকেই এই ভুল করেন। একদিন আমি কমিউনিজমের খুবই অনুগামী ছিলাম। মার্কসবাদ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করেছি। মার্কস এক জায়গায় বলেছেন,—কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার পর, সভ্যতার ইতিহাস, এক বিশেষ গতিতে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম, তার ব্যতিক্রম ঘটেছে; আমি তখন মার্কসবাদ, আর তার রাজনৈতিক প্রয়োগ কৌশল—এই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। বহু প্রবন্ধ লিখলাম। আমার মনে যে প্রশ্ন উঠেছে তা ভাষায় রূপ দিলাম। সবাই ভাবলো আমি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গেছি। এটা ভুল। কোন মতের সমালোচনা করার অর্থ সেই মতের বিরুদ্ধে যাওয়া বা তাকে বাতিল করা নয়। Criticism is neither rejection nor negation.

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলি,—আমি তখন বেরেলি জেলে। একদিন এক উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মচারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

এ কথা সে কথার পর তিনি বললেন,—রাশিয়ানরা আপনার সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করেছে। এবার আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করুন। আমি উত্তর দিলাম,—তাতে কি হয়েছে। তারা যা খুসী করুক। আমার কি আসে যায়। আমি কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী হোয়ে এই পথে নেমে ছিলাম। পুলিশ অফিসার বেশ অবাক হোয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ব্যঙ্গ করে বললেন,—ওঃ আপনি একজন দার্শনিক।

পুলিশ অফিসার হয়ত আশা করেছিলেন যে আমি ভারতে একটা কমিউনিজম বিরোধী, বলিষ্ঠ ফ্রন্ট গড়ে তুলবো। তাই বোধকরি হতাশ হয়েছিলেন। তার মানে। তাঁরা আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। তাই যা, বলতে চেয়ে ছিলাম। কোন মতের সমালোচনা করার অর্থ; সেই মত পরিত্যাগ নয়।

<u>সারপ্লাস-ভ্যালু কি ?</u>

কথা প্রসঙ্গে এবার সব চেয়ে বড় প্রশ্ন উঠলো,—সারপ্লাস ভ্যালু।

শিক্ষা শিবিরের সবাই উৎসাহী হয়ে কথাটা তুললেন। সবাই শুনতে চান। এ সম্বন্ধে রায় কি বলেন। মার্কসের অর্থ নৈতিক মতবাদ। সারপ্লাস ভ্যালু—উদ্বৃত্ত সঞ্চয়। আজ বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক সংঘাত সৃষ্টি করেছে। শুধু এই কথাটি নিয়ে। মালিক ও শ্রমিকে মারা মারি, হাতা হাতি, কাটাকাটি, দলাদলি, ঘেরাও ও ধর্মঘট। দিকে দিকে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা।

পার্টির অন্যতম উৎসাহী সদস্য বরেণ চ্যাটার্জী লাফিয়ে উঠলেন।

আমার একটা প্রশ্ন আছে। পুজিপতির দল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ লুণ্ঠন করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে। তার কি ?

কার্ল মার্কস স্পষ্ট বলেছেন।

Capitalists rob the workers by taking away the surplus value in the means of production. তাহলে ?

রায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে, গম্ভীর হয়ে বললেন,—এটা মারাত্মক ভুল। উৎপাদনে সব সময়, একটা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতেই হবে। কারণ শ্রমিককে উৎপাদনের নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে, যদি কিছু উদ্বৃত্ত না থাকে, তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে।

নৃপেন চৌধুরী কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। রায় তাকে হাত তুলে নিষেধ করলেন। বললেন,—আগে সব শোন। তারপর প্রশ্ন করো। অধৈর্য হয়োনা।

রায়ের গলার স্বর শান্ত অথচ দৃঢ়।

আর কি হবে? উদ্বৃত্ত মূল্য না থাকলে সভ্যতা ও প্রগতির চাকা ঘুরবে না। কারণ Surplus production is lever of all progress through the ages.

তারপর হাসতে হাসতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,—সভ্যতার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে। স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবীতে উদ্বৃত্ত সঞ্চয়, হয়ে আসছে। আর এটাই হোল, প্রগতির উৎস।

সেই সময়, পেছন দিক থেকে কে একজন প্রশ্ন করে বসলেন।

উদ্বৃত্ত সঞ্চয় মানেইত শ্রমিক শোষণ।

রায় বললেন,—হ্যাঁ, সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে শ্রমিক শোষণ চলে আসছে। এটা একটা মামুলি ব্যাপার। Exploitation of labour is inherent in an organised society.

সবাই চুপ করে গেলেন। ভাবলেন,—রায় বলেন কি? শোষণ একটা মামুলি ব্যাপার। অনেকের কথাটা বিশ্বাস হোল না।

তখন গোপেন দত্ত বললেন, সারপ্লাস ভ্যালু বলতে মার্কস কি বুঝতেন, তার সংজ্ঞাটা জেনে রাখা ভাল। আমরা পরিষ্কার হতে চাই।

রায় বললেন,—মার্কস সে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,—when a worker produces over and above what is alloted for his own maintenance is surplus value. তার মানে হোল,—নিজের দিন গুজরাণের জন্য একজন শ্রমিকের যেটুকু কাজ করা দরকার তার বিন্দুমাত্র অতিরিক্ত উৎপাদন হোল উদ্বৃত্ত সঞ্চয়।

তরুণ সদস্যদের জানবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। আর একজন প্রশ্ন করে বসলেন,—কমিউনিষ্ট রাশিয়া কি সারপ্লাস-ভ্যালু উৎপাদন করেন?

হ্যাঁ, রাশিয়াতেও সারপ্লাস ভ্যালু সৃষ্টি করতে হয়।

একথা শুনে বরেণ বললেন,—পুজিপতির দেশে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় তা পুজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে নিয়োগ করেন। কিন্তু রাশিয়ায় উহা জনগণের সার্বজনিক কল্যাণে ব্যয়িত হয়।

তখন রায় বললেন,—তাহলে দেখা যাচ্ছে, উদ্বৃত্ত সঞ্চয় কোন দেশেই বন্ধ হয়নি। বন্ধ হবে না। রাশিয়া কমিউনিষ্ট দেশ। সেখানেও উহা বন্ধ হয়নি। তফাৎ শুধু দৃষ্টি ভঙ্গীর।

সে দিনের আলোচনা। এখানেই শেষ হোল। তখন রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সবাই হাসি মুখে সে দিনের মত বিদায় নিলেন।

আজকের আলোচনা।

এক নায়কত্ব বা ডিক্‌টেটরশীপ নিয়ে।

আলোচনার প্রথমেই রায় বললেন।

মার্কসের বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় একনায়কত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার অবলোপ সাফল্যের শর্ত। Marxist scheme of revolution postulates dictatorship i,e, abolition of liberty as a condition of success.

মার্কসের মতে।

পরিবর্তনের মুখে ডিক্‌টেটরশীপ অব দি পলিটেরিয়েটের প্রয়োজন হবে। দেশটা এই বিশেষ শ্রেণীদ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একনায়কত্বের আমলেও একটা শ্রেণী থেকে যায়।

তখন কে একজন প্রশ্ন তুললেন,—তাহলে হাত বদলে যায় বলুন।

ঠিক তাই। বুর্জোয়াদের হাত থেকে পলিটেরিয়েটদের হাতে, ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। এইটুকু তফাৎ। আর একটা কথা ভাববার আছে। মার্কস খোলাখুলি ভাবে বলেছেন। একনায়কত্ব ততদিন

প্রয়োজন হবে, যতদিন না সোসালিজম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রেণী-হীন সমাজ সৃষ্টি হোলে, অর্থাৎ সোসালিজম প্রতিষ্ঠিত হোলে, রাজ্য আপনিই শুকিয়ে যাবে। State will wither away.

তাহলে কি হবে? এই বলে রায় সবার মুখের দিকে তাকালেন। সবাই আগ্রহান্বিত। সবাই উৎসুক। সবাই জানতে চান।

তখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মানে শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ হবে। Class struggle will come to an end. তখন আর এক নায়কত্বের প্রয়োজন হবে না।

শিক্ষা শিবিরের সদস্যেরা একাগ্র চিত্তে এই মনোজ্ঞ আলোচনা অভিনিবেশ সহকারে শুনতে লাগলেন। সবাই রায়ের মুখ থেকে শুনতে চান। মার্কসীয় দর্শনের ব্যাখ্যা।

এবার রায়ের চোখে মুখে একটা বেদনার কালো ছায়া ফুঠে উঠলো।

আপনারা জানেন। রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর! কিন্তু সেখানে আজ এক-নায়কত্বের অবসান হয়েছে কি? হয় নি। তাহলে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে। যে পার্টি একবার রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে। সে স্বেচ্ছায় তা ছাড়ে না। পৃথিবীর সর্বত্র। সেই একই খেলা চলছে। কেউ বাদ নেই। কার নাম করবো।

আলোচনা করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। তখন এলেন দাঁড়িয়ে বললেন,—আপনাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। খাবার প্রস্তুত। আপনারা আলোচনা এ বেলার মত স্থগিত রাখুন।

লক্ষণশাস্ত্রী যোশী হাসতে হাসতে উঠে দাড়ালেন। তারপর একটু এগিয়ে এলেনের কাছে এসে হাসি মুখে বললেন,—এই জন্যই আমরা আপনাকে এত বেশী পছন্দ করি। আপনার চোখে, সব আগে ধরা পড়েছে। আমরা এই শুষ্ক আলোচনায়, ক্লান্ত হয়ে

পড়েছি। বিরাম দরকার। সবাই হাসতে হাসতে খাবার টেবিলে উপস্থিত হোলেন।

বিশ্রামের পর। সবাই আবার যে যার আসনে এসে বসেছেন। এবার প্রশ্ন উঠলো। দেশে কি ভাবে বিপ্লব দেখা দেয়।

এ প্রশ্নটি করেছেন অনিল ব্যানার্জী। রায়ের হাতে এক টুকরো কাগজ। তাতে এই প্রশ্নটি লেখা আছে। সহজ ভাবে রায় বললেন,—তোমার প্রশ্নের জবাব মার্কসই দিয়েছেন। তিনি বলে গেছেন। তিনটি কারণে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে।

মার্কসের প্রথম কথা হোল।

Break down of the established economic system. সুপ্রতিষ্ঠিত আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

মার্কসের দ্বিতীয় কথা হোল।

Decompositiou of the state রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থায় পচন ধরবে।

আর মার্কসের তৃতীয় কথা হোল।

Existence of a revolutionary party একটা সক্রিয় বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব। তখন রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা উঠলো।

রায় বললেন,—কিন্তু বিপ্লবের জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে রক্তপাত পাগলামি। আর তারপরও সেটা চালিয়ে যাওয়া অপরাধ। তার কথা হোল। Bloodshed for no purpose is insane and when that is advocated even after its futility, it is criminal.

আজকাল ডিসিপ্লিন এই কথাটা সবার মুখে মুখে। গোপেন দত্ত দেরাছুন ক্যাম্পে রায়কে প্রশ্ন করলেন।

ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

কোন প্রতিষ্ঠানকে চালাতে গেলে ডিসিপ্লিনের খুবই প্রয়োজন। তবে একথা ভুললে চলবে না। ডিসিপ্লিন মানুষের নৈতিকবোধ

থেকে জন্মায়! যদি ভয় দেখিয়ে, অন্যায় জুলুম করে, ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হয়, তা হলে মানুষের স্বাধীনতা থাকবে না।

Negation of freedom, can not lead to freedom.

এবার সেই একই লোক প্রশ্ন করলেন। তাহলে অরগানিজেসন বলতে, আপনি কি বলেন? সবাই একটু উৎসুক হোলেন।

রায় হাসতে হাসতে বললেন। আপনারা বোধকরি কমরেড সাফদারের বক্তৃতা শুনেছিলেন। সেটা মনে রাখার মত। তিনি বলেছিলেন, পার্টি হোল এক বস্তা আলু। প্রতিষ্ঠানটি হোল সেই বস্তা। আলু রাখবার বস্তাটি যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে আলুগুলো ছিটকে পড়বে। নষ্ট হবে। সুতরাং বস্তা চাই, আর আলুগুলো মেম্বর।

রায় প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। তবু প্রশ্নের শেষ নেই। সবাই জানতে চান। সবাই বুঝতে চান। সবাই পথের নির্দেশ চান।

এবার আর এক ধরণের প্রশ্ন এল। প্রশ্নটি তুললেন চৈতন চ্যাটার্জী।

কমিউনিষ্টরা কি গণ-তন্ত্র মেনে চলেন?

তাঁদের গণতন্ত্রের ধারণা কি জানেন? তাঁরা বলেন, প্রত্যেক নির্বাচন হবে রেফারেণ্ডাম। নির্বাচন নয়। প্রস্তাব থাকবে মাত্র একটি। সেই একটি প্রস্তাবের ওপর। ভোটার 'হ্যাঁ' বা 'না' বলবেন। এটা কি গণতন্ত্র? এটা স্বাধীন নির্বাচন নয়। এটা হোল ডিক-টেটরদের পরিধি বিস্তার। আর একটা কথা। কমিউনিজমে ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হয় না। তাঁদের মতে, ব্যক্তি বাঁচবে। সমষ্টির মধ্যে। অথচ কমিউনিষ্ট দর্শনের রচয়িতা কার্ল মার্কস স্বীকার করে গেলেন,—Man is root of things. মানুষই সব।

আলাপ-আলোচনার গতি শান্ত পরিবেশের মধ্যে চলছিল। সবাই আনন্দ পাচ্ছিলেন। মানুষের জিজ্ঞাসু মন। আরও জানবার

জন্ত ব্যকুল। আর, শিক্ষাগুরু মহাসাধক কমরেড এম, এন, রায়; জ্ঞান বিতরণের জন্ত উন্মুখ। এ যেন, দিবে আর নিবে। মিলাবে মিলিবে। যাবে না ফিরে।

গণতন্ত্রের কথা। এবার সংসদীয় গণতন্ত্র,—পার্লিয়ামেণ্টারি গণতন্ত্রের কথা উঠলো। ভারতে পার্লিয়ামেণ্টারি গণতন্ত্র চলছে। ইংলণ্ডের অনুকরণে। তাই সবার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। সবাই জানতে চান, সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি কোথায়?

সংসদীয় গণতন্ত্রেও শাসক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যাচ্ছে না। আর এ কথাও ঠিক, পার্লিয়ামেণ্টে যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন, তাঁরা শাসন ব্যাপারে, এক নায়কত্বের মত ব্যবহার করেন। তাঁদের বুর্জোয়া ডিক্‌টেটর বলা চলে। শুধু নীতিজ্ঞানশূন্য বক্তৃতার জোরে, তারা সবার শীর্ষে এসে বসেন। তাদেরই ত ভয়। তাঁদের মুখে কিছুই আটকায় না।

তাহলে, এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি?

বাঁচবার একমাত্র পথ. বৈপ্লবিক জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা। আর যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের শুভ বুদ্ধির ওপর নির্ভর। আর বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে, তাদের নিবৃত্ত করা। এই ভাবে ইংলণ্ডে গণতন্ত্র রক্ষা পাচ্ছে।

তারপর রায় একটু চুপ করে থাকলেন। কি যেন ভাবলেন। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নতুন চিন্তার রেখা কপালে ফুটে উঠেছে। শিরাগুলো ফুলে লাল হয়ে উঠলো।

পরে শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন।

সেইজন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিটি মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে। সকল মানুষ, সকল মিলে, গ্রামে গ্রামে; শহরের পাড়ায় পাড়ায়, যেন স্থানীয় গণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইন। স্থানীয় গণতন্ত্র, যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনে

সে ব্যবস্থা থাকবে, সেই হবে প্রকৃত বিপ্লবী জনগণের সরকার। প্রকৃত গণতন্ত্র। দেশকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

সেই সময় কয়েকজন তরুণ সদস্য। কমিউনিজমের থিয়োরী, আর তার প্রয়োগ কৌশল নিয়ে অবান্তর প্রশ্ন তুললেন।

রায় তাদের সাবধান করে দিলেন। বললেন,—মতবাদের গোড়ামীর মধ্যে; যেন আমরা আটকে না পড়ি। দার্শনিক গেটের একটা কথা। লেনিন প্রায়ই বলতেন।

যদি মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও আনন্দ; দুইই নষ্ট হয়। তাহলে মতটা বড় নয়। গেটের কথা হোল,—Theory is grey, but ever green is the tree of life. জীবন বৃক্ষ চির সবুজ।

এই উচ্চাঙ্গের আলোচনায় সবাই খুসী। তরুণ সদস্যদের মধ্যে র‍্যাডিক্যাল এই কথাটা অর্থ নিয়ে, মাঝে মাঝে তুমুল তর্কের সৃষ্টি হয়। কথায়, লেখায় ও বক্তৃতায়। রায় র‍্যাডিক্যাল এই কথাটা বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন। Radical এই কথাটার আভিধানিক অর্থ,—চরম বা চুড়ান্ত।

সেদিন কয়েকজন সদস্য রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন,—র‍্যাডিক্যাল বলতে, আপনি কি বোঝেন?

রায় বললেন,—র‍্যাডিক্যাল মানে। একেবারে মৌল তথ্যে বা মূলে ফিরে যাওয়া। To be radical means to get to root of the matter.

কথা প্রসঙ্গে রায় বললেন।

র‍্যাডিক্যাল হিউমানিজমের মধ্যে তিনটি জিনিষ আছে। materialism, rationalism and eithics. পার্থিব বস্তু, যুক্তি-বুদ্ধি আর নীতিপরায়ণতা।

মানুষ প্রকৃতির অংশ। তাই মানুষ ও প্রকৃতির মিলন অবিচ্ছেদ্য।

অনাদি অনন্ত প্রকৃতি নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। মানুষকেও সেই নিয়মের অধীনে চলতে হয়। নব মানববাদের চিন্তাধারা যখন মাথায় এল, তখন আবার মার্কস-বাদ বিশ্লেষণ করলাম। দেখলাম, সামাজিক সহযোগিতা, শ্রেণী সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর।

আমি ভেবে দেখলাম, প্রতিটি মানুষের ভেতর একই প্রকার সহজাত প্রবৃত্তি, একই চিন্তাধারা কাজ করছে।

একই প্রকার চিন্তাধারা। কারণ মানুষ মূলতঃ এক। সেজন্য মানবিক ভ্রাতৃবোধের আদর্শ। একটা কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য নয়।

আমাদের মস্তভুল হবে, যদি আমরা মনে করি, মনুষ্য সমাজ এক সুসভ্য জঙ্গল! আর এই সমাজের কল্যাণ, উন্নতি ও অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য সভ্য মানুষ, মানুষের গলা কাটবে।

রায় বলেই চলেছেন।

আমাদের অন্তরে যে আসল মানুষটা বসে আছে; সে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ কি জানেন? তার চিন্তাশক্তি আছে।

তাই আমার মনে হয়।

Man is inherently moral, because he is rational. মানুষ আসলে নীতি পরায়ণ। কারণ সে যুক্তিবাদী।

আর নীতি পরায়ণতা বলতে আমি বুঝি,—স্বাধীনতা। Morality is freedom and reason is the only sanction for morality. নীতিপরায়ণতাই স্বাধীনতা, এবং একমাত্র যুক্তিদ্বারা নীতিপরায়ণতা অনুমোদিত।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনতে লাগলেন। রায়ের অন্তরের কথা।

এমন সময় ধরিত্রী গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন,—আমরা র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি'র সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়েছি বটে; আসলে কিন্তু আমরা কমিউনিষ্ট।

রায় বললেন,—এটা ভুল। র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির চিন্তাধারা মার্কসবাদের চিন্তাধারা থেকে পৃথক নয়। উভয় মতবাদ,

উভয় চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য নেই। র‍্যাডিক্যালিজম হোল মার্কসবাদের সংশোধন। মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক সারাংশের চুম্বক।

আবার রায় একটু চুপ করলেন। কি যেন ভাবলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল,—Marxism is not a system of dogmas ; it knows no final or absolute truth. এই বলে থামলেন।

মার্কসবাদ একটা অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস নয়। ইহার পরম ও চরম সত্য বলে কিছু নেই।

দেরাদুন শিক্ষা শিবির। আজ শেষ হয়েছে। কাল সদস্যরা সবাই ফিরে যাবেন। সন্ধ্যা বেলা। তারকুণ্ডে, কার্ণিক, শিবনারায়ণ রায় আরও অনেকে ফুলবাগানের একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প করছেন।

রায় গল্প করতে করতে বললেন,—১৯৩৯ সালে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে, একটা বিষয় ভাল করে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম একদল কংগ্রেসী, গান্ধী বাদের সঙ্গে একমত হতে পাচ্ছেন না। তাঁরা একদিন-বলেই ফেললেন, যত সব বড়লোক নিয়ে কংগ্রেসের সৃষ্টি। তাঁরা জনগণের মুক্তি চান না।

আমি তাঁদের বললাম।

আপনারা পিপলস্ পার্টি গঠন করুন। তাঁরা আমার কথার যুক্তি উপলব্ধি করলেন। তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে, একটা নতুন ব্লক গঠন করলেন। নাম দিলেন,—লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস।

বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সাল থেকেই আমার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে মেতে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড, তাঁদের ভাল চোখে দেখলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের নাম শুনতে পাওয়া গেল না। জীবন লাল ১৯৪১ সাল থেকে আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন। ওয়ারকার্স পার্টি গঠন করলেন। আলাদা ভাবে কাজ করতে লাগলেন।

[বিপ্লবী জীবন লাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ সালে ১লা নভেম্বর দেহ ত্যাগ করেন।]

পিপলস্ প্ল্যান

১৯৫২ সালে কথা হচ্ছিল।

কার্ণিক বললেন—আপনার মনে আছে। পিপলস্ প্ল্যান সম্বন্ধে নেহেরু কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন। There are some good ideas in the people's plan of Economic Development.

রায় বললেন—হ্যাঁ, আমি সেই প্রেস রিপোর্টের কথা আজও ভুলিনি। কিন্তু নেহেরু ত পিপলস প্লান, গ্রহণ করলেন না।

পিপলস প্লানের মূল কথা হল।

Production for use as against production for profit. মানুষের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করতে হবে। লাভের জন্য নয়। আরও সহজ করে বললে, এর মানে হবে। Agriculture first, heavy industries after. আগে কৃষি, পরে বৃহৎ শিল্প।

আপনি ত জানেন। ভারতের অনেক অভিজ্ঞ সমাজবাদী ও চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদেরা মিলে, এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র ব্যানার্জী বহু পরিশ্রম করলেন। বহু তথ্য আর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করলেন। আমরা সবাই রাস্তা ঠিক করলাম। কিন্তু দেশ গ্রহণ করলো না। নেহেরুর কাছে বম্বে প্লান হোল গ্রহণ যোগ্য। টাটা, বিড়লা প্লান কংগ্রেস দেশের উপযোগী মনে করলেন। তাঁরা কৃষিকে উপেক্ষা করে, শিল্পকে প্রাধান্য দিলেন। এই আমার দুঃখ।

কার্ণিক উত্তর দিলেন।

কৃষি প্রধান দেশে, কৃষিকে উপেক্ষা করার ফল; আজ হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে।

রায় আপন মনে বলে চলেছেন।

১৯৪২ সালে আমি প্রথম অনুভব করলাম। স্বাধীন ভারতের জন্য, জনগণের উপযোগী, আর্থিক পরিকল্পনা গঠন করা দরকার। শোষণ-হীন সমাজ গড়তে হবে।

১৯৪৬ সালে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে, ভারতে ইন্‌টেরিম গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হোল। তখন লর্ড ওয়াভেল, ভারতের বড় লাট; নেহেরু বড়লাটকে সুপারিশ করলেন। সার আর দেশীর দালালকে ইন্‌টেরিম কাউন্সিলে সদস্য নিযুক্ত করা হোক। সার দালাল ছিলেন। বম্বে প্লানের স্রষ্টা। তাঁর চেষ্টায় প্রাইভেট ও পাবলিক সেকটারে বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠলো। ইংরেজ তাই চাইছিলেন।

কার্ণিক চুপ করে রায়ের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন,— ১৯৪৬ সালে, বম্বে প্লানের ভবিষ্যৎ কি হবে; সে সম্বন্ধে আপনি একদিন বলেছিলেন। বম্বে প্লানে হয়ত কয়েক হাজার, শিক্ষিত যুবক কাজ পাবে। কিন্তু বেকার জনগণের ক্ষুধার অন্ন মিলবে না। মধ্য-বিত্তের বেকার সংখ্যা বাড়বে। সবাই নিরাশ হবে। দেশের আর্থিক অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হবে না। দ্রুত অবনতি ঘটবে। দেশ আজ সেই পথে চলেছে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য। ১৯৫০ সাল থেকে, ভারতে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয়েছে। তিনটি পঞ্চ বার্ষিকী প্লানে; উনিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সর্ব-সাকুলো এক হাজার নিরানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে; রাওয়ের কেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুর ইস্পাৎ কারখানা গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া। দেশে বহুবিধ। ভারী শিল্প গড়েছে। কিন্তু জনগণের আর্থিক উন্নতি হয়নি। ধনী আজ আরও ধনী। দরিদ্র আরও দরিদ্র। বেকার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রায়ের আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত।

ভারত রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে; কিন্তু জনগণের দুঃখের অবসান হয়েছে কি ?

ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে। সবাই ভাবছে। এবার সকলের, সকল দুঃখের, সকল কষ্টের অবসান হবে। কিন্তু মানুষের দুঃখ-কষ্ট। অভাব অভিযোগ বেড়েই চলেছে। কমবার ত লক্ষণ নেই। সর্বত্র হাহাকার। দেশের চরম দুর্দিন।

অনেকেই রায়ের সঙ্গে এই সব বিষয় নিয়ে, আলাপ আলোচনা করতে আসেন। সবাই চান। রায়ের মুখ থেকে শুনতে, দেশের ভবিষ্যৎ কি ?

একদিন দেরাদুন ডি, এ, ভি, কলেজের এক অধ্যাপক এসেছেন।

তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন,—

আপনার স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন কি সফল হয়েছে ?

এই প্রশ্ন শুনে রায় অন্তরে বেদনা পেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন,—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। ভারত রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু স্বাধীন ভারত বলতে, আমি যা চেয়েছিলাম, তা পাইনি।

একটু ম্লান হেসে সেই অধ্যাপকটিকে বললেন,—এর কারণ কি জানেন ? আমাদের রাজ-নৈতিক আন্দোলনের পেছনে, কোন আদর্শ বা দার্শনিক মতবাদ ছিল না।

কংগ্রেস ১৯২৯ সালে, এ, আই, সি, সি তে একটা প্রস্তাব নিয়েছিলেন।

To remove poverty and misery---it is essential to make revolutionary changes in the economic structure of the society. তা তাঁরা করেছিলেন কি ? করেন

নি। সমাজের আর্থিক কাঠামো। তাতে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা আসল কথাটাই ভুলে গেলেন।

আমি সব সময় মনে করি।

In our national economy, land is still the main means of production.

এটা ভুললে চলবে না।

Productivity of labour performed in agricultural industry is the source of national wealth. কৃষি শিল্পে শ্রমিকের কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি জাতীয় সম্পদের উৎস।

তখন অধ্যাপকটি প্রশ্ন করলেন,—

তা হলে, এর সমাধান কি ?

আমি মনে করি। ইহার একমাত্র সমাধান। employment of social labour. আমি আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। A nation can not prosper when its labour power is largely wasted. শ্রম শক্তি নষ্ট হলে, জাতির উন্নতি হবে না।

অধ্যাপক ভদ্রলোকটি চুপ করে শুনতে লাগলেন।

আমি আরও মনে করি। স্বাধীন ভারত রক্ষণশীল ও ফ্যাসিষ্ট।

ভারতীয়েরা ইংরেজকে শুধু ভারতের মাটি থেকে, তাড়াতে চেয়েছিলেন। তাই স্বাধীনতার পর। ভারতের প্রাণ-শক্তি। কৃষক, শ্রমিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল। মুক্তির পথ দেখতে পেলেন না।

আচ্ছা, আপনি প্রায়ই দার্শনিক বিপ্লবের কথা বলেন। সেটা কি ?

এত অতি সোজা কথা।

Philosophical revolution means promotin of national and scientific way of thinking amony the people.

দার্শনিক বিপ্লব অর্থে, যুক্তি সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে সঞ্চালন করা।

ইণ্ডিয়ান রেনেসা ইন্‌ষ্টিটিউট

১৯৪৪ সালের শেষের দিক। রায় দেখলেন। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এল। জার্মানী শীঘ্রই আত্ম-সমর্পণ করবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের দরজায়। কিন্তু আজও স্বাধীন ভারতের গঠন তন্ত্রের রূপায়ণ হয়নি।

রায় চুপ করে থাকতে পারলেন না। বুকে আগুন জ্বলছে। র‍্যাডিক্যাল পার্টির কাউন্সিলে প্রস্তাব করলেন,—

আমাদের স্বাধীন ভারতের জন্য গঠন তন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। শোষিত মানুষের মুক্তি চাই। সবাই রাজী।

রায় আর সবাই মিলে, তৈরী করলেন। A draft Constitution of free India. স্বাধীন ভারতের গঠন তন্ত্র।

গান্ধীজী আর নেহেরুর কাছে পাঠান হোল। এই মূল্যবান অপূর্ব দলিল।

কংগ্রেস ইহা গ্রহণ করলেন না।

এমনি করে আরও দুটো বছর কেটে গেল। আবার নতুন করে আরম্ভ হোল। বিশ্ব-সভ্যতার প্রবাহ নিয়ে আলাপ আলোচনা, পঠন-পাঠন চললো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা বাহিক ইতিহাস নিয়ে নতুন অনুশীলন শুরু।

১৯৪৬ সাল। দেরাদুনে ইণ্ডিয়ান রেনেশা ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধন করা হোল। দেরাদুন ডি, এ, ভি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক আর, এল নিগম নতুন সংস্থার ভার নিলেন।

রায় একদিন হাসতে হাসতে নিউটনের ভাষায় বললেন, আমরা

এতদিন ধরে জ্ঞান-সমুদ্রের উপকূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করেছি মাত্র। জ্ঞানের পরিধি অসীম ও অনন্ত।

এম, এন, রায় সংগ্রহ শালা।

সংগ্রহশালার ভার নিয়েছেন, অধ্যাপক আর, এল নিগম। একদিন তিনি বন্ধু মহলে গল্প করছিলেন।

কমরেড রায় বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন সময়, বহু পুস্তক লিখে গেছেন। সেগুলো আজও ঠিক মত সংগ্রহ করা হয় নি। আমি তার কিছু অংশের সন্ধান পেয়েছি। যে টুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছি। তাতে দেখলাম। রায়ের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত বৃহৎ পুস্তকের সংখ্যা, আনুমানিক ১৩০ খানার ও বেশী। স্পেনিশ, জার্মান, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী প্রভৃতি বহু ভাষায় লেখা।

এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন জেলে বসে, রায় ৩৫০০ পাতার, ওপর পাণ্ডু লিপি লিখে গেছেন। সেগুলি এম, এন, রায় সংগ্রহশালায় আমি রেখেছি। প্রকাশিত হলে ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নয় ভ্যলুম পুস্তক হবে। সেগুলো ছাপতে ব্যয় হবে। প্রায় দু'লাখ টাকা।

ইংরেজ আমলে এম, এন, রায়ের বহু পুস্তক ও পত্রিকা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ; ভারত সরকার এম, এন, রায়ের প্রায় আশীখানা পুস্তক, পত্রিকা ও পত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন।

রায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর।

এম, এন, রায় সংগ্রহশালার এক আলোচনা সভা বসেছে। সেখানে কথা হচ্ছিল। নিগম, কার্ণিক, কে, কে, সিংহ, মুখার্জী, ফিলিপ স্প্রাট ও আরও কয়েকজন ছিলেন।

কার্ণিক বললেন—আমাদের দেশে আজও চিন্তাশীল মনীষীদের

এদেশে আসার পর আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত স্প্রাট্ র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন। রায়ের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ হয়।

রায় সম্বন্ধে তাঁর একটা লেখা হাতে এল। তাতে দেখলাম স্প্রাট্ বলছেন—No public man I know of, whether practical politician or mere observer, has been more consistently correct prophet than M. N. Roy.

আমি এমন কোন জন-নায়ককে জানিনা, তা তিনি বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞ হোন, বা কেবল মাত্র দর্শক হোন, যাঁর সঙ্গতিপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাণী এম, এন, রায় অপেক্ষা বেশী নির্ভুল।

স্প্রাট্ রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যাক্ সে কথা। এবার অন্য কথায় আসি।

কেন এই অস্থিরতা?

দেরাদুনে রায় আর স্প্রাট্। দুজনে আলাপ করছেন। কেন দুনিয়া জুড়ে এই অস্থিরতা, গণ-বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটি আর হানা হানি অবাধে চলেছে?

স্প্রাট্ হেরল্ড লাস্কির একটা লেখা বার করলেন। প্রবন্ধটি নাম,—Mankind is on the march. মানব জাতির জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে। আর সে যাত্রা শুরু হয়েছে। আজ নয়। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে।

রায় বললেন—আজ পৃথিবীর সামনে; তিনটি বৃহৎ সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেগুলো সবার জেনে রাখা ভাল।

প্রথমটি হোল,—বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব। তার ফলে মিলিটারি শক্তি বৃদ্ধি। অপর রাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন এবং বিশ্বে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি।

দ্বিতীয়টি হোল,—কায়েমী স্বার্থের দুর্জয় লোভ, আর পুঁজিপতি

কর্তৃক সামাহীন সম্পদ সৃষ্টি। আর তারই প্রতিক্রিয়া,—আর্থিক অসাম্য, অনিশ্চয়তা ও বিক্ষোভ।

তৃতীয়টি হোল,—মানুষের জীবন ধারণের মানদণ্ডে অভাবনীয় উন্নতি। Standard of life উদ্ধত ভাবে বেড়েই চলেছে।

রায় আরও বললেন।

সাধারণ মানুষ, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সকলেই ব্যক্তিগত উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি, সেই অনুপাতে দাবী করছে। দাবীর কোন সীমা নির্দেশ করা নেই।

আজ মেহনতি মানুষ বুঝতে শিখেছে। দারিদ্র, অভাব, ও অনটনের মূলে আছে পুঁজিপতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। তাই তারা দারিদ্রের জোয়াল, আর অসাম্যের জগদ্দল পাথর; বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না। থাকবে না নীচে পড়ে। তাই সবাই লড়াই করে বাঁচতে চায়।

এই তিনটি কারণকে ভিত্তি করে; সমগ্র বিশ্বে অশান্তি ও অরাজকতার আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভারত ও মুক্ত নয়।

সমাধান কোথায়? সর্বত্র পুরাতনের অচলায়তন চূর্ণ করে, নতুনের অভিযান চলেছে। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ কারা, আঘাতে আঘাতে কর।

আর সবচেয়ে মজা এই, সব অশান্তি মূল হলো আর্থিক অগ্রগতি। Economic progress. শুনতে কেমন লাগে। তাই না?

বিশ্বের সর্বত্র আর্থিক অগ্রগতির সমস্যা সমভাবে দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিষ্ট ও কমিউনিষ্ট কোন দেশই বাদ নেই।

একটু থেমে রায় কি যেন ভাবলেন। তারপর রায় বললেন, সবাই আজ বলতে শুরু করেছেন।

আর্থিক অগ্রগতির প্রবাহকে; ঠিক এইভাবে আর বাড়তে দেওয়া চলতে পারে না। ফ্যাসিষ্ট শক্তি জোর করে আর্থিক অগ্রগতি বন্ধ করতে পারে। জনগণের অসন্তোষ ও অরাজকতা মিলিটারি ও পুলিশের সাহায্যে নির্মমভাবে দমন করতে পারে।

গান্ধীবাদ হয়ত সেই একই কাজ করবেন অন্তভাবে ; আদর্শের বুলি আওড়ে। Plain living and high thinking—এই কথা বলে। ত্যাগেই শান্তি। ভোগে শান্তি নেই। জীবনযাত্রার উচ্চ মান গ্রহণের দাবী থেকে এইভাবে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু সোসালিষ্টরা তা করবেন না। তাঁরা ঠিক পথের নির্দেশ দেবেন। জনগণ সোসালিজম চান। দুর্নীতি হোল, পুঁজিপতির অত্যাবশ্যক নীতির একটা প্রয়োজনার অংশ। কারণ পুজিপতি,—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, অত্যাধিক মুনাফা, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে থাকে। সোসালিজম ইহার একমাত্র উত্তর আর প্রতিকার।

রায়ের চিন্তাধারা গতিশীল ঃ

বেহালার বীরেন রায়ের বাড়ী। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকের কথা। ডিমোক্রাটিক পার্টির একটা সেমিনার বসেছে। রায় ও এলেন উপস্থিত। সেখানে কথা প্রসঙ্গে রায় বললেন,—

দু'জন দার্শনিক মনীষী আমার জীবনে অদ্ভুৎ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ফরাসী দার্শনিক বাঁর্গোস। আর একজন জার্মান দার্শনিক হেগেল।

তাঁদের মত হোল,—গতিবাদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গতিবাদের পূজারী ছিলেন। বলাকা কবিতায়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

যে নদী হারায়ে পথ চলিতে না পারে ;
সহস্র শৈবাল দাম, বাধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা, অচল অসাড় ;
পদে পদে বাধে তারে, জীর্ণ লোকাচার।

জার্মান দার্শনিক হেগেল সেই একই কথা। অন্য ভাষায় বলে গেছেন,—পরিবর্তন, পরিবর্তন, ক্রমাগত পরিবর্তন।

তাই আমার মনে হয় যে মানুষের মধ্যে জীবনের স্পন্দন আছে; সে কোনদিন স্থিতিশীল থাকতে পারে না।

তাই ত আমি সামনে ছুটে চলেছি। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তারপর কবির ভাষায় বললেন,—যাত্রী আমি ওরে, পারবে না কেউ, রাখতে আমায় ধরে।

একদিন জাতীয়তাবাদী ছিলাম। মার্কসের মতে দীক্ষা নিলাম। হলাম আন্তর্জাতীয়তাবাদী। হলাম কমিউনিষ্ট। দোরে দোরে প্রচার করলাম কমিউনিজম। কিন্তু আমার ব্যথাতুর মন মুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবতে বসলাম।

যেহেতু কার্ল মার্কস এ কথা বলেছেন, সেই হেতু ইহা কি চিরন্তন সত্য?—আমার ক্ষুধার্ত মন তা মানতে চাইলো না। অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে, আর মহাকালের ভাঙ্গা গড়ার বিচারে; তাকে যাচাই করতে বসলাম।

একশো বছর আগে। কার্ল মার্কস এক আর্থিক মতবাদ, বিশ্বকে দিয়ে গেছেন। কালের প্রভাব অতিক্রম করে, সে একই চিন্তাধারা আজও বেঁচে আছে কি?

আমার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এল; ভাবলাম গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে; দেশের রাজ-নীতিতে নতুন দর্শন সৃষ্টি করতে হবে।

পার্টি লাইনে দেশ শাসন; দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। তখন। মানুষ আর মানুষ থাকে না। হয় দলভুক্ত ভোটার মাত্র। তাই ভাবছি। র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির বিলোপ সাধন করার দরকার। সে সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা কনফারেন্স ডাকবো।

সেমিনারে উপস্থিত সবাই, অবাক হয়ে রায়ের কথা শুনলেন।

একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন।

আট বছরের সুপ্রতিষ্ঠি পার্টি তুলে দেবেন ?

রায় স্থির ও গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন।

১৯৪৮ সালে; কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে, সভা ডাকা হোল। চারদিন ব্যাপী অধিবেশন চললো। প্রায় এক হাজার পার্টি ডেলিগেট আর দু তিন হাজার দর্শক উপস্থিত। সবাই অধীর আগ্রহে আলোচনা শুনলেন।

অনেক আলাপ আলোচনা; বিচার বিতর্ক হোল। শেষ পর্যন্ত সকলেই রায়ের যুক্তি মেনে নিলেন। পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোল।

নিউ-হিউম্যানিজম—নব মানববাদ ঃ

একদিন রায় অন্তরঙ্গ বন্ধু পুণার লক্ষণ শাস্ত্রী যোশীর কাছে দুঃখ করে বললেন,—

শাস্ত্রীজী, আমার বেদনাহত মন আজ চল্লিশ বছর ধরে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দুশো বছর আগে; উদারনীতি দলের মানুষ। মুক্তির কথা প্রথম বলেন। তাতে পাণ্ডা পুরোহিতের মুখোস খুলে যায়। মানুষ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ধর্মের নামে ব্যভিচার বন্ধ হয়।

কিন্তু উদারনীতি দলের দর্শন। তার রাজ-নৈতিক প্রয়োগ। এই নিয়ে বিভেদ ও প্রবল অন্তঃদ্বন্দ শুরু হয়ে গেল :

ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা। তাঁরা মুখে বললেন বটে, কিন্তু শিল্পে তাঁদের নীতি ছিল,—লেঁসে-ফেঁয়ার। শিল্পে হস্তক্ষেপ না করার নীতি। সর্বহারা বঞ্চিতের দল যে তিমিরে, সে তিমিরে রয়ে গেল।

সুতরাং মানুষকে আবার বিপ্লবের নতুন দর্শন ও পথ খুঁজে নিতে হোল। সে দর্শন মার্কসবাদ। সে পথ কমিউনিজম।

ইতিহাস বলে। বিপ্লব কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করে। পুরান আলেখ্য চূর্ণ করে। নতুন মূর্তি নির্মাণ করে। একবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতা আর সহজে ছাড়তে চায় না। ইহাই বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ত রূপ।

মার্কস ভবিষ্যৎবাণী করলেন। বিপ্লব সফল হবার পর সভ্যতার ইতিহাস। নব পর্যায়ে শুরু হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সেই স্বপ্ন-রাজ্য পঞ্চাশ বছরেও, কমিউনিষ্ট রাশিয়ায় দেখা দিল না।

শাস্ত্রীজী শুনতে লাগলেন সেই ইতিহাস। কোন বাধা দিলেন না। রায়ের চিন্তাধারা আপন গতিতে ছুটলো।

রায় আপন চিন্তায় বিভোর।

আমার মনে হোল। মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। যার ফলে; ঈপ্সিত সমাজ গড়ে উঠলো না।

সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে। এর প্রতিকার কি? আমি আমি সে কথাও ভেবেছি। নীতিবোধই ইহার একমাত্র প্রতিরোধের রাস্তা। গণ-তন্ত্রকে নীতি-বোধের উজ্জ্বল রাস্তায় পরিচালিত করতে হবে। সমাজের আর্থিক জীবনকে, কায়েমী স্বার্থের দুর্নীতির হাত থেকে, ক্রমশঃ মুক্ত ও রক্ষা করতে হবে। ফলে সদবুদ্ধি সম্পন্ন বহু লোকের, মানসিক মুক্তি আসবে। তখন সমাজের এই সব জ্ঞানী-গুণী ও সদবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা সাধারণ মানুষের, বিশ্বাস ভাজন হবেন। সাধারণের কল্যাণজনক কাজের, দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত বলে, বিবেচিত হবেন। আর সেটা হবে—নতুন আদর্শে সমুজ্জ্বল। আমি তার নাম দিলাম—নব মানববাদ।

শাস্ত্রীজীর মুখে কথা নেই। মন্ত্র মুগ্ধবৎ বিপ্লবী রায়ের অমৃত সমান কথাগুলি শুনতে লাগলেন। বিপ্লবী মহানায়ক বলেই চলেছেন।

মানুষের নৈতিকবোধের উৎস,—বিবেক ও যুক্তি বুদ্ধি। এই যুক্তিবুদ্ধি মস্তিষ্কের ধর্ম। এই ধর্মকে বিকশিত করতে হবে।

নীতি বোধই, মানুষকে সৎ-কাজে প্রবৃত্তি দেবে।

প্রতিযোগিতা নয়। সমাজ-জীবনে সহ-যোগিতার ভিত্তিতে, রাজ-নীতি, অর্থ-নীতি ও সমাজ-নীতি; মুক্ত মানুষ গড়ে তুলবে। মানুষের মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। তবেই ত ভাতৃত্ব-বোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

কার্ল মার্কসের পর এমনি করে একশো বছর কেটে গেল। আজও মানুষের ঈপ্সিত মুক্তি আসে নি। তাই আমার এই নতুন দর্শন। নব-মানববাদ।

এই বলে রায় চুপ করলেন।

১৯৪৬ সালে; এম, এন, রায়। এই নতুন দর্শন। নব মানববাদ প্রকাশ করলেন। নব মানব বাদের মূল নীতি বাইশটি সূত্রে গ্রথিত।

এখানে তার কিছুটা, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম। ছাত্র হিসেবে; প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ইহা জানা উচিৎ।

১ম সূত্র,—সমাজের আদর্শ হোল। সকল মানুষের কল্যাণ সাধন।

২য় সূত্র,—প্রতিটি মানুষের মধ্যে; একটা স্বাভাবিক মুক্তির আকাঙ্খা আছে। সেই আকাঙ্খা বা জানবার আগ্রহই, মানুষের তথা সমাজের অগ্রগতির প্রেরণা দেয়।

৩য় সূত্র,—প্রতিটি মানুষের মধ্যে, সীমাহীন সম্ভাবনা আছে। অনুশীলন দ্বারা তাকে বিকশিত করতে হবে।

৪র্থ সূত্র,—মানুষ প্রধানতঃ যুক্তিবাদী জীব। প্রকৃতির কাছে যেটা প্রাকৃতিক নিয়ম; সেটাই হোল জীব জগতের কাছে যুক্তি। এই যুক্তি বোধই মানুষকে ইচ্ছা মত চলার ক্ষমতা দিয়েছে।

৫ম সূত্র,—মার্কস বলেছেন—অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। রায় বলেন,—মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। তার নিকট, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ইচ্ছা। দুটি বিভিন্ন বস্তু নয়, একই।

৬ষ্ঠ সূত্র,—ভাবনা ও চিন্তা। মানুষের নিজস্ব স্বাধীন যুক্তি অনুসারে চলে।

৭ম সূত্র,—ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে; শুধু সমাজের অর্থ-নৈতিক পুনর্বিন্যাস করলেই চলবে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রের বাধা দূর করতে হবে।

৮ম সূত্র,—কমিউনিষ্ট একনায়ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেই সমাজে ও রাষ্ট্রে মুক্ত সমাজ সৃষ্টি হবে না,—যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকে।

৯ম সূত্র,—এক নায়ক শাসিত রাষ্ট্র; কোন দিনই স্বেচ্ছায় অবলুপ্ত হয় না।

১০ম সূত্র,—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে গেলেই, শ্রমিক শোষণ বন্ধ হয়না বা ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার জন্য চাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দ্বারা, মানুষের হাতে রাজ-নৈতিক ক্ষমতা অর্পণ।

১১শ সূত্র,—একনায়কত্ব ক্ষমতায় একবার প্রতিষ্ঠিত হলে। আর সহসা হটতে চাইবে না।

১২শ সূত্র,—সংসদীয় গণ-তন্ত্রের ত্রুটি ও বিচ্যুতি; অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। গণ-তন্ত্রকে কার্যকরীও সফল করে তুলতে, সার্বভৌম ক্ষমতা, সকল সময়ের জন্য, জনগণের হাতে রাখতে হবে। দৈনন্দিন শাসন

কার্যেও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবার নির্ভুল উপায়, নির্ধারণ করতে হবে।

১৩শ সূত্র,—অবাধ বাণিজ্য-নীতি। একচেটে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি সৃষ্টি করে; ফলে, সবল ও দক্ষ মানুষের হাতে, অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও অদক্ষ মানুষের পরাজয় ঘটে। বলাহয়, সাধারণ মানুষ অযোগ্য। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রকৃত মানুষ যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান ও নীতি পরায়ণ।

১৪শ সূত্র,—রাষ্ট্রে ও সমাজে একনায়কত্ব স্থাপন করে; সংসদীয় গণতন্ত্রের দোষ ত্রুটি দূর করা যাবে না। ক্ষমতাহীন বিচ্ছিন্ন মানুষকে, সংহত ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে, শহরের পাড়ায় পাড়ায়, সকল মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করা চাই। দেশ-ব্যাপী স্থানীয় গণ-তন্ত্রের মাথার ওপর থাকবে লোকসভা। সকল ক্ষমতা থাকবে। একেবারে নীচু তলায়; আর শীর্ষে সবচেয়ে কম ক্ষমতা দেওয়া থাকবে।

১৫শ সূত্র,—বৈপ্লবিক দর্শনের, সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে; এই ঐতিহাসিক সত্যটির ওপর গুরুত্ব অর্পণ, যে মানুষই এই সংসার, সমাজ ও সম্পদ গড়ে তুলেছে।

১৬শ সূত্র,—মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে, বহু সংখ্যক নব জাগ্রত যুক্তিবাদী নিষ্কাম কর্মীর নেতৃত্ব।

১৭শ সূত্র,—গণ-তান্ত্রিক সমাজের অর্থ-নীতি হবে শোষণ মুক্ত। ক্রম-বর্ধমান আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। সকলের অর্থ-নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই হোল, মুক্তির লক্ষ্যে পৌছুবার প্রধান শর্ত।

১৮শ সূত্র,—নতুন সমাজ ব্যবস্থায়; অর্থ-নৈতিক ভিত্তি হবে, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন। লাভের জন্য নয়। বণ্টন ব্যবস্থা হবে, সকলের প্রয়োজন অনুসারে।

১৯শ সূত্র,—গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে; বাস্তবে রূপায়িত করবে একদল অনাসক্ত, পরার্থপর ও নিষ্কাম কর্মী। এই সব যুক্তি-বুদ্ধি মানুষ, ক্ষমতার আসন দখল করে, জনগণের শাসক হবে না। তারা ক্ষমতার বাইরে থেকে জনগণের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক হবে। স্থানীয় স্বার্থে প্রভাবিত হয়ে; যাতে মানুষ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, রাষ্ট্রকে অচল করতে না পারে; সেজন্য তারা মানুষের যুক্তি বুদ্ধি ও ন্যায়নীতি বোধকে জাগিয়ে তুলবে।

২০শ সূত্র,—জনগণের মধ্যে সমাজ-নৈতিক ও রাজ-নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে। যাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব না করে, উন্নত ও সকল মানুষের কল্যাণকর, সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিদ্যাপীঠ হবে, স্থানীয় গণতন্ত্রগুলি। স্বার্থ গন্ধহীন, পরার্থপর মানুষের দ্বারা যখন রাষ্ট্র-যন্ত্র পরিচালিত হবে, তখন রাষ্ট্র এক শ্রেণী দ্বারা, অপর শ্রেণীকে দমন করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

২১শ সূত্র,—নব মানববাদ সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে, আধুনিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি অনুসারে কি ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব, তার পরিকল্পনা দিয়েছে।

২২শ সূত্র,—নব মানব বাদের মূল সূত্র হোল। প্রোটাগোরাসের কথায়,—ব্যক্তি মানুষই সব কিছুরই মান-দণ্ড। অথবা কার্লমার্কসের কথায়, ব্যক্তি মানুষই জাতির মূল। এই দর্শন হোল মুক্তিকামী, নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ।

বিশ্ব র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট ইউনিয়ন ঃ

জেরাণ্ড উইগু, আমেরিকায় প্রকাশিত 'দি হিউমানিষ্ট' কাগজের সম্পাদক। তিনি এম, এন, রায়ের নব মানববাদের ভাবধারা, আমেরিকায় এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রচার শুরু করে দিলেন।

তাছাড়া টিটো, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হাক্সলি, এরিথহোম, চার্লস-বয়েড প্রভৃতি নব মানববাদী একত্রিত হোলেন। কাজ শুরু হোল।

তারা চিন্তা করে দেখলেন। বিপ্লবী মহানায়ক এম, এন, রায় যে চিন্তাধারা বিশ্বকে দিয়েছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। তারা ভাবলেন। উদার নীতিবিদদের দর্শন প্রচারের ফলে আধুনিক যুগের মানুষ, কুসংস্কারের আর ধর্মের অনুশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। হাজার বছর আগের সেই অন্ধকার যুগে, সর্বজন গ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন ছিল,—স্বর্গের লোভ আর নরকের ভয়। রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলে, মানুষ আজ এই কুসংস্কারের উর্দ্ধে। তাই আর একটা বিপদ দেখা দিয়েছে। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের বাস্তব যুগে; মানুষ নীতি পরায়ণ হবে, কিসের লোভে? যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। এই ত আদর্শ! Eat, drink and be merry. To-morrow, we shall die. খাও, দাও, ফুরতি কর।

রায় বললেন,—মানুষ নিজ যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যেই নীতি-পরায়ণ

হবে। কিন্তু সেই যুক্তি বুদ্ধিটা জোগান চাই। কে জোগাবে? সমাজের একদল পরার্থপর নির্লোভী মানুষকে, এগিয়ে আসতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে, ১৯৫২ সালে হলাণ্ডের আমষ্টারডাম্ শহরে, নিখিল বিশ্ব র‍্যাডিক্যাল হিউমানিষ্ট ইউনিয়ন স্থাপিত হোল।

এম, এন, রায় এই সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হোলেন।

কথাছিল—আন্তর্জাতিক মানববাদের মহা-সম্মেলনে রায় যোগ দেবেন। তারপর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-মানববাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন।

রায়ের গুণগ্রাহী বন্ধুরা, অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন। পাথেয় সংগ্রহ করা হোল।

১৯৫২ সালে; ইউরোপে যাবার জন্য রায় পার্শ-পোর্ট নিলেন। যাত্রার আয়োজন সব ঠিক। আর মাত্র কয়েকদিন অবশিষ্ট। আবার বিশ্ব পরিক্রমা। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি বোধকরি অদৃশ্যে হাসলেন।

যাত্রার কয়েকদিন আগের কথা। রায় কয়েকজন সঙ্গীসহ মুশুরি পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। পাহাড়ে বেড়াতে রায় খুব ভালবাসতেন।

সে তারিখটা ছিল ১১ই জুন ১৯৫২ সাল।

রায় অন্যমনস্ক হয়ে হাটছেন ও গল্প করছেন। আর পাহাড়ের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, লাফিয়ে লাফিয়ে পার হোচ্ছেন। নীচে ছোট বড় খাদ। বড় বড় অসংখ্য নালা। হঠাৎ অতর্কিতে রায়ের পা ফস্‌কে গেল। পড়ে গেলেন। একেবারে পঞ্চাশ ফুট নীচে; গভীর খাদে। পড়েই অজ্ঞান—অচৈতন্য। তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হোল। তিনি সেরিব্রল থ্রমবসিস্ রোগে আক্রান্ত হোলেন। প্রথম চোটে রায় নিরাময় হোলেন। অনেক সুস্থ। তবু এলেন রায়কে বললেন,—তোমাকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় যেতে হবে। চেক্‌আপ করা দরকার।

রায় বললেন—বেশ, সেই ব্যবস্থাই কর।

কিন্তু যাওয়া হোলনা। আবার রায়কে থ্রমবসিস রোগে, দ্বিতীয়বার আক্রমণ করলো।

সবাই ভাবলো। এবারও তিনি রোগমুক্ত হবেন। তাঁর মত শক্তি শালী মানুষ। এ যাত্রাও হয়ত উঠে দাঁড়াবেন। কিন্তু তা হোল না। বিশ্বের দুর্ভাগ্য ১৯৫৪ সালের ২৫ সে জানুয়ারী। রাত্রি আন্দাজ বারোটায় সময়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে; মাত্র ৬৭ বছর বয়সে, সর্বযুগের, সকল মানুষের, সব চেয়ে বড় বন্ধু বিপ্লবী মহানায়ক কমরেড এম, এন, রায়ের মহা-প্রয়াণ ঘটলো।

উপসংহার

মানবেন্দ্র গুণগ্রাহী, প্রখ্যাত সাংবাদিক, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রায়ের উদ্দেশ্য এক আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে; মানবেন্দ্র নাথের অমৃত সমান জীবন কথা এখানেই শেষ করলাম।

জীবনে ও কর্মে মানবেন্দ্র নাথ রায় ছিলেন। একজন দুঃসাহসিক যোদ্ধা। অসাধারণ মনীষী সম্পন্ন পুরুষ। বিংশ শতাব্দির পৃথিবীতে; স্বল্প সংখ্যক যে কয়জন চিন্তানায়ক; তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তার দ্বারা; মানব ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছেন—বাঙ্গালী মানবেন্দ্র নাথ; তাঁদেরই একজন। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে যেমন, দর্শনের ক্ষেত্রেই তেমনি; নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁকে আমরা একজন বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন যুগ নেতা বলে আখ্যা দিতে পারি।